অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য
সম্পাদিত

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প

বেঙ্গল পাবলিশার্স ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

সাহিত্যের আসরে প্রথমতম রচনাতেই যাঁরা সম্বর্ধিত হয়েছেন, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় তাঁদেরই দলে। ১৯১৫-১৬ সালের আষা মাসে 'প্রবাসী'র গল্প-প্রতিযোগিতায় বিভূতিভূষণের প্রথম লেখা গ 'অবিচার' পুরস্কার লাভের সম্মান পায়। মাত্র উনিশ বছর তাঁর বয় সে সময়। আজিকার গৌরবোজ্জ্বল দিনের সূচনা সেই দিনই।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে জন্ম। জন্মস্থান পাণ্ডুল, মিথিলা। আদি নিবাস চাতরা, জেলা হুগলী। দ্বারবঙ্গ রাজস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস ক' কলিকাতা রিপন কলেজে আই. এ. পড়েন এবং পাটনা থেকে বি. এ. পাস করেন। ফুটবল, হকি ও টেনিস খেলায় পারদর্শী। বাগা করার শখ আছে।

দ্বারবঙ্গ-রাজের বিভিন্ন বিভাগে কাজ করেছেন। যথা—স্কুলের প্রধান-শিক্ষক, মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারি, প্রেস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট পাটনায় মহারাজের 'ইণ্ডিয়ান নেশান' পত্রিকার পরিচালক বর্তমানে সাহিত্য-সেবাই একমাত্র কাজ।

পিতামহ ১৬।১৭ বৎসর বয়সে পাণ্ডুল নীলকুঠিতে চাকরি নি আসেন। পিতা পাণ্ডুলগ্রাম ছেড়ে দ্বারবঙ্গে এসে বাড়ি করেন বিভূতিভূষণ চিরকুমার। বর্তমান নিবাস দ্বারবঙ্গ।

গল্পগুলির নির্বাচনে

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্যের-অনেক

সেই কথা স্মরণ করে বইখানি তাঁকেই দিলাম।

ব. ভ. ম.

সূচীপত্র

ভূমিকা

১

সাহিত্যক্ষেত্রে শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম আত্মপ্রকাশ ১৯১৫-১৬ সালে। পৃথিবী জুড়ে তখন প্রথম-মহাযুদ্ধের দামামা বাজছে। বাংলা সাহিত্যের আকাশে রবীন্দ্রাদিত্যের এক পার্শ্বে 'বীরবল' আরেক পার্শ্বে শরৎচন্দ্র নিজ-নিজ দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠছেন। বঙ্গভারতীর সেই পরম ঐশ্বর্যের দিনে প্রথম-প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গেই তরুণ বিভূতিভূষণ সারস্বত-সমাজের মাল্যচন্দন লাভে ধন্য হয়েছিলেন। তূর্যধ্বনিতে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত ক'রে তিনি আবির্ভূত হন নি; স্নিগ্ধ সরসতায় পরিচিত পরিবেশকে সুমধুর ক'রে তাঁর প্রতিভা ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে উঠেছে। তাঁর লেখনী যেমন মধুক্ষরা, তাঁর সৃষ্টিও তেমনি অফুরন্ত। কিন্তু, ভাবলে বিস্মিত হতে হয় যে, প্রথম প্রকাশের পর সুদীর্ঘ একুশ-বাইশ বৎসর অতিক্রান্ত না হবার পূর্বে তিনি গ্রন্থাকারে কোনো রচনা প্রকাশ করেন নি।

বিভূতিভূষণের প্রথম গল্প-সংকলন 'রাণুর প্রথম ভাগ' প্রকাশিত হয় ১৩৪৪ সালে। দীর্ঘবিলম্বিত প্রস্তুতি-পর্ব সমাপ্ত ক'রে তিনি সেদিন থেকেই সাহিত্য-রচনায় পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করলেন। সত্যি কথা বলতে গেলে, রাণুর গল্পমালাতেই তাঁর স্বকীয় প্রতিভার পরিচয় সুপরিস্ফুট হয়ে উঠল। 'রাণুর প্রথম ভাগে'র মুখবন্ধে তিনি বলেছেন, "মাটি আর মন লইয়াই দেশ। বাংলাদেশের মাটি বড় ভিজা এবং মন বড় অশ্রুসিক্ত। আশার কথা মাটি আর বেশি দিন ভিজা থাকিবে না; নদা, খাল, বিল সব জাহান্নমে চলিয়াছে। মনের দিকটা!—যদি একদণ্ড অশ্রুর ধারা বন্ধ করা যায়, সেই জন্যই এই আয়োজনটুকু।" এই সংক্ষিপ্ত বক্রোক্তির মধ্যেই বিভূতিভূষণের শিল্পিমন নিজেকে প্রকাশ করেছে। 'রাণুর দ্বিতীয় ভাগে'র মুখবন্ধে বক্তব্যকে আরেকটু বিশদ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'দেশের সমস্যামন্থর হাওয়াটাকে একটু হালকা করা'ই তাঁর লেখার 'মিশন'। বস্তুত এখানেই বিভূতিভূষণের

বৈশিষ্ট্য। অসংখ্য সমস্যাভারে জর্জরিত জীবনের জটিলতাকে পাশ কাটিয়ে এর চিরন্তন রসপ্রবাহের উৎসসন্ধানই তাঁর শিল্পিমানসের মুখ্য ধর্ম। যুগের দাবিতে জীবনসমুদ্র যেখানে বিক্ষুব্ধ সেখানে তাঁর স্থান নয়। মর্ত্যের চিরপ্রবহমান জীবন-নির্ঝরিণীর তটপ্রান্তে ব'সে তিনি রসামৃতের সাধনায় তন্ময়। 'ছোট প্রাণ ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখকথা'র মধ্য দিয়ে জীবনের যে-সব অশ্রু-হাসির কাহিনী নিতান্তই সহজ সরল হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে, তার মধ্যেই তিনি অফুরন্ত রসের ভাণ্ডার নতুন ক'রে আবিষ্কার করেছেন। আমাদের অতি-পরিচিত ঘরোয়া পরিবেশে শাশুড়ী-বউ, ননদ-ভাজ, কর্তা-গিন্নী, নাতি-ঠাকুমার পরিহাস-রসিকতার মধ্যে যে অন্তঃপুরচারী রস অবগুণ্ঠিত, পারিবারিক শাসন-শৃঙ্খলা ও বিধিনিষেধের মধ্যেও যে চিরন্তন কিশোর-কিশোরীর পূর্বরাগ-অনুরাগ অভিসার-মিলন-লীলা অব্যাহত, তাসের মজলিসী আড্ডায় বন্ধুদের গালগল্পের মধ্যে সম্ভব-অসম্ভবের সীমানা পেরিয়েও যে জীবনরস উচ্ছলিত, বিভূতিভূষণের সাহিত্যে প্রধানত সেই রসেরই পরিবেশন। অবশ্য 'রাণুর প্রথম ভাগ' প্রকাশের পরও বহু বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে। এর মধ্যে বিভূতিভূষণের জীবনপরিক্রমা বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রসারলাভ করেছে। 'দৈনন্দিন' ঘরোয়া কথা শেষ ক'রে 'বর্ষায়' 'বসন্তে' তিনি চিরপুরাতন বিরহ-মিলনের কাহিনী রচনা করেছেন, শারদীয়া-হৈমন্তী-চৈতালীর বিচিত্র সুরের সঙ্গে সঙ্গত ক'রে জীবনের বীণায় কড়ি ও কোমলে নানান সুরের আলাপ করেছেন; চিরকেলে সুখদুঃখ যেমন এসেছে, তেমনি আবার চলতি কালের সমস্যাকেও একেবারে দূরে সরিয়ে রাখা সম্ভব হয় নি, 'কলিকাতা-নোয়াখালি-বিহারে'র কথাও তাঁকে বলতে হয়েছে। কাজেই কেবল সহজ সুরে সহজ কথাই নয়, গভীর সুরে গভীর কথাও আমরা তাঁর কাছে শুনেছি। জীবন সম্পর্কে রসিকচিত্তের চিরন্তন 'প্রশ্ন'কেও যেমন তিনি এড়িয়ে যেতে পারেন নি, তেমনি বিহারের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবিধ্বস্ত জীবনের পটভূমিকায় এ যুগের ভারতবর্ষের সবচেয়ে জটিল হিংসা-অহিংসার সমস্যাও তাঁর রচনাকে আলোড়িত ক'রে তুলেছে।

শুধু বহুবিচিত্র ছোট-গল্পেই নয়, উপন্যাসের বৃহত্তর পরিধিতে জীবনের পূর্ণাঙ্গ রূপের প্রতিফলনেও তাঁর সৃজনী-শক্তির নব-নব পরিচয় রসগ্রাহী পাঠক-সমাজকে পরিতৃপ্ত করছে। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'নীলাঙ্গুরীয়' প্রকাশিত হয় ১৯৪২ সালে। আমাদের প্রেমোপাখ্যান-প্লাবিত কথা-সাহিত্যে তরুণ-তরুণীর হৃদয়-বিনিময়ের বিষণ্ণ-মধুর রহস্য-গভীরতায় বিভূতিভূষণেরও যে নতুন কথা বলার আছে তারই উজ্জ্বল স্বীকৃতি 'নীলাঙ্গুরীয়'। তারপর 'স্বর্গাদপি গরীয়সী', 'নব-সন্ন্যাস' ও 'তোমরাই ভরসা' প্রভৃতি উপন্যাসে লেখকের বৃহত্তর জীবন-পরিক্রমা বিচিত্র রূপে ও রসে বাংলা কথা-শিল্পকে সমৃদ্ধতর ক'রে তুলেছে। কিন্তু 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' জননীদের কথাতেই হোক, আর জন্মভূমির উদ্ধারব্রতে 'নব-সন্ন্যাস'-ধর্মে দীক্ষিত বীর-সন্তানদের কাহিনীতেই হোক্, ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ মুখ্যত হৃদয়-বেদনারই শিল্পী। স্বভাবতই উপন্যাসের বিপুল আয়তনে সঙ্ঘাতমুখর জীবনপ্রবাহের তরঙ্গশীর্ষে চিরপ্রবহমান নরনারীর জটিল কাহিনীবিন্যাসে কথা-শিল্পীর নবনবায়মান শক্তিমত্তার পরিচয় স্ফুরিত হয়েছে; কিন্তু বিভূতিভূষণের ছোট-গল্প আর বিভূতিভূষণের উপন্যাস পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক হয়েই তাঁর শিল্পিমানস ও সৃজনীশক্তির পূর্ণাঙ্গ পরিচয় উন্মীলিত করছে।

তবে বাংলা কথা-সাহিত্যে বিভূতিভূষণের প্রাথমিক প্রতিষ্ঠা মুখ্যত হাস্যরসিক হিসেবেই। এবং সেখানেই তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয়। হাস্যরসিক কথাটি অবশ্য বড় ব্যাপক এবং ব্যাপক ব'লেই অস্পষ্ট। আমাদের সাহিত্যে স্থূল এবং অশ্লীল ভাঁড়ামো থেকে অতি-সূক্ষ্ম রসিকতাও হাস্যরসের এলাকাভুক্ত। বিভূতিভূষণের হাস্যরসাত্মক গল্পেরও প্রকার-ভেদ আছে। তামাশা, কৌতুক ও রঙ্গরস থেকে অতি উচ্চাঙ্গের রসিকতা পর্যন্ত বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ের হাসি তিনি দু'হাতে ছড়িয়ে চলেছেন। কিন্তু হাস্যরসিক হিসেবে তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে, তাঁর হাসি যেমন সংযত ও সুন্দর, তেমনি তা নির্দোষ ও নির্মল। তা কখনোই ব্যক্তিগত অসূয়া বা বিদ্বেষপ্রসূত নয়, এবং সেজন্যেই তাতে কুটিল শ্লেষ বা তীব্র ব্যঙ্গের কশাঘাত থাকে না। পক্ষান্তরে সে হাসি

কোনো বিশেষ চপল মুহূর্ত বা কৌতুককর ঘটনা-সংস্থানের ওপরও সর্বদা নির্ভর করে না। জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে গভীর অন্তর্দৃষ্টির ফলেই সে হাসির উদ্ভব। গভীরতম বেদনাবোধের মধ্যেই তার সৃষ্টি, সুতরাং চেতনার মর্মমূলেই তার প্রতিষ্ঠা। নীলকণ্ঠের স্ফুরিত ওষ্ঠাধরের স্মিতহাসির সঙ্গেই বুঝি তার তুলনা দেওয়া চলে।

বক্তব্য বিশদতর ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। বিভূতিভূষণের ব্যক্তিত্ব বিশ্লেষণ করলে তাতে তিনটি মহল খুঁজে পাওয়া যাবে। মানুষ বিভূতিভূষণ, দার্শনিক বিভূতিভূষণ ও শিল্পী বিভূতিভূষণ। মানুষ বিভূতিভূষণ সূক্ষ্ম-অনুভূতিশীল রসিক-চিত্তের অধিকারী। জীবনের গভীর রহস্য প্রধানত বেদনার মধ্য দিয়েই তাঁর কাছে ধরা পড়েছে। মর্মবিদারী সে বেদনার অশ্রুতে তাঁর হৃদয় কানায়-কানায় পূর্ণ। ব্যক্তিগত জীবনে এই ট্রাজিক পরিণামে আশাহত বিভ্রান্ত মানুষের কণ্ঠে আর্তনাদই শুধু শুনতে পাওয়া যায়—

Life's but a walking shadow ; a poor player
That struts and frets his hour upon the stage,
And then is heard no more ; it is a tale
Told by an idiot, full of sound and fury,
Signifying nothing.

জীবনের রঙ্গমঞ্চে কিছুক্ষণের জন্যে বৃথা আস্ফালন নির্বোধের অর্থহীন কাহিনী তো বটেই, কিন্তু যে স্বয়ং সেই অর্থহীন কাহিনীর একজন অসহায় অভিনেতা, সে যখন তার নিজের জীবনের চরম সর্বনাশের মুখে এই নিষ্ঠুর সত্য উপলব্ধি করে তখন তার পক্ষে সেটা মর্মান্তিক হাহাকারেই পর্যবসিত হয়। কিন্তু যে একটু দূরে দাঁড়িয়ে, তটস্থ হয়ে, নির্লিপ্ত মন নিয়ে এই জীবলীলা প্রত্যক্ষ করতে পারে, সে বলে—

মাটির ঢেলা, মাটির ঢেলা,
রঙ দিল কে তোর গায়ে ?
গড়লে তোরে কোন্ আদলের ছাঁচে ?
ভুখ্ দিলে যে বুক দিলে যে
দুখ দিতে সে ভুলল না,
মৃত্যু দিলে লেলিয়ে পাছে পাছে।

কোন্ মেলাতে সাজিয়ে দিলে
বিকিয়ে দিলে কার হাতে ?
কোন্ খেয়ালির খেলেনা তুই হায় রে !
কোলের পরে তুলিস্ কভু
মাটির পরে যাস্ প'ড়ে—
মলিন ধুলা লাগে সকল গায় রে !

এই তো দার্শনিকের দৃষ্টি ! এই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে গেলে মানুষের সুখদুঃখ হাসিকান্নার লীলা তো কোন্ খেয়ালির পুতুল নিয়ে খেলারই সমকক্ষ। আর শেষ পর্যন্ত যা পুতুল খেলার অধিক কিছুই নয়, তা নিয়ে মানুষের এত আসক্তি, এত অশ্রুপাত, এত উল্লাস,—দুনিয়ায় এর চেয়ে বড় হাসির জিনিস আর কি আছে ? বিভূতিভূষণের আছে এই দৃষ্টি, এই দার্শনিক মন। সেজন্যেই তাঁর মানবসত্তা জীবনের গভীরে তলিয়ে গিয়ে যে আনন্দ-বেদনার কাহিনীগুলো সংগ্রহ ক'রে আনে তাঁর দার্শনিক-সত্তা সে-সব কাহিনীর কুশীলবদের strutting ও fretting দেখে না-হেসে পারে না। তাদের জীবনের সুখদুঃখ তাদের কাছে সত্য তো বটেই, গভীর ভাবেই সত্য ; কিন্তু হতভাগ্যরা জানে না, তারা খেলাঘরের পুতুল বৈ তো নয় ! মানবজীবনের গভীরে এই মায়ার খেলা দেখেই সম্যক্‌দ্রষ্টা দার্শনিকের মুখে ফুটে ওঠে হাসি। সে হাসি বিদ্রূপের হাসি নয়, মায়াগ্রস্ত মানুষের প্রতি সমবেদনার অশ্রু মাখানো আছে সে হাসিতে। এই অশ্রুসিক্ত হাসিই বিভূতিভূষণের সাহিত্যের স্থায়ী ভাব। সখ্য বাৎসল্য মধুর—যে রসই তিনি পরিবেশন করুন না কেন, হাস্যরসই তাঁর অঙ্গী রস। তাই জীবনের গভীর দুঃখও তাঁর হাতে উৎকৃষ্ট হিউমার বা হাস্যরসে রূপান্তরিত হয়। প্রসঙ্গত আরেকটি কথা এখানে ব'লে নেওয়া প্রয়োজন। বিভূতিভূষণ মানুষকে শুধু স্রষ্টার হাতে যথেচ্ছচালিত ক্রীড়নকমাত্রই মনে করেন না। তাঁর দৃষ্টিতে মানুষের সুখদুঃখের মূলে আছে তার নিজেরই অনেকখানি হাত। চরিত্রের মধ্যেই যেমন ট্র্যাজেডির বীজ নিহিত থাকে, তেমনি মানুষেরই কোনো মূঢ় আচার-আচরণ বা কামনা-বাসনা ও ভক্তি-বিশ্বাসের মধ্যেই নিহিত থাকে হাসির

উপাদান ; বাহ্যিক পরিবেশ বা ঘটনাসংস্থান কিংবা জীবন-রঙ্গমঞ্চের অদৃশ্য পরিচালকের খেয়ালখুশিতে তা অনিবার্য হয়ে ওঠে বটে, কিন্তু তার মূল উপাদান থাকে চরিত্রের মধ্যেই লুকায়িত।

বিভূতিভূষণের ব্যক্তিত্বের তৃতীয় মহলে আছেন শিল্পী বিভূতিভূষণ। এই শিল্পী একাধারে কবি ও পরিহাসরসিক। তাই তাঁর সাহিত্যে যেমন একদিকে আছে সুকুমার সৌন্দর্যবোধ ও উচ্চাঙ্গের কবিকল্পনা, তেমনি অন্যদিকে আছে কৌতুক-কুতূহলী পরিহাসরসিক চিত্তের সরসতা। এই উভয় গুণের সম্মিলনে তাঁর শিল্পকর্ম রসমধুর কাব্যসুষমায় মণ্ডিত হয়েছে।

২

ওপরে বিভূতিভূষণের ব্যক্তিত্বের যে তিন মহলের কথা বলা হ'ল, তাঁর সমস্ত সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যেই যে এই তিনেরই সম্যক্ প্রকাশ হয়েছে এমন নয়। কোথাও হয়তো তাঁর মানবসত্তারই প্রকাশ হয়েছে সার্থক। সেখানে মানুষের গভীরতম সুখদুঃখ সুখদুঃখের রূপেই ফুটে উঠেছে। সেখানে হাস্যরসিক হয় প্রচ্ছন্ন, নয় একেবারেই অনুপস্থিত রয়েছেন। কোথাও দার্শনিক-সত্তাই প্রধান হয়ে উঠেছে, সেখানে রসিকতা প্রধানত তত্ত্বাশ্রয়ী, মানবসত্তার অনুপস্থিতিতে বাস্তব জীবনের সুখদুঃখ যথাযোগ্য মর্যাদা পায় নি। আবার কোথাও কেবল শিল্পিসত্তারই প্রকাশ। সে-সব ক্ষেত্রে শিল্প যেমন জীবনের গভীরে প্রবেশাধিকার পায় নি, তেমনি বিভূতিভূষণের দার্শনিক-দৃষ্টিসঞ্জাত উৎকৃষ্ট হাস্যরসেরও অভাব ঘটেছে। যেখানে কবিদৃষ্টি বড়, সেখানে শুধু উচ্চাঙ্গের কাব্যকলারই সৃষ্টি, আর যেখানে শিল্পিচেতনার পরিহাসরসিক দিকটাই মুখ্য সেখানে এক ধরনের মধুর রঙ্গরসে পরিবেশ মুখরিত। উভয় ক্ষেত্রে শিল্পকর্মই প্রধান এবং পরিবেশনের চমৎকারিত্বের ওপরই রসের উৎকর্ষ নির্ভরশীল। কিন্তু যেখানে বিভূতিভূষণের তিনটি সত্তারই যুগপৎ অখণ্ড বিকাশ সম্ভব হয়েছে সেখানেই তাঁর সাহিত্যের চরমোৎকর্ষ। সেখানেই তাঁর শিল্পসৃষ্টি নিজস্ব মহিমায় গৌরবান্বিত।

উদাহরণস্বরূপ 'রাণুর প্রথম ভাগ' গল্পটির উল্লেখ করা যেতে পারে। এখানে বিভূতিভূষণের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ প্রকাশ। আট বছরের মেয়ে রাণুর অকালপক্ক গৃহিণীপনাই গল্পটির উপজীব্য। ঠাকুমার মত প্রবীণা

গৃহিণী সেজে সংসারের অসংখ্য দুর্ভাবনায় তার দিন কাটে, তাই 'প্রথম ভাগের পড়াটুকুও তার কিছুতেই শেষ ক'রে ওঠার সময় হয় না। শিশুরা বয়স্কদের অনুকরণে তাদের পুতুলের খেলাঘরে নিজেদের সংসার রচনা করে, এখানে রাণু বয়স্কদের সংসারকেই তার পুতুলের খেলাঘর ক'রে তুলেছে। শিশুর এই প্রবীণাসুলভ কথাবার্তা ও আচার-আচরণই গল্পের হাস্যরসের উৎসস্থল। কিন্তু এখানেই এর রস-পরিবেশন সমাপ্ত হয়ে যায় নি। জগজ্জননীকে ঘরের মেয়ে ক'রে বাঙালীরা আগমনী-বিজয়ার হাসিকান্নার মধ্য দিয়ে যে লীলারস আস্বাদন করে, বর্তমান গল্পটিও শেষ পর্যন্ত সেই লীলার ক্ষেত্রেই উপনীত হয়েছে। গৌরীদানের পুণ্যলোভাতুর পিতার আগ্রহাতিশয্যে রাণু আট বছর বয়সেই তার পুতুলের সংসার ছেড়ে বধূ সেজে শ্বশুরঘর করতে রওনা হয়েছে। আর সংসারের প্রবেশ-পথে দাঁড়াতেই ওর অসময়ের গৃহিণীপনাটা স'রে গিয়ে ওর মধ্যেকার শিশুটি বিস্ময়ে কৌতূহলে অভিভূত হয়ে পড়েছে। বিদায়-মুহূর্তে প্রমাণিত হয়েছে যে ওর সব হাসির অন্তরালে এতদিন গোপনে শুধু অশ্রুই জমা হয়ে উঠছিল। এই অশ্রুসিক্ত হাসিটুকুকে হালকা সুরে হেসে উড়িয়ে দেবার উপায় নেই, কারণ এ যে আমাদের নিত্যকার জীবনরসেরই রসায়ন, আর এ রসায়ন প্রস্তুত হয়েছে মানুষে-দার্শনিকে-শিল্পীতে মিলে যে একটি বিশিষ্ট সৃজনীপ্রতিভা তারই নির্মাণশালায়। তাই স্বাদে গন্ধে তা হয়ে উঠেছে অমন অপূর্ব। শুধু 'রাণুর প্রথম ভাগে'ই নয়, আমাদের ঘরোয়া পরিবেশে শিশুমহলের মধ্যে যে একটি অফুরন্ত রসের ভাণ্ডার আছে, বিভূতিভূষণ তার দ্বারটি আমাদের কাছে উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছেন। শিশুকণ্ঠের কাকলিতে যে অমৃত, শিশুচরিত্রের বিশ্লেষণে যে হাস্যোদ্দীপক সরসতা আছে, তাকে অবলম্বন ক'রে তিনি সখ্য-বাৎসল্যের সঙ্গে হাস্যরস মিশিয়ে এক নতুন মিশ্ররস পরিবেশন করেছেন। বস্তুত তাঁর হাতে গড়া বাংলা ছোটগল্পের যশোদামূর্তিটি বড়ই চমৎকার! বর্তমান সংকলনে এ পর্যায়ের গল্পগুলোর প্রতিনিধি হিসেবে আছে ননীচোরা, পীতু আর মাসী। 'ননীচোরা' গল্পে অবশ্য শিশু-চরিত্রটি উপলক্ষ মাত্র। বালগোপালের সেবায় আত্মনিবেদিত একটি বৈষ্ণব পরিবারের ভক্তিমতী

শাশুড়ীবধূর বিশ্বাসপরায়ণতা এর রসসৃষ্টির উপাদান হয়েছে। ভগবান শিশুর রূপে আমাদের ঘরে জন্মগ্রহণ ক'রে ভক্তের সেবা ও পরিচর্যা গ্রহণ করেন, এই বিশ্বাসই শিশুর আচার-আচরণকে শাশুড়ীবধূর কাছে রহস্যময় ক'রে তুলেছে। এমন কি গোপালের সেবায় নিবেদিত নৈবেদ্যের থালা থেকে ক্ষীরের নাড়ু অপহৃত হতে দেখে শাশুড়ীর মনে গোপালের প্রত্যক্ষ আবির্ভাব-সম্ভাবনাই গভীরতর হয়ে উঠেছে। গল্পটিতে যথাযথ নিষ্ঠা, বিশ্বাস ও মমতার সঙ্গে বাৎসল্য রসের পরিবেশন অতি উপাদেয়। সঙ্গে সঙ্গে শিশুর স্বভাব-সুলভ মিষ্টান্নপ্রীতি ও চৌর্যবৃত্তিই যে শাশুড়ীর ভক্তিবিহ্বলতার মূল কারণ, এ কথা ব'লে লেখক এর হাস্যলঘুতার দিকটিও আমাদের কাছে উদ্ঘাটিত করতে কুণ্ঠিত হন নি। আর এখানেই তাঁর পরিহাসরসিক চিত্তের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

জীবনের অনেক গভীর ভাবাবেগ ও ভক্তিবিশ্বাসের মূল যে কত মিথ্যা মোহ ও অবাস্তব মায়ার ছলনাজালে জড়িত এবং সে কারণেই মানুষের গভীরতম সুখদুঃখও ক্ষেত্রবিশেষে যে কত হাস্যোদ্দীপক, এই দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে কালিকা, বৈরাগীর ভিটেয়, হৈমন্তী ও বর্ষায় প্রভৃতি গল্পে। 'কালিকা' গল্প একটি ডানপিটে গেছো-মেয়ের কাহিনী। তারই চক্রান্তে তার শ্বশুরপরিবারে ডাকাতি করতে গিয়ে কি ক'রে ভৈরব ডাকাত মন্দিরপ্রাঙ্গণের ঈষত্তরলিত অন্ধকারে কালিকা-মূর্তি প্রত্যক্ষ ক'রে ভীত বিস্মিত ও অভিভূত হয়ে ডাকাতির কথা ভুলে গেল এবং পরিবারটি রক্ষা পেল তারই চমকপ্রদ কাহিনী। এখানে ভৈরব ডাকাতের কালিকা-দর্শন তার নিজের কাছে সমস্ত সন্দেহ-সংশয়ের অতীত প্রত্যক্ষ সত্য, অথচ তার পেছনে আছে ঐ প্রত্যুৎপন্নমতি গোছা-মেয়েটির চাতুরী। 'বৈরিগীর ভিটেয়' রোমাঞ্চকর ভৌতিক পরিবেশে ভূতের ভয়ও বাস্তব সত্য হয়ে উঠেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হ'ল যে, যাকে ভৌতিক প্রক্রিয়ার ফল ব'লে গ্রহণ করা হয়েছে, আসলে তার মূলে আছে সিদ্ধি-সেবন-সঞ্জাত নেশার প্রভাব। এমনি ক'রে ডাকাতের কালীভক্তি এবং জনসাধারণের ভূতের ভয় শেষ পর্যন্ত নিতান্তই হাস্যকর ব'লে প্রতিভাত হয়েছে।

'বর্ষায়' ও 'হৈমন্তী' গল্প দুটি ব্যর্থ প্রেমের করুণ রসে অভিসিঞ্চিত।

রাজপুত অরূপকুমার আর রাজকুমারী কঙ্কাবতীর প্রবালদ্বীপের প্রেমের স্বপ্নজড়িত রূপকথার রাজ্য পেরোতে না-পেরোতেই আট বৎসর বয়স্ক শৈলেন ভালবেসেছিল তার সেজবউদির সই নব-পরিণীতা পঞ্চদশী নয়নতারাকে। সেই বাল্যমোহ নয়নতারার স্বামীর প্রতি তীব্র ঈর্ষায় রূপান্তরিত হয়ে কি ক'রে এক ভৌতিক পরিণতিতে দুঃসহ বিচ্ছেদের সৃষ্টি করলে, বন্ধুদের আড্ডায় ব'সে পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স্ক শৈলেন তারই রসোদ্গার শেষ ক'রে বলছে,—"আমি জীবনে আর কাউকেই চাই নি, আমার জীবনের চিত্রপটে নয়নতারাকে অবলুপ্ত ক'রে আর কারুর ছবিই ফুটতে পায় নি। পনেরো বৎসরের অটুট যৌবনশ্রীতে প্রতিষ্ঠিত ক'রে তারই ওপর নিবদ্ধদৃষ্টি আমি তাকে অতিক্রম ক'রে আমার পঁয়ত্রিশ বৎসরে এসে পড়েছি—সূর্য যেমন যৌবনশ্যামলা পৃথিবীকে অতিক্রম ক'রে অপরাহ্নে হেলে পড়ে।" নয়নতারার প্রতি শৈলেনের বিরহ যে নিবিড় ভাবেই সত্য সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু পঞ্চদশবর্ষীয়া বিবাহিতা তরুণীর প্রতি আট বৎসর বয়স্ক শিশুর বাল্যমোহকে সারা জীবন প্রেমের মর্যাদা দিয়ে অন্তরে লালন করার যে মাত্রাহীন অসঙ্গতি, তাই এ কাহিনীর বর্ষা-বিরহকে অন্তরে অন্তরে ব্যঙ্গ ক'রে চলেছে। 'হৈমন্তী' গল্পটিও ব্যর্থ প্রেমের সুগভীর বেদনায় করুণ। হেমন্ত-গোধূলিতে মাথায় ফসলের বোঝা, কোলে শিশু, একটি সুখী সাঁওতাল দম্পতিকে দেখে প্রৌঢ় ইঞ্জিনিয়ার সুরেশ্বরের নিজের বঞ্চিত ও নিঃসঙ্গ জীবনের দিকে চোখ ফিরল। মনে পড়ল প্রথম যৌবনের একটি উপেক্ষিত প্রেমের কাহিনী। তার পর বোল্ট-নাট-জয়েস্ট-অ্যাঙ্গল-শীটের তলায় তলিয়ে গেল হৃদয়ের সেই কোমল অনুভূতিটি। জীবনে সম্মান প্রতিপত্তি সবই জুটেছে, কিন্তু তবু হৃদয়ের সে ফাঁক আর ভরাট হ'ল না। অতিক্রান্ত-যৌবনে প্রথম-যৌবনের অবহেলিত প্রেমকে স্মরণ ক'রে এই যে দীর্ঘশ্বাস, এর যথাযোগ্য মর্যাদা গল্পটিতে পেয়েছে। বিশেষত যে-নারী বধূবেশে বাসরঘরে এসে প্রেমিকের জীবন ধন্য করতে পারত সে যখন স্টেনো-টাইপিস্টের পদপ্রার্থিনী হয়ে প্রতিপত্তিবান ইঞ্জিনিয়ারের কাছে প্রত্যাখ্যাতা হয়ে ফিরে গেল, তখন ভাগ্যের

এই নিষ্ঠুর পরিহাস হতভাগ্য সুরেশ্বরের অতনু-বিলাপকে অধিকতর করুণ ক'রে তুলেছে। কিন্তু যখন দেখতে পাওয়া যায় যে, একটি ফোটোর দোকানে নিজের ফোটোর পাশে একটি সুন্দরী তরুণীর ফোটো দেখতে পেয়ে তারই প্রতি প্রণয়াবেশের সৃষ্টি হয়েছে এবং সুরেশ্বর সেই স্বপ্নসর্বস্ব রোমান্সকেই অন্তরে প্রতিষ্ঠিত ক'রে সারা জীবন দুঃখের পসরা ব'য়ে চলেছে, তখন মানুষের ভাবাবেগের এই যুক্তিহীন মূঢ়তার মধ্যে যে হাস্যকরতা আছে তারই কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আলোচ্য দুটি গল্পে অবশ্য হাস্যরস প্রচ্ছন্ন, বিশেষত শেষোক্ত গল্পটিতে করুণ-বিপ্রলম্ভের বিষণ্ণ বেদনাই মুখ্য।

ভাবাবেগের আত্যন্তিকতা মানুষের আচার-আচরণে অসঙ্গতি সৃষ্টি ক'রে কি ভাবে উপহাস্য হয়ে ওঠে তার উদাহরণ 'শ্যামলরাণী', 'ধর্মতলা-টু-কলেজস্কোয়ার' ও 'সম্পত্তি' গল্প। 'শ্যামলরাণী' গল্পে শ্যামলী গাভীর প্রতি সুধার আসক্তি এবং বিয়ের পরে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে শ্যামলীবিহীন দিন-গুলোর দুঃখপ্রদ চিন্তা সুধাকে ভাবী বরের নিকট উদ্ভট পত্রালাপে প্রেরণা যুগিয়েছে। শ্যামলীর প্রতি আসক্তি গভীর ব'লেই হাস্যোদ্দীপক লিপিলিখন এখানে উপাদেয় হয়ে উঠেছে। মানুষের সঙ্কোচ, লজ্জা ও দুর্বলতার ফলে জীবনের কত দুর্লভ মুহূর্তও যে হাতের মুঠোয় এসে অপচিত হয়ে যায় তারই উদাহরণ 'ধর্মতলা-টু-কলেজস্কোয়ার' গল্পটি। একটি নবদম্পতি নির্জনতায় পরস্পরের সঙ্গলাভের জন্যে সংসারের ভাণ্ডার থেকে অতিকষ্টে কয়েকটি ঘণ্টা অপহরণ ক'রে পথে বেরিয়েও কি ভাবে তা নষ্ট করতে বসেছে ট্রামের ভিড়ের মধ্যে তাদের ক্ষণরচিত অন্তঃপুরে প্রবেশ ক'রে লেখক সে কাহিনী উদ্ঘাটিত করেছেন। এখানে দুঃসাহসিকা নববধূর বৈসাদৃশ্যে ব্রীড়াবনত তরুণের অসহায় দুর্বলতা কৌতুকাবহ পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। আত্মাভিমান যে মানুষের আচরণকে কতটা অন্যায়ের পথে নিয়ে যেতে পারে 'সম্পত্তি' গল্প তারই উদাহরণ। বাতাসপুরের ছ-আনি দশ-আনির মালিক উমেশ পাল ও ভৈরব পালের পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা একটি চোরের শাস্তিবিধান ব্যাপারে উৎকট হয়ে উঠল। চোরকে কোন্ পক্ষ শাস্তি দেবে—এই

নিয়ে উভয় পক্ষের দারোয়ানদের মধ্যে ঝগড়াতে অবশেষে ছ-আনিরই হ'ল জয়, কারণ চোরাই মাল তাদের, সুতরাং চোরও তাদের সম্পত্তি, অতএব তাকে শাস্তি দেবার অধিকারী একমাত্র তারাই। এই আত্মাভিমানের ফলে ছ-আনির জমিদার চোরকে হাতীর ওপর চড়িয়ে জয়বাদ্য বাজিয়ে দশ-আনিদের নাকের ওপর দিয়ে নিয়ে গিয়ে তাকে এক বিরাট ভূসম্পত্তি দান ক'রে এল। চোর শাস্তি পেল কি না সে কথা বড় নয়, বড় হ'ল প্রতিদ্বন্দ্বীকে অপমান ও জব্দ ক'রে দম্ভ ও আত্মাভিমান চরিতার্থ হ'ল কি না, তাই।

পশুচরিত্র নিয়ে 'আদরিণী', 'মহেশ' বা 'কালাপাহাড়ে'র মত সার্থক গল্প বাংলা সাহিত্যে অল্পই রচিত হয়েছে। এদিক দিয়ে 'কুইন-অ্যান' গল্পটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ গল্পে অশ্বিনী কুইন-অ্যান রসসৃষ্টির উপলক্ষ মাত্র। আসলে রায়-সাহেব ননীগোপাল চক্রবর্তী জমিদার অ্যাণ্ড অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটই এর লক্ষ্য। ইংরেজ আমলে শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের কৃপা ও করুণাপ্রার্থী 'প্রভুর পদে সোহাগমদে দোদুল কলেবর' যে একদল জীবের সৃষ্টি হয়েছিল রায়-সাহেব ননীগোপাল তাদেরই একজন। কৌতুকমিশ্র সরস-ব্যঙ্গের পুটপাকে এ গল্পের রস কাহিনীর কুহরে কুহরে প্রবেশ করেছে। দুর্ভাগ্য বশত যন্ত্রযুগের প্রাদুর্ভাবে, মধ্যযুগীয় শিভ্যল্রির দিন গত হয়েছে, এ যুগে ঘোড়-দৌড়ের-মাঠ ছাড়া অশ্ব-অশ্বিনীদের আর তেমন কদর নেই। সম্প্রতি রায়-সাহেবদেরও ইজ্জৎ নষ্ট হয়েছে। কিন্তু মধ্যযুগের অশ্বারোহী বীরেন্দ্রবৃন্দের বিংশ-শতকীয় প্রহসন-সংস্করণ রায়সাহেব চক্রবর্তীর উচ্চারোহণ-আকাঙ্ক্ষায় 'কুইন-অ্যান'-এর অন্তিম পরিহাস বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠায় অক্ষয় হয়ে রইল।

বর্তমান সংকলনের বাকি তিনটি গল্প শিল্পী বিভূতিভূষণের অনবদ্য শিল্পনৈপুণ্যের সার্থক উদাহরণ। 'চৈতালী' গল্পে অবশ্য তাঁর কবিসত্তাই বড় হয়ে উঠেছে। পশুপতিনাথ দর্শনে বেরিয়ে হিমালয়ের বিভিন্ন স্তরের প্রাকৃতিক বর্ণনা, মঠধারী রহস্যময় পুরুষের আবির্ভাব ও তিরোভাব, ধ্যানমগ্ন মহাদেবের বিরাট মূর্তি-দর্শন ও সর্বশেষে হিমালয়ের বুক জুড়ে তাঁর প্রলয়তাণ্ডবের চমকপ্রদ কাহিনী এ গল্পটিকে উৎকৃষ্ট কাব্যের মর্যাদা দিয়েছে।

'দ্রব্যগুণ' ও 'বরযাত্রা' গল্প দুটি পরিহাসরসিক বিভূতিভূষণের কৌতুকপ্রিয়তার অতুলনীয় নিদর্শন। দুটি বোতল—তাও একটি খালি শরবতের এবং অন্যটি ফিনাইলের—তাকে অবলম্বন ক'রেই 'দ্রব্যগুণে'র উৎপত্তি। বড়-দিনের বাজার থেকে শৈলেনকে দুটি বোতল বগলে ক'রে ফিরতে দেখে তাকে মদ্যাসক্ত ভেবে সুরাপায়ী বাল্যবন্ধুর রসিকতা ও সদুপদেশ, পরদিন প্রতিবেশী, সুহৃৎ ও শুভানুধ্যায়ী মহলে ভর্ৎসনা এবং সর্বশেষে তার চরিত্রদোষ সংশোধনের জন্যে তার গৃহে কংগ্রেসী স্বেচ্ছাসেবক দলের পিকেটিং পর্যন্ত ঘটনাবলীর উপাদেয় বর্ণনা বিভূতিভূষণের লিপিকুশলতার চূড়ান্ত স্বাক্ষর বহন ক'রে এনেছে। মানুষের জ্ঞানবিশ্বাস ও বিচার-পদ্ধতির আপাত-গুরুগাম্ভীর্যের মূলও যে কত অকিঞ্চিৎকর হতে পারে তাই এই গল্পের প্রতিপাদ্য, কিন্তু পরিবেশনগুণে লেখক যে কত তুচ্ছ ঘটনাকে অবলম্বন ক'রে কত উৎকৃষ্ট শিল্প সৃষ্টি করতে পারেন, এটি তারও শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। 'বরযাত্রী' গল্পে অপ্রত্যাশিত ঘটনা ও বিচিত্র পরিবেশের মধ্যে বরযাত্রী দলের দুর্গতি ও লাঞ্ছনার কাহিনী অট্টহাসির সৃষ্টি করে। শিবপুরের গণশা ও ত্রিলোচন, ঘোৎনা ও রাজেন, গোরাচাঁদ ও কে গুপ্ত—এদের প্রত্যেকেরই চরিত্রগত কিছু-কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, এবং সেই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থেকেও হাস্যরস উৎসারিত হয়েছে, কিন্তু সমগ্রভাবে বরযাত্রী দলটিকে আশ্রয় ক'রে যে হাস্যরস সৃষ্টি হয়েছে তা প্রধানত ঘটনাসংস্থানজনিত; অবশ্য তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপের আতসবাজি ও কৌতুকাবহ বর্ণনার ফুলঝুরি। পূর্বেই বলা হয়েছে, শেষোক্ত গল্প-গুলোতে পরিবেশনের রসই মুখ্য। শিল্পায়ন-সৌকুমার্যের গুণেই সেগুলোর চমৎকারিত্ব। জীবনশিল্পী হিসেবে যেমন বিভূতিভূষণের সংযমসুন্দর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি জীবনের অশ্রুসিক্ত বেদনাকেও হাস্যমধুর ক'রে তুলেছে, তেমনি কাব্যশিল্পী হিসেবে শুচিশুভ্র পরিহাসরসিকতা তাঁর রচনাকে করেছে সরস ও প্রসাদগুণান্বিত।

বঙ্গবাসী কলেজ
আষাঢ় ১৩৫৫

জগদীশ ভট্টাচার্য

রাণুর প্রথম ভাগ

১

আমার ভাইঝি রাণুর প্রথম ভাগের গণ্ডি পার হওয়া আর হইয়া উঠিল না।

তাহার সহস্রবিধ অন্তরায়ের মধ্যে দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য,— এক, তাহার প্রকৃতিগত অকালপক্ক গিন্নীপনা, আর অন্যটি, তাহার আকাশচুম্বী উচ্চাকাঙ্ক্ষা। তাহার দৈনিক জীবনপ্রণালী লক্ষ্য করিলে মনে হয়, বিধাতা যদি তাহাকে একেবারে তাহার ঠাকুরমার মত প্রবীণা গৃহিণী এবং কাকার মত এম. এ., বি. এল. করিয়া পাঠাইতেন, তাহা হইলে তাহাকে মানাইতও ভাল এবং সেও সন্তুষ্ট থাকিত। তাহার ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর পরবর্ত্তী · নারীত্ব হঠাৎ কেমন করিয়া যেন ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে আসিয়া পড়িয়া তাহার ক্ষুদ্র শরীর-মনটিতে আর আঁটিয়া উঠিতেছে না—রাণুর কার্য্যকলাপ দেখিলে এই রকমই একটা ধারণা মনে উপস্থিত হয়। প্রথমত, শিশুসুলভ সমস্ত ব্যাপারেই তাহার ক্ষুদ্র নাসিকাটি তাচ্ছিল্যে কুঞ্চিত হইয়া উঠে—খেলাঘর সে মোটেই বরদাস্ত করিতে পারে না, ফ্রক জামাও না, এমন কি নোলক পরাও নয়। মুখটা গম্ভীর করিয়া বলে, আমার কি আর ও সবের বয়েস আছে মেজকা?

বলিতে হয়, না মা, আর কি—তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকল। রাণু চতুর্থ কালের কাল্পনিক দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনায় মুখটা অন্ধকার করিয়া বসিয়া থাকে।

আর দ্বিতীয়ত—কতকটা বোধ হয় শৈশবের সহিত সম্পর্কিত বলিয়াই—তাহার ঘোরতর বিতৃষ্ণা প্রথম ভাগে। দ্বিতীয় ভাগ হইতে

আরম্ভ করিয়া তাহার কাকার আইন-পুস্তক পর্য্যন্ত আর সবগুলির সহিতই তাহার বেশ সৌহার্দ্দ্য আছে, এবং তাহাদের সহিতই তাহার দৈনিক জীবনের অর্দ্ধেকটা সময় কাটিয়া যায় বটে, কিন্তু প্রথম ভাগের নামেই সমস্ত উৎসাহ একেবারে শিথিল হইয়া আসে। বেচারীর মলিন মুখখানি ভাবিয়া আমি মাঝে মাঝে এলাকাড়ি দিই—মনে করি, যাকগে বাপু, মেয়ে—নাই বা এখন থেকে বই স্লেট নিয়ে মুখ গুঁজড়ে রইল, ছেলে হওয়ার পাপটা তো করে নি; নেহাতই দরকার বোধ করা যায়, আর একটু বড় হোক, তখন দেখা যাবে 'খন।

এই রকমে দিনগুলা রাণুর বেশ যায়; তাহার গিন্নীপনা সতেজে চলিতে থাকে এবং পড়াশুনারও বিষম ধুম পড়িয়া যায়। বাড়ির নানা স্থানের অনেক-সব বই হঠাৎ স্থানভ্রষ্ট হইয়া কোথায় যে অদৃশ্য হয়, তাহার খোঁজ দুরূহ হইয়া উঠে এবং উপরের ঘর, নীচের ঘর হইতে সময়-অসময়ে রাণুর উঁচু গলায় পড়ার আওয়াজ আসিতে থাকে—ঐ ক-য়ে য-ফলা ঐক্য, ম-য়ে আকার ণ-য়ে হ্রস্বই ক-য়ে য-ফলা মাণিক্য বা পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল, অথবা তাহার রাঙা কাকার আইন মুখস্থ করার ঢঙে—হোয়ার অ্যাজ ইট ইজ, ইত্যাদি।

আমার লাগে ভাল, কিন্তু রাণুর স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তির এই রকম দিনগুলা বেশিদিন স্থায়ী হইতে পারে না। ভাল লাগে বলিয়াই আমার মতির হঠাৎ পরিবর্ত্তন হইয়া যায় এবং কর্ত্তব্যজ্ঞানটা সমস্ত লঘুতাকে ভ্রূভঙ্গী করিয়া প্রবীণ গুরুমহাশয়ের বেশে আমার মধ্যে জাঁকিয়া আসিয়া বসে। সনাতন যুক্তির সাহায্যে হৃদয়ের সমস্ত দুর্ব্বলতা নিরাকরণ করিয়া গুরুগম্ভীর স্বরে ডাক দিই, রাণু!

রাণু এ স্বরটি বিলক্ষণ চেনে; উত্তর দেয় না। মুখটি কাঁদ-কাঁদ করিয়া নিতান্ত অসহায় ভালমানুষের মত ধীরে ধীরে আসিয়া মাথা নীচু করিয়া দাঁড়ায়, আমার আওয়াজটা তাহার গলায় যেন একটা ফাঁস পরাইয়া টানিয়া আনিয়াছে। আমি কর্ত্তব্যবোধে আরও কড়া হইয়া উঠি, সংক্ষেপে বলি, প্রথম ভাগ। যাও।

ইহার পরে প্রতি বারই যদি নির্ব্বিবাদে প্রথম ভাগটি আসিয়া পড়িত

এবং যেন তেন প্রকারেণ দুইটা শব্দও গিলাইয়া দেওয়া যাইত তো হাতেখড়ি হওয়া ইস্তক এই যে আড়াইটা বৎসর গেল, ইহার মধ্যে মেয়েটাও যে প্রথম ভাগের ও-কয়টা পাতা শেষ করিতে পারিত না, এমন নয়। কিন্তু আমার হুকুমটা ঠিকমত তামিল না হইয়া কতকগুলা জটিল ব্যাপারের সৃষ্টি করে মাত্র—যেমন, এরূপ ক্ষেত্রে কোন কোন বার দুই-তিন দিন পর্য্যন্ত রাণুর টিকিটি আর দেখা যায় না। সে যে কোথায় গেল, কখন আহার করিল, কোথায় শয়ন করিল, তাহার একটা সঠিক খবর পাওয়া যায় না। দুই-তিন দিন পরে হঠাৎ যখন নজর পড়িল, তখন হয়তো সে তাহার ঠাকুরদাদার সঙ্গে চায়ের আয়োজনে মাতিয়া গিয়াছে, কিংবা তাঁহার সামনে প্রথম ভাগটাই খুলিয়া রাখিয়া তাহার কাকাদের পড়ার খরচ পাঠানো কিংবা আহার্য্য দ্রব্যের বর্ত্তমান দুর্ম্মূল্যতা প্রভৃতি সংসারের কোন একটা দুরূহ বিষয় লইয়া প্রবল বেগে জ্যাঠামি করিয়া যাইতেছে, অথবা তাঁহার বাগানের যোগাড়যন্ত্রের দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইয়া সব বিষয় নিজের মন্তব্য দিতে দিতে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমার দিকে হয়তো একটু আড়চোখে চাহিল, বিশেষ কোন ভয় বা উদ্বেগ নাই—জানে, এমন দুর্ভেদ্য দুর্গের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে, যেখানে সে কিছুকাল সম্পূর্ণ নির্ব্বিঘ্ন।

আমি হয়তো বলিলাম, কই রাণু, তোমায় না তিন দিন হ'ল বই আনতে বলা হয়েছিল?

সে আমার দিকে না চাহিয়া বাবার দিকে চায়, এবং তিনিই উত্তর দেন, ওহে, সে এক মহা মুশকিল ব্যাপার হয়েছে, ও বইটা যে কোথায় ফেলেছে—

রাণু চাপা স্বরে শুধরাইয়া দেয়, ফেলি নি—বল, কে যে চুরি ক'রে নিয়েছে—

হ্যাঁ, কে যে চুরি ক'রে নিয়েছে, বেচারী অনেকক্ষণ খুঁজেও—

রাণু যোগাইয়া দেয়, তিন দিন খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়েও—

হ্যাঁ তোমার গিয়ে, তিন দিন হয়রান হয়েও—শেষে না পেয়ে হাল ছেড়ে—

রাণু ফিস ফিস করিয়া বলিয়া দেয়, হাল ছাড়ি নি এখনও!

হ্যাঁ, ওর নাম কি, হাল না ছেড়ে ক্রমাগত খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে। যা হোক, একখানা বই আজ এনে দিও, কতই বা দাম!

রাগ ধরে, তুই বুঝি এই কাটারি হাতে ক'রে বাগানে বাগানে বই খুঁজে বেড়াচ্ছিস? লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে!

কাতরভাবে বাবা বলেন, আহা, ওকে আর এ সামান্য ব্যাপারের জন্যে গালমন্দ করা কেন? এবার থেকে ঠিক ক'রে রাখবে তো গিন্নী?

রাণু খুব ঝুঁকাইয়া ঘাড় নাড়ে। আমি ফিরিয়া আসিতে আসিতে শুনিতে পাই, তোমায় অত ক'রে শেখাই, তবু একটুও মনে থাকে না দাদু। কি যেন হচ্ছ দিন দিন!

কখনও কখনও হুকুম করিবার খানিক পরেই বইটার আধখানা আনিয়া হাজির করিয়া সে খোকার উপর প্রবল তম্বি আরম্ভ করিয়া দেয়। তম্বিটা আসলে আরম্ভ হয় আমাকেই ঠেস দিয়া, তোমার আদুরে ভাইপোর কাজ দেখ মেজকা। লোকে আর পড়াশুনা করবে কোথা থেকে?

আমি বুঝি, কাহার কাজ। কটমট করিয়া চাহিয়া থাকি।

দুষ্টু ছুটিয়া গিয়া বামালসুদ্ধ খোকাকে হাজির করে—সে বোধ হয় তখন একখানা পাতা মুখে পুরিয়াছে এবং বাকিগুলার কি করিলে সবচেয়ে সদ্গতি হয়, সেই সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছে। তাহাকে আমার সামনে ধপ করিয়া বসাইয়া রাণু রাগ দেখাইয়া বলে, পেত্যয় না যাও, দেখ। আচ্ছা, এ ছেলের কখনও বিদ্যে হবে মেজকা?

আমি তখন হয়তো বলি, ওর কাজ, না তুমি নিজে ছিঁড়েছ রাণু? ঠিক আগেকার পাঁচখানি পাতা ছেঁড়া—যত বলি, তোমায় কিচ্ছু বলব না—খান তিরিশেক বই তো শেষ হ'ল!

ধরা পড়িয়া লজ্জা ভয় অপমানে নিশ্চল নির্ব্বাক হইয়া এমন ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে যে, নেহাত নৃশংস না হইলে ইহার উপর আর কিছু তাহাকে বলা যায় না। তখনকার মত শাস্তির কথা ভুলিয়া তাহার মনের গ্লানিটুকু মুছাইয়া দিবার জন্য আমায় বলিতেই হয়, হ্যাঁরে দুষ্টু,

দিদির বই ছিঁড়ে দিয়েছিস? আর তুমিও তো ওকে একটু-আধটু শাসন করবে না রাণু। ওর আর কতটুকু বুদ্ধি, বল?

চাঁদমুখখানি হইতে মেঘটা সরিয়া গিয়া হাসি ফোটে। তখন আমাদের দুইজনের মধ্য হইতে প্রথম ভাগের ব্যবধানটা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং রাণু দিব্য সহজভাবে তাহার গিন্নীপনার ভূমিকা আরম্ভ করিয়া দেয়। এই সময়টা সে হঠাৎ এত বড় হইয়া যায় যে, ছোট ভাইটি হইতে আরম্ভ করিয়া বাপ, খুড়া, ঠাকুরমা, এমন কি ঠাকুরদাদা পর্য্যন্ত সবাই তাহার কাছে নিতান্ত ক্ষুদ্র এবং স্নেহ ও করুণার পাত্র হইয়া পড়ে। এই রকম একটি প্রথম ভাগ ছেঁড়ার দিনে কথাটা এই ভাবে আরম্ভ হইল—কি ক'রে শাসন করব বল মেজকা? আমার কি নিশ্বেস ফেলবার সময় আছে; খালি কাজ—কাজ—আর কাজ।

হাসি পাইলেও গম্ভীর হইয়া বলিলাম, তা বটে, কত দিক আর দেখবে?

যে দিকটা না দেখেছি, সেই দিকেই গোল—এই তো খোকার কাণ্ড চোখেই দেখলে। কেন রে বাপু, রাণু ছাড়া আব বাড়িতে কেউ নেই? খাবার বেলা তো অনেকগুলি থ, বল মেজ কা! আচ্ছা, কাল তোমার ঝাল-তরকারিতে নুন ছিল?

বলিলাম, না, একেবারে মুখে দিতে পারি নি।

তার হেতু হচ্ছে, রাণু কাল রান্নাঘরে যেতে পারে নি।—ফুরসৎ ছিল না। এই তো সবার রান্নার ছিরি! আজ আর সে রকম কম হবে না, আমি নিজের হাতে দিয়ে এসেছি নুন।

আমার শখের ঝাল-তরকারি খাওয়া সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া মনের দুঃখ মনে চাপিয়া বলিলাম, তুমি যদি রোজ একবার ক'রে দেখ মা।

গাল দুইটি অভিমানে ভারী হইয়া উঠিল, হবার জো নেই মেজকা, রাণু হয়েছে বাড়ির আতঙ্ক। 'ওরে, ওই বুঝি রাণু ভাঁড়ার-ঘরে ঢুকেছে—রাণু বুঝি মেয়েটাকে টেনে দুধ খাওয়াতে বসেছে, দেখ্ দেখ্—তোকে কে এত গিন্নীত্ব করতে বললে বাপু?' হ্যাঁ, মেজকা, এত বড়টা হলুম, দেখেছ কখনও আমায় গিন্নীত্ব করতে—ককখনও—একরত্তিও?

বলিলাম, ব'লে দিলেই হ'ল একটা কথা, ওদের আর কি!

মুখটি বুজে শুনে যাই। একজন হয়তো বললেন, 'ওই বুঝি রাণু রান্নাঘরে সেঁধোল!' রাঙী বেড়ালটা বলে, আমি পদে আছি। কেউ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ওরে, রাণু বুঝি ওর বাপের—' আচ্ছা মেজকা, বাবার ফুলদানিটা আমি ভেঙেছি ব'লে তোমার একটুও বিশ্বাস হয়?

এ ঘটনাটি সবচেয়ে নূতন; গিন্নীপনা করিয়া জল বদলাইতে গিয়া রাণুই ফুলদানিটা চুরমার করিয়া দিয়াছে, ঘরে আর দ্বিতীয় কেহ ছিল না। আমি বলিলাম, কই, আমি তো ম'রে গেলেও এ কথা বিশ্বাস করতে পারি না।

ঠোঁট ফুলাইয়া রাণু বলিল, যার ঘটে একটুও বুদ্ধি আছে, সে করবে না। আমার কি দরকার মেজকা, ফুলদানিতে হাত দেবার? কেন, আমার নিজের পেরথোম ভাগ কি ছিল না যে, ফুলদানি ঘাঁটতে যাব?

প্রথম ভাগের উপর দরদ দেখিয়া ভয়ানক হাসি পাইল, চাপিয়া রাখিয়া বলিলাম, মিছিমিছি দোষ দেওয়া ওদের কেমন একটা রোগ হয়ে পড়েছে।

দুষ্টু একটু মুখ নীচু করিয়া চুপ করিয়া রহিল; তাহার পর সুবিধা পাইয়া তাহার সদ্য দোষটুকু সম্পূর্ণরূপে স্খালন করিয়া লইবার জন্য আমার কোলে মুখ গুঁজিয়া আরও অভিমানের সুরে আস্তে আস্তে বলিল, তোমারও এ রোগটা একটু একটু আছে মেজকা;—এক্ষুনি বলছিলে, আমি পেরথোম ভাগটা ছিঁড়ে এনেছি।

মেয়ের কাছে হারিয়া গিয়া হাসিতে হাসিতে তাহার কেশের মধ্যে অঙ্গুলি-সঞ্চালন করিতে লাগিলাম।

২

বই হারানো, কি ছেঁড়া, পেট-কামড়ানো, মাথা-ব্যথা, খোকাকে ধরা প্রভৃতি ব্যাপারগুলা যখন অনেকদিন তাহাকে বাঁচাইবার পর নিতান্ত একঘেয়ে এবং শক্তিহীন হইয়া পড়ে, তখন দুই-এক দিনের জন্য নেহাত বাধ্য হইয়াই রাণু বই স্লেট লইয়া হাজির হয়। অবশ্য পড়াশুনা কিছুই

হয় না। প্রথমে গল্প জমাইবার চেষ্টা করে। সংসারের উপর কোন-কিছুর জন্য মনটা খিঁচড়াইয়া থাকায় কিংবা অন্য কোন কারণে যদি সকলের নিজ নিজ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমার মনটা বেশি রকম সজাগ থাকে তো ধমক খাইয়া বই খোলে; তাহার পর পড়া আরম্ভ হয়। সেটা রাণুর পাঠাভ্যাস, কি আমার ধৈর্য্য, বাৎসল্য, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের পরীক্ষা, তাহা স্থির করিয়া বলা কঠিন। আড়াইটি বৎসর গিয়াছে, ইহার মধ্যে রাণু 'অজ' আম'-র পাতা শেষ করিয়া 'অচল' 'অধম'-র পাতায় আসিয়া অচলা হইয়া বসিয়া আছে। বই খুলিয়া আমার দিকে চায়—অর্থাৎ বলিয়া দিতে হইবে। আমি প্রায়ই পড়াশুনার অত্যাবশ্যকতা সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র উপদেশ দিয়া আরম্ভ করি, আচ্ছা রাণু, যদি পড়াশুনা না কর তো বিয়ে হ'লেই, যখন শ্বশুরবাড়ি চ'লে যাবে, মেজকাকা কি রকম আছে, তাকে কেউ সকালবেলা চা দিয়ে যায় কি না, নাইবার সময় কাপড় গামছা দিয়ে যায় কি না, অসুখ হ'লে কেউ মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় কি না—এসব কি ক'রে খোঁজ নেবে?

রাণু তাহার মেজকাকার ভাবী দুর্দ্দশার কথা কল্পনা করিয়া একটু মৌন থাকে, কিন্তু বোধ হয় প্রথমভাগ-পারাবার পার হইবার কোন সম্ভাবনাই না দেখিয়া বলে, আচ্ছা মেজকা, একেবারে দ্বিতীয় ভাগ পড়লে হয় না? আমায় একটুও ব'লে দিতে হবে না। এই শোন না—ঐ ক-য়ে য-ফলা—

রাগিয়া বলি, ওই ডেঁপোমি ছাড় দিকিন, ওইজন্যেই তোমার কিছু হয় না। নাও, পড়। সেদিন কত দূর হয়েছিল? 'অচল' 'অধম' শেষ করেছিলে?

রাণু নিষ্প্রভভাবে ঘাড় নাড়িয়া জানায়, হাঁ।

বলি, পড় তা হ'লে একবার।

'অচল' কথাটার উপর কচি আঙুলটি দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। আমার মাথার রক্ত গরম হইয়া উঠিতে থাকে এবং স্নেহ করুণা প্রভৃতি স্নিগ্ধ চিত্তবৃত্তিগুলা বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইবার উপক্রম হয়।

মেজাজেরই বা আর দোষ দিই কি করিয়া? আজ এক বৎসর ধরিয়া এই 'অচল' 'অধম' লইয়া কসরৎ চলিতেছে; এখনও রোজই এই অবস্থা।

তবুও ক্রোধ দমন করিয়া গম্ভীরভাবে বলি, ছাই হয়েছে। আচ্ছা বল—অ—চ—আর ল—অচল।

রাণু 'অ'র উপর হইতে আঙুলটা না সরাইয়া তিনটা অক্ষর পড়িয়া যায়। 'অধম'-ও ওই ভাবেই শেষ হয়; অথচ ঝাড়া দেড়টি বৎসর শুধু অক্ষর চেনায় গিয়াছিল।

তখন জিজ্ঞাসা করিতে হয়, কোন্‌টা অ?

রাণু ভীতভাবে আমার দিকে চাহিয়া আঙুলটি সরাইয়া ল-এর উপর রাখে।

ধৈর্য্যের সূত্রটা তখনও ধরিয়া থাকি, বলি, হুঁ, কোন্‌টা ল হ'ল তা হ'লে?

আঙুলটা সট করিয়া চ-এর উপর সরিয়া যায়। ধৈর্য্যসাধনা তখনও চলিতে থাকে; শান্তকণ্ঠে বলি, চমৎকার! আর চ?

খানিকক্ষণ স্থিরভাবে বইয়ের দিকে চাহিয়া থাকে, তাহার পর বলে, চ? চ নেই মেজকা।

সংযত রাগটা অত্যন্ত উগ্রভাবেই বাহির হইয়া পড়ে, পিঠে একটা চাপড় কষাইয়া বলি, তা থাকবে কেন? তোমার ডেঁপোমি দেখে চম্পট দিয়েছে। হতভাগা মেয়ে—রাজ্যের কথার জাহাজ হয়েছেন, আর এদিকে আড়াই বৎসরে প্রথম ভাগের আড়াইটে কথা শেষ করতে পারলে না! কত বুড়ো বুড়ো গাধা ঠেঙিয়ে পাস করিয়ে দিলাম আর এই একরত্তি মেয়ের কাছে আমায় হার মানতে হ'ল! কাজ নেই তোর অক্ষর চিনে। সন্ধ্যে পর্য্যন্ত ব'সে ব'সে খালি অ—চ—আর ল—অচল; অ—ধ—আর ম—অধম—এই আওড়াবি। তোর সমস্ত দিন আজ খাওয়া বন্ধ।

বিরক্তভাবে একটা খবরের কাগজ কিংবা বই লইয়া বসিয়া যাই; রাণু ক্রন্দনের সহিত সুর মিশাইয়া পড়া বলিয়া যায়।

বলি বটে, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পড়িতে হইবে; কিন্তু চড়টা বসাইয়াই নিশ্চিন্ত হইয়াই যাই যে, সেদিনকার পড়া ওই পর্য্যন্ত। রাণু এতক্ষণ চক্ষের জলের ভরসাতেই থাকে এবং অশ্রু নামিলেই সেটাকে খুব বিচক্ষণতার সহিত কাজে লাগায়। কিছুক্ষণ পরে আর পড়ার আওয়াজ পাই না; বলি, কি হ'ল?

রাণু ক্রন্দনের স্বরে উত্তর করে, নেই।

কি নেই?—বলিয়া ফিরিয়া দেখি, চক্ষের জল 'অচল' অধম'-র উপর ফেলিয়া আঙুল দিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া কথা দুইটা বিলকুল উড়াইয়া দিয়াছে—একেবারে নীচের দুই-তিনখানা পাতার খানিকটা পর্য্যন্ত।

কিংবা আঙুলের ডগায় চোখের ভিজা কাজল লইয়া কথা দুইটিকে চিরান্ধকারে ডুবাইয়া দিয়াছে; এইরূপ অবস্থাতে বলে, আর দেখতে পাচ্ছি না, মেজকা।—এই রকম আরও সব কাণ্ড।

চড়টা মারা পর্য্যন্ত মনটা খারাপ হইয়া থাকে, তাহা ভিন্ন ওর ধূর্ত্তামি দেখিয়া হাসিও পায়। মেয়েদের পড়াশুনা সম্বন্ধে আমার থিওরিটা ফিরিয়া আসে; বলি, না, তোব আর পড়াশুনা হ'ল না রাণু; স্লেটটা নিযে আয় দিকিন—দেগে দিই, বুলো। পিঠটায় লেগেছে বেশি? দেখি।

বাণু বুঝিতে পারে, তাহার জয় আরম্ভ হইয়াছে, এখন তাহার সব কথাই চলিবে। আমার কাঁধটা জড়াইয়া আস্তে আস্তে ডাকে, মেজকা!

উত্তর দিই, কি?

আমি, মেজকা, বড় হই নি?

তা তো খুব হয়েছ, কিন্তু কই, বড়র মতন—

বাধা দিয়া বলে, তা হ'লে স্লেট ছেড়ে ছোটকাকার মত কাগজ-পেন্সিল নিয়ে আসব? চারটে উটপেন্সিল আছে আমার। স্লেটে খোকা বড় হয়ে লিখবে'খন। হঠাৎ শিউরিয়া উঠিয়া বলে, ও মেজকা, তোমার দুটো পাকা চুল গো! সর্ব্বনাশ! বেছে দিই?

বলি, দাও। আচ্ছা রাণু, এই তো বুড়ো হতে চললাম, তুইও

দুদিন পরে শ্বশুরবাড়ি চললি। লেখাপড়া শিখলি নি, মরলাম কি বাঁচলাম, কি ক'রে খোঁজ নিবি? আমায় কেউ দেখে-শোনে কি না, রেঁধে-টেধে দেয় কি না—

রাণু বলে, পড়তে তো জানি মেজকা, খালি পেরথোম ভাগটাই জানি না, বড় হয়েছি কিনা। বাড়ির আর কোন্ লোকটা পেরথোম ভাগ পড়ে মেজকা, দেখাও তো!

৩

দাদা ওদিকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে খুব লিবারেল মতের লোক ছিলেন, অর্থাৎ হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে অজ্ঞতাটা যেমন গভীর করিয়া রাখিয়াছিলেন, খ্রীষ্ট এবং কবেকার জরাজীর্ণ জুরুয়াস্থিয়ানবাদ সম্বন্ধে জ্ঞানটা সেইরূপ উচ্চ ছিল। দরকার হইলে বাইবেল হইতে সুদীর্ঘ কোটেশন তুলিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিতে পারিতেন এবং দরকার না হইলেও যখন একধার হইতে সমস্ত ধর্ম্মমত সম্বন্ধে সুতীব্র সমালোচনা করিয়া ধর্ম্মমতমাত্রেরই অসারতা সম্বন্ধে অধাম্মিক ভাষায় ভূরি ভূরি প্রমাণ দিয়া যাইতেন, তখন ভক্তদের বলিতে হইত, হ্যাঁ, এখানে খাতির চলবে না বাবা, এ যার নাম শশাঙ্ক মুখুজ্জে!

দাদা বলিতেন, না, গোঁড়ামিকে আমি প্রশ্রয় দিতে মোটেই রাজি নই।

প্রায় সব ধর্ম্মবাদকেই তিনি 'গোঁড়ামি' নামে অভিহিত করিতেন এবং গালাগাল না দেওয়াকে কহিতেন 'প্রশ্রয় দেওয়া'।

সেই দাদা এখন একেবারে অন্য মানুষ। ত্রিসন্ধ্যা না করিয়া জল খান না এবং জলের অতিরিক্ত যে বেশি কিছু খান বলিয়া বোধ হয় না। পূজা পাঠ হোম লইয়াই আছেন এবং বাক্ ও কর্ম্মে শুচিতা সম্বন্ধে এমন একটা 'গেল গেল' ভাব যে, আমাদের তো প্রাণ 'যায় যায়' হইয়া উঠিয়াছে।

ভক্তেরা বলে, ও রকম হবে, এ তো জানা কথাই, এই হচ্ছে স্বাভাবিক বিবর্ত্তন; এ একেবারে খাঁটি জিনিস দাঁড়িয়েছে।

সকলের চেয়ে চিন্তার বিষয় হইয়াছে যে, এই অসহায় লাঞ্ছিত হিন্দুধর্ম্মের জন্য একটা বড় রকম ত্যাগ স্বীকার করিবার নিমিত্ত দাদা নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন এবং হাতের কাছে আর তেমন কিছু আপাতত না পাওয়ায় ঝোঁকটা গিয়া পড়িয়াছে ছোট কন্যাটির উপর।

একদিন বলিলেন, ওহে শৈলেন, একটা কথা ভাবছি,—ভাবছি বলি কেন, এক রকম স্থিরই ক'রে ফেলেছি।

মুখে গম্ভীর তেজস্বিতার ভাব দেখিয়া সভয়ে প্রশ্ন করিলাম, কি দাদা?

গৌরীদান করব স্থির করেছি, তোমার রাণুর কত বয়স হ'ল?

বয়স না বলিয়া বিস্মিতভাবে বলিলাম, সে কি দাদা! এ যুগে—

দাদা সংযত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন, যুগের 'এ' আর 'সে' নেই শৈলেন, ওইখানেই তোমরা ভুল কর। কাল এক অনন্তব্যাপী অখণ্ড সত্তা এবং যে শুদ্ধ সনাতনধর্ম্ম সেই কালকে—

একটু অস্থির হইয়া বলিলাম, কিন্তু দাদা, ও যে এখনও দুগ্ধপোষ্য শিশু।

দাদা বলিলেন, এবং শিশুই থাকবে ও, যতদিন তোমরা বিবাহবন্ধনের দ্বারা ওর আত্মার সংস্কার ও পূর্ণ বিকাশের অবসর ক'রে না দিচ্ছ। এটা তোমায় বোঝাতে হ'লে আগে আমাদের শাস্ত্রকাররা—

অসহিষ্ণুভাবে বলিলাম, সে তো বুঝলাম, কিন্তু ওর তো এই সবে আট বছর পেরুল দাদা, ওর শরীরই বা কতটুকু আর তার মধ্যে ওর আত্মাই বা কোথায়, তা তো বুঝতে পারি না! আমার কথা হচ্ছে—

দাদা সেদিকে মন না দিয়া নিরাশভাবে বলিলেন, আট বৎসর পেরিয়ে গেছে! তা হ'লে আর কই হ'ল শৈলেন? মনু বলেছেন, 'অষ্টবর্ষা ভবেদ্‌গৌরী নববর্ষেতুরোহিণী'—জানি, অতবড় পুণ্যকর্ম্ম কি আমার হাত দিয়ে সমাধান হবে! ছোটটার বয়স কত হ'ল?

রাণুর ছোট রেখা পাঁচ বৎসরের। দাদা বয়স শুনিয়া মুখটা কুঞ্চিত করিয়া একটু মৌন রহিলেন। পাঁচ বৎসরের কন্যাদের জন্য কোন একটা পুণ্যফলের ব্যবস্থা না করিয়া যাওয়ার জন্য মনুর উপরই চটিলেন, কিংবা অতি পিছাইয়া জন্ম লওয়ার জন্য রেখার উপরই বিরক্ত হইলেন, বুঝিতে পারিলাম না। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে স্থান ত্যাগ করিলেন। আমিও আমার রুদ্ধশ্বাসটা মোচন করিলাম। মনে মনে কহিলাম, যাক, মেয়েটার একটা ফাঁড়া গেল।

দুই দিন পরে দাদা ডাকিয়া পাঠাইলেন। উপস্থিত হইলে বলিলেন, আমি ও সমস্যাটুকুর এক রকম সমাধান ক'রে ফেলেছি শৈলেন। অর্থাৎ তোমার রাণুর বিবাহের কথাটা আর কি। ভেবে দেখলাম, যুগধর্ম্মটা একটু বজায় রেখে চলাই ভাল বইকি—

আমি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম, হর্ষের সহিত বলিলাম, নিশ্চয়, শিক্ষিত সমাজে কোথায় ষোল-সতেরো বছরে বিবাহ চলছে দাদা, এ সময় একটা কচি মেয়েকে—যার ন বছরও পুরো হয় নি—তা ভিন্ন খাটো গড়ন ব'লে—

ঝাঁটা মার তোমার শিক্ষিত সমাজকে। আমি সে কথা বলছি না। বলছিলাম যে, যদি এই সময়ই রাণুর বিয়ে দিয়ে দিই, তা মন্দ কি? বেশ তো যুগধর্ম্মটাও বজায় রইল, অথচ ওদিকে গৌরীদানেরও খুব কাছাকাছি রইল। ক্ষতি কি? এটা হবে, যাকে বলতে পারা যায় মডিফায়েড গৌরীদান আর কি।

আমি একেবারে থ হইয়া গেলাম। কি করিয়া যে দাদাকে বুঝাইব, কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না।

দাদা বলিলেন, পণ্ডিত মশায়েরও মত আছে। তিনি অনেক ঘাঁটাঘাঁটি ক'রে দেখে বললেন, কলিতে এইটিই গৌরীদানের সমফলপ্রদ হবে।

আমি দুঃখ ও রাগ মিটাইবার একটা আধার পাইয়া একটু উষ্মার সহিত বলিলাম, পণ্ডিত মশায় তা হ'লে একটা নীচ মিথ্যা কথা আপনাকে বলেছেন দাদা, আপনি সন্তুষ্ট হ'লে উনি এ কথাও বোধ হয়

শাস্ত্র ঘেঁটেই ব'লে দেবেন যে, মেয়েকে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিলেও আজকাল গৌরীদানের ফল হবার কথা। কলিযুগটা তো ওঁদের কল্পবৃক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে, যখন যে বিধানটি চাইবেন, পাকা ফলের মত টুপ ক'রে হাতে এসে পড়বে।

দুইজনেই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম। আমিই কথা কহিলাম, যাক, ওঁরা বিধান দেন, দিন বিয়ে। আমি এখন আসি, একটু কাজ আছে।

আসিবার সময় ঘুরিয়া বলিলাম, হ্যাঁ, শরীরটা খারাপ ব'লে ভাবছি, মাস চারেক একটু পশ্চিমে গিয়ে কাটাব; হপ্তাখানেকের মধ্যে বোধ হয় বেরিয়ে পড়তে পারব।—বলিয়া চলিয়া আসিলাম।

৪

অভিমানের সাহায্যে ব্যাপারটা মাস তিন-চার কোন রকমে ঠেকাইয়া রাখিলাম, কিন্তু তাহার পর দাদা নিজেই এমন অভিমান শুরু করিয়া দিলেন যে, আমারই হার মানিতে হইল। 'ধর্ম্মে'র পথে অন্তরায় হইবার বয়স এবং শক্তি বাবার তো ছিলই না, তবুও নাতনীর মায়ায় তিনি দোমনা হইয়া কিছুদিন আমারই পক্ষে রহিলেন, তারপর ক্রমে ক্রমে ওই দিকেই ঢলিয়া পড়িলেন। আমি বেখাপ্পা রকম এঁকলা পড়িয়া গিয়া একটা মস্ত বড় ধর্ম্মদ্রোহীর মত বিরাজ করিতে লাগিলাম।

রাণুকে ঢালোয়া ছুটি দিয়া দিয়াছি। মায়াবিনী অচিরেই আমাদের পর হইবে বলিয়া যেন ক্ষুদ্র বুকখানির সমস্তটুকু দিয়া আমাদের সংসারটি জড়াইয়া ধরিয়াছে। পারুক, না পারুক—সে সমস্ত কাজেই আছে এবং যেটা ঠিকমত পারে না, সেটার জন্য এমন একটা সঙ্কোচ এবং বেদনা আজকাল তাহার দেখিতে পাই, তাহাতে সত্যই মনে হয়, নকলের মধ্য দিয়া মেয়েটার এবার আসল গৃহিণীপনায় ছোঁয়াচ লাগিয়াছে। অসহায় মেজকাকাটি তো চিরদিনই তাহার একটা বিশেষ পোষ্য ছিলই

আজকাল আবার প্রথমভাগ-বিবর্জিত সুপ্রচুর অবসরের দরুন একেবারে তাহার কোলের শিশুটিই হইয়া পড়িয়াছে বলিলে চলে।

সময় সময় গল্প হয়; আজকাল বিয়ের গল্পটা হয় বেশি। অন্যের সঙ্গে এ বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে রাণু ইদানীং লজ্জা পায় বটে, কিন্তু আমার কাছে কোন দ্বিধা-কুণ্ঠাই আসিবার অবসর পায় না; তাহার কারণ আমাদের দুইজনের মধ্যে সমস্ত লঘুত্ব বাদ দিয়া গুরুগম্ভীর সমস্যাবলীর আলোচনা চলিতে থাকে। বলি, তা নয় হ'ল রাণু, তুমি মাসে দুবার ক'রে শ্বশুরবাড়ি থেকে এসে আমাদের সংসারটা গুছিয়ে দিয়ে গেলে, আর সবই করলে, কিন্তু তোমার মেজকাকাটির কি বন্দোবস্ত করছ?

রাণু বিমর্ষ হইয়া ভাবে; বলে, আমরা সব ব'লে ব'লে তো হয়রান হয়ে গেলাম মেজকা যে, বিয়ে কর, বিয়ে কর। তা শুনলে গরিবদের কথা? রাণু কি তোমায় চিরদিনটা দেখতে-শুনতে পারবে মেজকা? এর পরে তার নিজের ছেলেপুলেও মানুষ করতে হবে তো! মেয়ে আর কতদিন নিজের বল?

তোতাপাখির মত কচি মুখে বুড়োদের কাছে শেখা বুলি শুনিয়া হাসিব কি কাঁদিব, ঠিক করিতে পারি না, বলি, আচ্ছা, একটা গিন্নীবান্নি কনে দেখে এখনও বিয়ে করলে চলে না? কি বল তুমি?

এই বাঁধা কথাটি তাহার ভাবী শ্বশুরবাড়ি লইয়া একটি ঠাট্টার উপক্রমণিকা। রাণু কৃত্রিম অভিমানের সহিত হাসি মিশাইয়া বলে, যাও মেজকা, আর গপ্প করব না; তুমি ঠাট্টা করছ।

আমি চোখ পাকাইয়া বিপুল গাম্ভীর্য্যের সহিত বলি, মোটেই ঠাট্টা নয় রাণু; তোমার শাশুড়ীটি বড্ড গিন্নী শুনেছি, তাই বলছিলাম, যদি বিয়েই করতে হয়—

রাণু আমার দিকে রাগ করিয়া চায়, গম্ভীর হইয়া চায় এবং শেষে হাসিয়া চায়। কিছুতেই যখন আমার মুখের অটল গাম্ভীর্য্য বদলায় না, তখন প্রতারিত হইয়া গুরুত্বের সহিত বলে, আচ্ছা, আমি তা হ'লে—না মেজকা, নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছ, যাও—

আমি চোখ আরও বিস্ফারিত করিয়া বলি, একটুও ঠাট্টা নেই এর মধ্যে রাণু; সব কথা নিয়ে কি আর ঠাট্টা চলে মা?

রাণু তখন ভারিক্কে হইয়া বলে, আচ্ছা, তা হ'লে আমার শ্বাশুড়ীকে একবার ব'লে দেখব'খন, আগে যাই সেখানে। তিনি যদি তোমায় বিয়ে করতে রাজি হন তো তোমায় জানাব 'খন; তার জন্যে ভাবতে হবে না। তাহার পর কৌতুকদীপ্ত চোখে চাহিয়া বলে, আচ্ছা মেজকা, পেরথোম ভাগ তো শিখি নি এখনও—কি ক'রে তোমায় জানাব বল দিকিন, তবে বুঝব, হ্যাঁ—

আমি নানান রকম আন্দাজ করি; বিজয়িনী ঝাঁকড়া মাথা দুলাইয়া হাসিয়া বলে, না, হ'ল, না—ককৃখনও বলতে পারবে না, সে বড্ড শক্ত কথা।

এই সব হাসি তামাশা গল্পগুজব হঠাৎ মাঝখানে শেষ হইয়া যায়; রাণু চঞ্চলতার মাঝে হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলে, যাক, সে পরের কথা পরে হবে; যাই, তোমার চা হ'ল কি না দেখিগে। কিংবা—যাই, গপ্প করলেই চলবে না, তোমার লেখার টেবিলটা আজ গুছোতে হবে, একডাঁই হয়ে রয়েছে—ইত্যাদি।

এই রকম ভাবে রাণুকে নিবিড় হইতে নিবিড়তরভাবে আমার বুকের মধ্যে আনিয়া দিতে দিতে বিচ্ছেদের দিনটা আগাইয়া আসিতেছে।

বুঝি বা রাণুর বুকটিতেও এই আসন্ন বিচ্ছেদের বেদনা তাহার অগোচরে একটু একটু করিয়া ঘনাইয়া উঠিতেছে। কচি সে, বুঝিতে পারে না; কিন্তু যখনই আজকাল ছুটি পাইলে নিজের মনেই স্লেট ও প্রথম ভাগটা লইয়া হাজির হয়, তখনই বুঝিতে পারি, এ আগ্রহটা তাহার কাকাকে সান্ত্বনা দেওয়ারই একটা নূতন রূপ; কেন না, প্রথম ভাগ শেখার আর কোন উদ্দেশ্য থাক্ আর না থাক্, ইহার উপরই ভবিষ্যতে তাহার কাকার সমস্ত সুখ-সুবিধা নির্ভর করিতেছে, রাণুর মনে এ ধারণাটুকু বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। এখন আর একেবারেই উপায় নাই বলিয়া তাহার শিশু-মনটি ব্যথায় ভরিয়া উঠে; প্রবীণার মত

আমায় তবুও আশ্বাস দেয়, তুমি ভেবো না মেজকা, তোমার পেরথোম ভাগ না শেষ ক'রে আমি ককৃখনও শ্বশুরবাড়ি যাব না। নাও, ব'লে দাও।

পড়া অবশ্য এগোয় না। বলিয়া দিব ক, প্রথম ভাগটা দেখিলেই বুকে যেন কান্না ঠেলিয়া উঠে। ওদিকে আবার প্রতিদিনই গৌরীদানের বর্দ্ধমান আয়োজন। বাড়ির বাতাসে আমার হাঁফ ধরিয়া উঠে। এক-একদিন মেয়েটাকে বুকে চাপিয়া ধরি, বলি, আমাদের কোন্ দোষে তুই এত শিগগির পর হতে চললি রাণু?

বোঝে না, শুধু আমার ব্যথিত মুখের দিকে চায়। এক-একদিন অবুঝভাবেই কাঁদ-কাঁদ হইয়া উঠে; এক-একদিন জোর গলায় প্রতিজ্ঞা করিয়া বসে, তোমার কষ্ট হয় তো বিয়ে এখন করবই না মেজকা, বাবাকে বুঝিয়ে বলব'খন।

একদিন এই রকম প্রতিজ্ঞার মাঝখানেই সানাইয়ের করুণ সুর বাতাসে ক্রন্দনের লহর তুলিয়া বাজিয়া উঠিল। রাণু কুণ্ঠিত আনন্দে আমার মুখের দিকে চাহিয়া হঠাৎ কি রকম হইয়া গিয়া মুখটা নীচু করিল; বোধ করি, তাহার মেজকাকার মুখে বিষাদের ছায়াটা নিতান্তই নিবিড় হইয়া তখন ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

গৌরীদান শেষ হইয়া গিয়াছে; আমাদের গৌরীর আজ বিদায়ের দিন। আমি শুভকর্ম্মে যোগদান করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিতে পারি নাই, এ বাড়ি সে বাড়ি করিয়া বেড়াইয়াছি। বিদায়ের সময়ে বরবধূকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিলাম।

দীপ্তশ্রী কিশোর বরের পাশে পট্টবস্ত্র ও অলঙ্কার পরা, মালাচন্দনে চর্চ্চিত রাণুকে দেখিয়া আমার তপ্ত চক্ষু দুইটা যেন জুড়াইয়া গেল। কিন্তু ও যে বড্ড কচি, এত সকালে কি করিয়া বিদায়ের কথা মুখ দিয়া বাহির করা যায়? ও কি জানে, আজ কতই পর করিয়া ওকে বিদায় দিতেছি আমরা?

চক্ষে কোঁচার খুঁট দিয়া এই পুণ্যদর্শন শিশুদম্পতিকে আশীর্ব্বাদ করিলাম। রাণুর চিবুকটা তুলিয়া প্রশ্ন করিলাম, রাণু, তোর এই কোলের ছেলেটাকে কার কাছে—? আর বলিতে পারিলাম না।

রাণু শুনিয়াছি এতক্ষণ কাঁদে নাই। তাহার কারণ নিশ্চয় এই যে, সংসারের প্রবেশ-পথে দাঁড়াইতেই ওর অসময়ের গৃহিণীপনাটা সরিয়া গিয়া ওর মধ্যকার শিশুটি বিস্ময়ে কৌতূহলে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। আমার কথার আভাসে সেই শিশুটিই নিজের অসহায়তায় আকুল হইয়া পড়িল। আমার বাহুতে মুখ লুকাইয়া রাণু উচ্ছ্বসিত আবেগে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কখনও কচি মেয়ের মত ওকে ভুলাইতে হয় নাই। আমার খেলা-ঘরের মা হইয়া ওই এতদিন আমায় আদর করিয়াছে, আশ্বাস দিয়াছে; সেইটাই আমাদের সম্বন্ধের মধ্যে যেন সহজ এবং স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছিল, ভাল মানাইত। আজ প্রথম ওকে বুকে চাপিয়া সান্ত্বনা দিলাম—যেমন দুধের ছেলেমেয়েকে শান্ত করে—বুঝাইয়া, মিথ্যা কহিয়া, কত প্রলোভন দিয়া।

তবুও কি থামিতে চায়? ওর সব হাসির অন্তরালে এতদিন যে গোপনে শুধু অশ্রুই সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল।

অনেক ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া সে থামিল। অভ্যাসমত আমার করতল দিয়াই নিজের মুখটা মুছাইয়া লইল; তাহার পর হাতটাতে একটু টান দিয়া আস্তে আস্তে বলিল, এদিকে এস, শোন মেজকা।

দুইজনে একটু সরিয়া গেলাম। সকলে এই অসম মাতাপুত্রের অভিনয়ের দিকে চাহিয়া রহিল।

রাণু বুকের কাছ হইতে তাহার সুপ্রচুর বস্ত্রের মধ্য হইতে লাল ফিতায় যত্ন করিয়া বাঁধা দশ-বারোখানি প্রথম ভাগের একটা বাণ্ডিল বাহির করিল। অশ্রুসিক্ত মুখখানি আমার মুখের দিকে তুলিয়া বলিল, পেরথোম্ ভাগগুলো হারাই নি মেজকা, আমি দুষ্টু হয়েছিলুম, মিছে কথা বলতুম।

গলা ভাঙিয়া পড়ায় একটু থামিল, আবার বলিল, সবগুলো নিয়ে যাচ্ছি মেজকা, খু—ব লক্ষ্মী হয়ে প'ড়ে প'ড়ে এবার শিখে ফেলব। তারপরে তোমায় রোজ রোজ চিঠি লিখব। তুমি কিছু ভেবো না মেজকা।

বরযাত্রী

১

ত্রিলোচনের বিবাহ। বরযাত্রীদের মধ্যে রাজেন, কে. গুপ্ত, গোরাচাঁদ আর ঘোঁৎনা আসিয়া হাজির হইয়াছে, গণশার অপেক্ষা; সে আসিলেই এদিককার দলটা পূর্ণ হয়। ত্রিলোচন সাজ-গোজের মধ্যে এর পূর্ব্বেও আসিয়া কয়েকবার খোঁজ লইয়া গিয়াছে, আবার তর্জ্জনীর ডগায় একটু স্নো লইয়া মুখ বাঁকাইয়া দক্ষিণ গালটা নির্ম্মমভাবে ঘষিতে ঘষিতে আসিয়া হাজির হইল; প্রশ্ন করিল, এল র‍্যা?

ঘোঁৎনা বলিল, ওর মামা ওকে যে রকম আগলে ব'সে আছে দেখলাম—

এমন সময় হালদারদের বাড়ির পাশের গলিটায় সাইকেলের ঘন্টির আওয়াজ হইল, এবং গণশা সবেগে নিষ্ক্রান্ত হইয়া এবং সবেগেই দলটির মাঝখানে প্রবেশ করিয়া ব্রেক চাপিয়া নামিয়া পড়িল। জবাবদিহি হিসাবে বলিল, গ-গ্‌ণশাকে আটকায় সে এখনও মা-ম্মায়ের পেটে।

ছোকরা একটু তোতলা; রাগিলে কিংবা উৎসাহিত হইলে এক-একটা অক্ষর প্রায় দ্বিত্ব প্রাপ্ত হয়। ডানদিকের ভ্রূটায় একটা হেঁচকা টান দিয়া সামলাইয়া লয়।

রাজেন বলিল, তোর কিন্তু না গেলেই ভাল হ'ত গণশা। এতাদন হাঁটাহাঁটি ক'রে সাহেব যদি বা ইণ্টারভিউয়ের জন্যে আজ ডাকলে, বরযাত্র যাওয়ার লোভে—

ঘোঁৎনা বলিল, তাতে আবার আজকাল চাকরির যা বাজার!

গণশা বলিল, তিলুর বিয়েতে আমি যাব না! এর পর আমার নি-ন্নিজের বিয়েতে বলবি, গ-গ্‌গণশা তোর গিয়ে কাজ নেই, তুই চা-চ্চাকরির খোঁজ কর্‌গে।

গণেশের কথাটা বলিবার হক আছে। সে ত্রিলোচনকে তাস খেলিতে শিখাইয়াছে, সিগারেট খাইতে শিখাইয়াছে, চলন্ত ট্রামে উঠা-নামা করিতে শিখাইয়াছে এবং নিয়মিতভাবে বায়স্কোপের সিরিয়াল-অসিরিয়ালে লইয়া গিয়া পৃথিবীর যত সিনেমা-জ্যোতিষ্কদের নাম মুখস্থ করাইয়া তাহাকে সকল দিক দিয়া লায়েক করিয়া তুলিয়াছে।

শুধু তাই নহে। আপাতত এ কয়েকদিন ধরিয়া দাম্পত্য-নীতিতে জোর তালিম দিতেছে সেই, এবং বিশেষ করিয়া দাম্পত্য-রাজ্য করায়ত্ত করিবার পূর্ব্বে বাসর-দুর্গটি কি করিয়া অতিক্রম করিতে হইবে, তাহারও কৌশল-কানুন অধিগত করা হইতেছে ওই গণশারই নিকট।

ত্রিলোচন কৃতজ্ঞচিত্তে বলিল, না না, এসে ভালই করেছিস। বউদি আবার বাসরঘরের যা ভয় লাগিয়ে দিয়েছে, ভাবছি, আর গলা শুকিয়ে যাচ্ছে আর জল খাচ্ছি। যার সঙ্গে বিয়ে, সে একলাটি থাকলেই দিব্যিটি হ'ত। কার কথার যে কি উত্তর দোব, কার কানমলা সামলাব, কে গোঁফজোড়াটা নেড়ে দেবে, তার ওপর আবার গানের ফরমাশ আছে, কারুর হেঁয়ালি আছে।

কে. গুপ্ত ত্রিলোচনের পাশাপাশি তাদের ফুটবল-টীমে ব্যাক খেলে। বলিল, তা বটে ; পাঁচটা ফরওয়ার্ডকে সামলাতেই হিমসিম খেয়ে যেতে হয়—

ত্রিলোচন বলিল, ছজনে মিলে, আর এ একলা। গোঁফজোড়াটা নয় ফেলে দোব গণশা, যতটা হালকা হয়। বিয়ে হয়ে গেলে আবার না হয় তখন—

গোরাচাঁদ বলিল, তা হ'লে তো নাক কান কেটে, মাথা মুড়িয়ে বাসরঘরে ঢুকতে হয়।

গণশা বলিল, বরং ক-কন্ধকাটা হয়ে ঢুকলে তো আরও ভাল হয়। দেখবে, বরের গ-গ্ গলারই বালাই নেই, গাইতে বলা মিছে।

ত্রিলোচন চিন্তিতভাবে বলিল, তোদের তামাশা ব'লে মনে হচ্ছে; কিন্তু আমার এদিকে যে কি হচ্ছে তা—আবার তার ওপর সকাল সকাল লগ্ন প'ড়ে গেছে কপালগুণে।

কে. গুপ্ত বলিল, খুব স্টেডি থাকবেন মশাই, নার্ভাস হ'লেই প্রেস ক'রে ধরবে। একটা বড় দেখে নিতবর সঙ্গে নিলে—

গণশা একটু রাগিয়া উঠিল; বলিল, বা-ব্বাড়ির দারোয়ান কি গা-গ্‌গাড়ির সহিসকে তো আর নিতবর করবে না মশাই; সে সব আপনাদের ছা-চ্ছাতুর দেশে চলে।

বেহারের ছেলে। সুদূর ছাপরার এক মহকুমার স্কুল হইতে পাস করিয়া কলিকাতার কলেজে পড়িতে আসিয়াছে, বাংলার ছেলেদের সঙ্গে এখনও কথায় পারিয়া উঠে না। কে. গুপ্ত চুপ করিয়া গেল।

ঘোঁৎনা বলিল, বাসরঘরের ভয়ে যদি বিয়ে ছাড়তে হয় তো কলিশানের ভয়ে গাড়ি চড়াও ছাড়তে হয়।

গোরাচাঁদের কথাবার্তায় প্রায়ই একটু আহার্য্যের গন্ধ থাকা নিয়ম; বলিল, তা হ'লে কাঁটার ভয়ে মাছ খাওয়া ছাড়তে হয়।

কবি রাজেন বলিল, কণ্টকের ভয়ে গোলাপফুল ছাড়তে হয়।

গণশা সাইকেলটা রাখিতে গিয়াছিল, আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বরযাত্রীদের মালা এসেছে?

ত্রিলোচন বলিল, সে সব ঠিক আছে—মালা, গোলাপজল, এসেন্স। আর—আমি যাই, দেখিগে, সবাই একটু মিষ্টিমুখ ক'রে যাবি তো?

গোরাচাঁদ বলিল, হ্যাঁ, যা, শিগগির যা। কি কি আছে র‍্যা?

ত্রিলোচনকে ফিরাইয়া ঘোঁৎনা বলিল, আর শোন্। ওদিকে কে কে যাচ্ছে বল্ তো, বেশি ভেজাল বাড়ালে আবার ফুর্ত্তি জমবে না।

ত্রিলোচন বাঁ হাতের আঙুলের পর্ব্ব গুনিতে গুনিতে বলিল, বাবা এক, মেসো দুই, সেজপিসে, সহায়রামবাবু, এই হ'ল চার, আর আর—

বাংলা দেশ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ কে. গুপ্ত ভয়ে ভয়ে মনে করাইয়া দিল, একজন পুরুত যাবে না?

ত্রিলোচন গুণিল, পুরুত পাঁচ, দীনে নাপতে ছয়। পুরুত-মশাই নিজে যেতে পারবেন না, তাঁর কাকা ন্যায়রত্ন মশাই যাবেন।

গোরাচাঁদ একটু অস্বস্তির সহিত বলিল, এই ছজনেও মিষ্টিমুখ করবে তো?

ঘোৎনা বলিল, পুরুত-ঠাকুরের কাকা? সে বুড়ো তো রাতকানা, আবার কালাও তার ওপর; কার সঙ্গে বিয়ে দিতে কার সঙ্গে দিয়ে দেবে!

ত্রিলোচন বলিল, তাকে দীনে সামলাবে।

রাজেন বলিল, একা দীনে ব্যাটা কজনকে সামলাবে? ওদিকে সহায়রাম চাটুজ্জের যাওয়া মানেই বোতলের শ্রাদ্ধ।

ত্রিলোচন বলিল, সহায়রামবাবু আর সেজপিসে রাত্তিরেই চ'লে আসবে; কাল তাদের আপিসের মেল-ডে কিনা, ছুটি পেলে না। আর বোতল? দু পাঁট সাফ হয়ে গেছে, দুডজন চপ কাট্‌লেট—

গোরাচাঁদ বিরক্ত হইয়া বলিল, কেন মিছিমিছি তিলুকে আটকাচ্ছিস সবাই? সাজগোজে দেরি হয়ে যাবে, ভাল ক'রে একটু সাজতে হবে তো? কথায় বলে বরসজ্জা। ওই সঙ্গে কিছু চপ কাট্‌লেট সরিয়ে ফেল্‌গে তিলোচন, ট্রেনে কাজ দেবে।

উপর হইতে ছোট বোন ডাকিল, দাদা, গল্প করছ, জামাকাপড় পবতে হবে না? বউদি চন্দন-টন্দন নিয়ে ব'সে আছেন যে!

গোরাচাঁদই উত্তর দিল, তোমাদের সব তাড়াতাড়ি। ত্রিলোচনের গেঞ্জিতে একটা টান দিয়া বলিল, আগে গিয়ে কি যেন মিষ্টিমুখের কথা বলছিলি, দেখে শুনে দিগে। তাড়াতাড়িতে ভুলে গেলে তোর মার মনে আবার শুভদিনে একটা খটকা থেকে যাবে। ও সাজগোজের জন্যে ভাবিস নি, আজকাল আবার মেলা সাজগোজ করাটা ফ্যাশান নয়, না রে গণশা?

গণশা বলিল, তা বইকি, আজকাল যত—

ত্রিলোচন পা বাড়াইল। গণশা হঠাৎ সামলাইয়া লইয়া বলিল, মা-মালা, গোলাপজল, এসেন্স পাঠিয়ে দিগে, আর আমার জন্যে একটা সিল্কের রুমাল আর ভা-ভাল শাল পারিস তো, পা-পালিয়ে এসেছি কিনা; আর দেখ্‌—

ত্রিলোচন দরজার নিকট ফিরিয়া দাঁড়াই'ত গণশা বাঁ হাতটা তুলিয়া সিগারেটের টিন আঁটে এই পরিমাণ একটা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি মুদ্রা সৃজন করিয়া বলিল, বা-ব্বাগারি একটা

উত্তরে ত্রিলোচন বাঁ হাতের তর্জনী আর মধ্যমা আঙুল দুইটা তুলিয়া ধরিয়া হাসিয়া সংক্ষেপে বলিল, সে হয়ে গেছে—এই।

গণশা বিরক্ত হইয়া গোরাচাঁদের দিকে চাহিয়া বলিল, বে-বেচারা বিয়ের সময় একটু সাজগোজ করবে না তো ওর দিদিমাকে গঙ্গাযাত্রা করবার সময় করবে? খ্যাটের গন্ধ পেলে তোর জ্ঞান থাকে না গোরে। আমায় আবার সা-সাক্ষী মানতে কে বলেছিল র‍্যা? একটু অন্যমনস্ক হয়েছিলাম, অমনই, না রে গণশা?

২

যেখানে বিবাহ সে গ্রামটার মূল নাম গোকুলপুর; পরে 'কালসিটে গোকুলপুরে' দাঁড়ায়। কবে নাকি গ্রামের লোকেরা এক মাতাল গোরার দলকে উত্তম-মধ্যম দিয়া এই সামরিক খেতাবটা অর্জ্জন করে। মুখে মুখে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া এখন শুধু কালসিটেতে দাঁড়াইয়াছে।

বরযাত্রীর দলও প্রায় গোরার মতই শত্রুস্থানীয়, তাই গ্রামে কোন বরযাত্রী আসিলেই ছেলে ছোকরারা সুযোগমত কানে তুলিয়া দেয়, এ যার নাম কালসিটে মশাই, একটু সমঝে চলতে হবে।

গ্রামটা ডায়মণ্ড হারবারের কাছাকাছি, স্টেশন হইতে মাইল তিন-চার দূরে।

বাড়িটা নিবিড় জঙ্গলে ঢাকা। গ্রামের সব বাড়িই এই রকম। যেখানে জঙ্গল নাই, সেখানে খানা-ডোবা; দুই-একটা মাঝারি-সাইজের পুকুরও আছে, সব জলে টইটুম্বুর। জলটা ঘাটের কাছে একটু দেখা যায়, তাহার পরই ঘন সতেজ পানার কার্পেট।

সদর আর অন্দর আলাদা আলাদা, রশি দুয়েকের তফাত হইবে। উৎসব উপলক্ষ্যে সদর-বাড়ির সামনে একটা ছোট শামিয়ানা পড়িয়াছে। শামিয়ানার চারিদিকে খুঁটিতে কাচের পাত্রে মোমবাতির নিষ্প্রভ আলো, মাঝখানে একটি তীব্রজ্যোতি গ্যাসের আলো—বকমধ্যে হংস যথা শোভা পাইতেছে। অন্দর-বাহির মিলিয়া আরও গোটা-কতক গ্যাসের আলো।

শামিয়ানার মধ্যে বরের আসর। বর বিষণ্ণমুখে বসিয়া আছে এবং দূরে পাড়ার কোন মেয়ের দল বাড়ির মধ্যে যাইতেছে দেখিলেই বাসরঘর স্মরণ করিয়া অস্ফুটস্বরে বলিতেছে, বাপ রে, দফা সারলে আজ!

তাহাকে ঘেরিয়া তাহার বন্ধুবর্গ। সবচেয়ে কাছে গণশা, একটা মখমলের বালিশ বুকে চাপিয়া ত্রিলোচনের দিকে ঝুঁকিয়া বসিয়া আছে। মাঝে মাঝে ত্রিলোচনও মুখটা বাড়াইয়া আনিতেছে, এবং একটু কথাবার্ত্তা হইতেছে।

একটু দূরে কর্ত্তারা। বলা বাহুল্য, সকলেই অপ্রকৃতিস্থ—কম-বেশি করিয়া। সহায়রামবাবু কন্যাযাত্রীদের কয়েকজনের সঙ্গে বেশ জমাইয়া লইয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য, তিনি কতশত জায়গায় বরযাত্র গিয়াছেন, কিন্তু এমন ভদ্র কন্যাপক্ষ কোথাও দেখেন নাই। নানা রকম উদাহরণ দিয়া অশেষ প্রকারে কথাটা সাব্যস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু মুশকিল, তাহারা কোন রকমেই কথাটা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নয়। তাহাদের মধ্যেও সব অল্পবিস্তর নেশা করিয়াছে এবং ধরিয়া বসিয়াছে, তাহারা অতি দীনহীন ইতর; বরপক্ষীয়েরাই বরং অতিশয় ভদ্র ও সম্মানার্হ, এ গ্রামে এ রকম বরযাত্রী আসে নাই।

কথাটা অমায়িক মৃদু-হাস্যে, হাতজোড় প্রভৃতি বিনয়োচিত প্রথায় আরম্ভ হইয়াছিল; ক্রমেই কিন্তু সে ভাবটা তিরোহিত হইয়া যাইতে লাগিল, এবং একটা জেদাজেদির সঙ্গে সবার মুখ গম্ভীর হইয়া আসিতে লাগিল। ত্রিলোচনের পিসে একটু উষ্ণ হইয়া জড়িতস্বরে বলিলেন, কেমনতর লোক আপনারা মশাই? একটা ভদ্রলোক সেই থেকে বলছে, আপনাদের মত ভদ্রলোক দেখি নি, তা কোনমতেই মানবেন না? ভারিজ্বালা তো!

ওদিককার একজন তাঁরই মত ভারী আওয়াজে উত্তর করিল, আর আমাদের কথাটা বুঝি কিছু নয় তা হ'লে মশাই? আমরা এতগুলো ভদ্রলোক মিথ্যাবাদী হলাম?

ত্রিলোচনের পিসের পোষকতা পাইয়া সহায়রামবাবুর আত্মসম্মান ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। রাগিয়া গলা চড়াইয়া বলিলেন, কটা ভদ্রলোক আছে

আপনাদের মধ্যে গুনে দিন তো দেখি, চিনতে পারছি না। ভদ্রলোকের 'মান রাখতে জানেন না, আবার ভদ্রলোক ব'লে পরিচয় দিতে যান।

বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না যে, তাঁহার উচ্চারণ আরও বেশি গাঢ় এবং অস্পষ্ট।

পিছন হইতে একটা ছোকরা শাসাইল, এটা কলসিটে মশাই, মনে থাকে যেন।

একটা বাড়াবাড়ি রকম কিছু হইতে যাইতেছিল, কন্যাবাড়ির লোকেরা এবং কয়েকজন বয়স্থ লোক আসিয়া তাড়াতাড়ি থামাইয়া দিল। সহায়রামবাবু আর ত্রিলোচনের পিসেকে ধরিয়া সদর-বাড়ির ঘরে উঠাইয়া লইয়া গেল, এবং ওদিককার কয়েকজনকেও সরাইয়া আসরের নিদারুণ ভদ্রাভদ্র সমস্যাটা কতক হালকা করিল।

রাজেন তাহার নিজের লেখা কবিতা বিলি করিতে যাইতেছিল। ঘোৎনা তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহাকে বসাইয়া দিল, কানের কাছে মুখ দিয়া বলিল, এই, সব ক্ষেপে রয়েছে, এখন আর ঘাঁটাস নি। যারা পড়তে জানে না, ভাববে ঠাট্টা করছে।

রাজেন ক্ষুণ্নমনে বলিল, তা হ'লে এগুলো কি হবে? এত কষ্ট ক'রে লিখলাম, ছাপালাম, কেউ পড়বে না?

গোরাচাঁদ আশ্বাস দিল, ভাবিস নি, আমি কাল শেয়ালদার মোড়ে বিলি করিয়ে দোব 'খন। আজকাল একটা ছোঁড়া জ্যাঠার সন্ন্যাসীপ্রদত্ত দন্তভৈরবের হ্যাণ্ডবিল বিলোয় কিনা, সঙ্গে একখানা ক'রে তোর 'হর্ষোচ্ছ্বাস'ও দিয়ে দেবে।

রাজেন কোন উত্তর দিল না, নাক মুখ কুঞ্চিত করিয়া পদ্যের বাণ্ডিলটা হাতের মধ্যে ঘুরাইতে লাগিল।

ত্রিলোচন ভীতভাবে গণশার দিকে মুখটা সরাইয়া লইয়া গিয়া বলিল, দেখলি তো পিসে আর সহায়রামবাবুর কাণ্ডটা? ওদের আর কি? ওরা দুজনেই তো এই গাড়িতে লম্বা দেবে, সব ঝোঁকটা গিয়ে পড়বে আমার ওপর। ভাবটা বুঝিস তো? ব্যাটারা বাড়িতে মেয়েদের সব খবর দিতে গেল, আসরের শোধ বাসরে তুলবে। আঃ, গোলমালে

আবার গানের অন্তরাটা দিলে ভুলিয়ে। তারপর কি র‍্যা গণশা,—মুহা পঙ্কজ সোঙরি সোঙরি? একটু মাথাটা সরিয়ে আন্, সুর ক'রেই বল্।

গণশা মখমলের বালিশের উপর তর্জনীর টোকা দিতে দিতে ত্রিলোচনের মুখের উপর ভাবব্যাকুল চোখ দুইটা তুলিয়া গুনগুন করিয়া গাহিতে লাগিল—

মুহা পঙ্কজ সোঙরি সোঙরি
চিত মোর ব্যা—ব্যা—ব্যা

রাজেন সরিয়া আসিয়া ধীরে ধীরে মাথা নাড়িতেছিল, এই গাঁটের মাথায় নিজের গলাটা জুড়িয়া দিল—

ব্যাকুল হোয়,
নয়না নিদ জানত নেহি,
মানত নেহি

গণশা গাহিতেছিল—

জা-জ্জা-জ্জানত নে-হে—

রাজেনের হাতটা টিপিয়া বলিল, তুই থাম্, এগিয়ে যাচ্ছিস তা-ত্তাড়াহুড়ো ক'রে।

রাজেন এই রকম চারিদিকেই থাবা খাইয়া নেহাত অপ্রসন্নভাবে মুখটা ঘুরাইয়া বসিয়া রহিল। মনে মনে ভাবিল, এমন জানিলে কখনই আসিত না। গণশার ব্যবহারে তাহার দুঃখটা বিশেষ করিয়া এইজন্য যে, গানটি তাহার স্বরচিত, যদিও গণশার সুর দেওয়া। রাজেন 'বাসর-তাণ্ডব' নাম দিয়া ঝালোয়ার প্রদেশের রাজপুত-কাহিনী অবলম্বন করিয়া একটা নাটক লিখিতেছে। ঝালোয়ার-সামন্ত সুব্বা সিং বাসরঘরে রাজপুত বীরাঙ্গনা-পরিবৃত হইয়া অবগুণ্ঠনবতী বধূ মীরাবাঈয়ের উদ্দেশ্যে তন্ময় হইয়া গানটি গাহিতেছেন, এমন সময় খবর পাওয়া গেল, দুর্গপাদদেশে মুঘল সৈন্য।

এই সময় ত্রিলোচনের বিবাহের হাঙ্গামা আসিয়া পড়ায় নাটকটা আর অগ্রসর হয় নাই। রাজেন স্থির করিয়াছিল, রাজপুতদের জিতাইবে; কিন্তু গণশার দুর্ব্যবহারে মেজাজটা অত্যন্ত তিক্ত হইয়া যাওয়ায় মনে মনে

ভাবিতেছে, গণেশশঙ্কর নাম দিয়া একটা তোতলা দাগাবাজ ব্রাহ্মণকে দাঁড় করাইয়া রাজপুত-বাহিনীকে মুঘলের হস্তে বিধ্বস্ত করাইয়া দিবে।

গোরাচাঁদ কে. গুপ্তকে বলিতেছিল, লুচি ভাজার গন্ধ বেরুচ্ছে, কি রকম খাওয়াবে কে জানে!

এমন সময় ত্রিলোচনেব পিতা ডাক দিলেন, বাবা গোরাচাঁদ, শুনে যাও একটা কথা।

গোরাচাঁদ কাছে গিয়া বসিল। ত্রিলোচনের পিতার চোখ দুইটি একটু রক্তাভ, বেশ অনাযাসেই যে চাহিযা আছেন এমন বোধ হয় না। গোরাচাঁদের কাঁধের উপর কোমলভাবে স্পর্শ করিযা প্রশ্ন করিলেন, বাবা, আমার ত্রিলোচন আর তোমরা কি আলাদা?

গোরাচাঁদ এ প্রশ্নের কোন সঙ্গত কারণ খুঁজিযা পাইল না; কিন্তু কর্ত্তার অবস্থা দেখিযা সহজে অব্যাহতি পাইবার আশায উত্তর করিল, আজ্ঞে না, আমরা সবাই আপনার ছেলের মতন, কিছু তফাত নেই তো! তিলুকে নিজের ভাই জেনেই তো এসেছি সব।

তা হ'লে একটি কথা,—কেউ তোমরা এখানে অন্নস্পর্শ ক'রো না আজ।

গোরাচাঁদ একেবারে স্তম্ভিত হইযা গেল। এ আবার কি ফ্যাসাদ! একটু চুপ করিযা থাকিবার পর তাহার একটা সম্ভাবনার কথা মনে হইল; বলিল, আজ্ঞে আমরাও যা, তিলোচনও তাই; কিন্তু ওর আজকে বিয়ে ব'লে কিছু খেতে নাই, আব আমবা তো শুধু বরযাত্রী হযে এসেছি কিনা—

সেজন্যে নয়। এদের আক্কেলটার কথা ভাবছি, আমাদের কি অপমানটা করলে, দেখলে না? আমি যৎপরোনাস্তি রেগেছি গোরাচাঁদ; এই আমি আর তোমাদের মেসো ব'সে আছি, বর তুলে নিয়ে যাক তো আমাদের সামনে থেকে!

গোরাচাঁদ ভীত হইয়া বলিল, আজ্ঞে, সেটা কি ভাল হবে? খেতে বারণ করেন সে কিছু শক্ত কথা নয়, কিন্তু এরা যে রকম অবুঝ আর বেয়াক্কেল লোক দেখছি, বর না উঠতে দিলে একটা হাঙ্গামা—

ওরে, এই দিক পানে, অন্দরে নিয়ে যা, ওই দিক দিয়ে ঘুরে যা'।

কয়েকটা ভারী দই-ক্ষীরের তিজেল বাঁকে হইয়া একবার এদিক একবার ওদিক করিতেছে। গোরাচাঁদ সতৃষ্ণনয়নে দেখিয়া লইয়া বলিল, কি যে বলছিলাম? হ্যাঁ, বর না উঠতে দিলে একটা হাঙ্গামা—এমন কি, না খেলেও একটা রীতিমত হাঙ্গামা করতে পারে। তাই বলছিলাম—

ত্রিলোচনের পিতা গণশাকে ডাক দিতে যাইতেছিলেন। গোরাচাঁদ ত্রস্তভাবে বলিল, আমি দিচ্ছি ডেকে, আপনি কষ্ট করতে যাবেন কেন? হ্যাঁ, ও বরং চালাক আছে, যা বলে—

গিয়া গণশাকে বলিল, তিলুর বাবা ডাকছেন রে। একটু চাপা গলায় তাড়াতাড়ি টিপিয়া দিল, দেখিস, যেন মেলা আত্মীয়তা করতে যাস নি; তা হ'লে আমার মতন বেকায়দায় ফেলে খাওয়া বন্ধ করবে, ভয়ানক খাপ্পা হয়েছে এদের ওপর।

এই সময় কন্যাকর্ত্তা গলায় গামছা দিয়া করজোড়ে বরের আসরের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সাধারণভাবে সভাস্থ সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, এইবার বরকে নিয়ে যাবার—। কই, বেয়াই-মশাই কোথায়? এই যে—

কাছে গিয়া বলিলেন, তা হ'লে দাদা, অনুমতি দেন এইবার।

গোরাচাঁদ, গণশা, ত্রিলোচন সকলেই রুদ্ধশ্বাসে একটা বিষম দুর্ঘটনার অপেক্ষা করিতে লাগিল। ত্রিলোচনের পিতা একটু চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর ধীরে-সুস্থে উঠিয়া কন্যাকর্ত্তাকে বুকে জড়াইয়া গদগদকণ্ঠে বলিলেন, তিলু তো তোমারই ছেলে ভাই, আজ যদি—ওফ! গলাটা অশ্রুবদ্ধ হইয়া পড়ায় আর বলিতে পারিলেন না।

যাইবার সময় ত্রিলোচন বন্ধুদের দিকে একটা বিপন্ন অসহায় ভাবের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গেল। কে. গুপ্ত একটু কাছে ছিল, সাহস দিয়া বলিল, যান, ভগবান আছেন।

বর চলিয়া গেলে গোরাচাঁদ তাড়াতাড়ি ত্রিলোচনের পিতার নিকট গেল; ডাকিল, জ্যাঠামশাই!

ত্রিলোচনের পিতা শোকাচ্ছন্নভাবে মাথাটা হাতের তেলোয় ধরিয়া

বসিয়া ছিলেন, মুখ তুলিয়া গাঢ়স্বরে বলিলেন, কে, গোরাচাঁদ? গোরা রে, আজ যদি বাবা বেঁচে থাকত—ওফ!

গোরাচাঁদ বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ। বলছিলাম, আর তবে না-খাওয়ার হাঙ্গামাটাও ক'রে কাজ নেই, কি বলেন? যখন মিটেই গেল—

৩

বর চলিয়া গেলে কন্যাপক্ষের একজন আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বরযাত্রীদের মধ্যে কাঁরা এই গাড়িতে ফিরে যাবেন যেন?

ঘোঁৎনা বলিল, হ্যাঁ, সহায়রামবাবু আর বরের পিসেমশাই, তাঁরা ওই ঘরে রয়েছেন।

প্রশ্নকর্তা বলিল, দুজন তা হ'লে? বলেন তো আপনাদের সবারই জায়গা ক'রে দিই। কজন আছেন সব মিলিয়ে?

গোরাচাঁদ তাড়াতাড়ি সামনে আগাইয়া বলিল, হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়। আছি, আমি এক, ঘোঁৎনা দুই—

গণশা নীচু গলায় ধমক দিয়া বলিল, খা-খ্‌খালি খাই খাই, স্ত্রী-আচার দেখবি নি? রাজুকে খোঁ-খ্‌খোঁজ নিতে পাঠালাম কি করতে? আজ্ঞে না, আমরা একটু ফুর্তি-টুর্তি করি, খাওয়া তো রোজই—

হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই ঠিক, একটু আমোদ-আহ্লাদ গান-বাজনা করুন। কই হে, এঁদের ডেকে নাও না তোমরা। শিবপুর থেকে এসেছেন, গান-বাজনার দেশ; বলে, গাইয়ে বাজিয়ে সুর, তিনে শিবপুর।

সভার এক দিকে গান-বাজনা হইতেছিল। এক চুড়িদার-পাঞ্জাবি-পরা ছোকরা শীর্ণ কাঁধের উপর কেশভারাক্রান্ত মাথাটা প্রচণ্ড বেগে নাড়িয়া নাড়িয়া গান গাহিতেছে, সাত-আটটি সমবয়সী মন্দিরা বাজাইয়া, শিস দিয়া, হাততালি দিয়া, তুড়ি বাজাইয়া তাহাকে উৎসাহিত করিতেছে। আশপাশের আর সকলে সমস্ত দলটির মৃত্যুকামনা করিতেছে।

ভদ্রলোকের কথায় একজন বলিল, আমরা তো তাই চাই। আপনারা দয়া ক'রে—

গণশা সবার মুখপাত্র হইয়া বলিল, মা-মাপ করবেন; আমাদের মধ্যে কেউ গা-গ্‌ গাইতে বাজাতে জানে না।

ওদিককার একজন বলিল, সে কথা শুনব কেন মশাই? সাদা কথাতেই অমন গিটকিরি বেরুচ্ছে, গাইতে বসলে—

অপর এক ছোকরা জুড়িয়া দিল, গিটকিরি ছাড়া তো কিছু বেরুবেই না।

গণশা একটা রাগারাগি গণ্ডগোল করিতে যাইতেছিল, রাজেন আসিয়া ধীরে ধীরে তাহার কাঁধে হাত দিয়া চাপা গলায় বলিল, হাড় কখানির মায়া রাখ?

গণশা ফিরিয়া বলিল, কেন, কি হয়েছে?

তা হ'লে স্ত্রী-আচার দেখবার নাম ক'রো না। যা ক'রে বেঁচে এসেছি, আমিই জানি। বাইরে দাঁড়িয়ে যাব কি না-যাব ভাবছি, একটা কেলে রোগা ছোঁড়া এসে বললে, ভেতরে চলুন না, বাইরে কষ্ট করছেন কেন? সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি, হঠাৎ কোথা থেকে এসে কাঁধের ওপর হাত দিয়ে—কে মশায় আপনি? ফিরে দেখি, ইয়া লাস, আমার পায়ের গোছ তার হাতের কব্জি। পরে একজনের কাছে খবর নিয়ে জানলাম, কনের কাকা, নাম জগুদা। থতমত খেয়ে বললাম, বরযাত্রী—স্ত্রী-আচার দেখছি।

শুনে সুখী হলাম। একলা যে?

বললাম, তারা আসব আসব করছে।

শুনে সুখী হলাম, তাঁদের ডেকে নিয়ে আসুন। একটিতে আমার হাতের সুখ হবে না। কালসিটেতে এসে স্ত্রী-আচার দেখবে? মাতলামির আর জায়গা পাও নি?

আমি তো ভয়ে কেঁচোটি হয়ে সুড়সুড় ক'রে বেরিয়ে এলাম। দেখি সেই সে কোণে হারামজাদা ছোঁড়াটা দাঁড়িয়ে মুচকে মুচকে হাসছে, যদি কখনও শিবপুরে পাই ব্যাটাকে—

গান-বাজনার কথা লইয়া গণশার রাগটা চড়িয়াই ছিল, আরও ক্ষিপ্ত হইয়া বলিল, ইডিয়ট! ভী-ভ্‌ভীরু কোথাকার! বি-বিয়ে দেখতে এসে

যদি স্ত্রী-আচারই দেখলাম না তো—। চল্ সবাই, দে-দ্দেখি কে কি করে! গণশা দৃপ্তভাবে পা ফেলিয়া অগ্রণী হইল, আর সবাই সাহস এবং উৎসাহের অনুপাতে আগু পিছু হইয়া চলিল। রাজেন শুধু ভীরু অপবাদটা দূর করিবার জন্য গণশার পাশে রহিল। সদর ছাড়াইয়া একটু দূরে যাইতেই তাঁহার সঙ্গে দেখা। গায়ে একটা সোয়েটার মাত্র, সবল পেশীগুলা জাগিয়া আছে। একটা গামছা কাঁধে ফেলিয়া এদিকেই আসিতেছিলেন, রাজেন দূর হইতে চিনাইয়া দিল; অবশ্য চিনাইয়া না দিলেও কোন ভুল হইত না।

কাছে আসিয়া রাজেনকে লক্ষ্য করিয়া একটা খসখসে গম্ভীর আওয়াজে বলিলেন, এই যে, সবাইকে ডেকে এনেছেন!

রাজেনের মুখটা ফ্যাকাশে হইয়া গেল, আমতা-আমতা করিয়া বলিল, আজ্ঞে না, মানে হচ্ছে, এরাই সব বললে—

ঘোঁৎনা আগাইয়া আসিয়া বলিল, গোরাচাঁদ বললে, বরং খেয়ে নিলে হ'ত; আমি বললাম, তা হ'লে কনের কাকাকে গিয়ে বললেই হবে, তিনিই সব করছেন কম্মাছেন—

রাজেন বলিল, আমি বললাম, আর জগুদা লোকও বড় ভাল।

গণশা বলিল, লো-ল্লোক ভাল শুনে আমি বললাম, চ-চ্চল্ তা হ'লে আম্মো যাই জগুদাদার সঙ্গে একটু আলাপ-পরিচয়ও হবে। সে-স্সে একটা মস্ত সৌভাগ্য কিনা।

ভদ্রলোক বলিলেন, বেশ বেশ; কিন্তু দু-একটা জিনিস এখনও বাকি আছে। যদি ক্ষিদে পেয়ে থাকে তো গোরাচাঁদবাবু না হয়—

ঘোঁৎনা বলিল, সেই খুব ভাল কথা। গোরাচাঁদ, তুই তা হ'লে—। কোথায় গেল গোরাচাঁদ?

শুরুতেই যেই ঘোঁৎনা 'গোরাচাঁদ বললে' বলিয়া আরম্ভ করিয়াছিল, গোরাচাঁদ বহির্মুখী একটি ছোট্ট দলে ভিড়িয়া বেমালুম সরিয়া পড়িয়াছিল, তাহাকে পাওয়া গেল না।

ভদ্রলোক চলিয়া গেলে কেহ আর কোন কথা কহিল না। শুধু

কে. গুপ্ত একটু ছাপরেয়ে ইডিয়ম মিশ্রিত করিয়া বলিল, খুব হট্টাকট্টা জোয়ান, গ্র্যাণ্ড ফুল ব্যাক হয়, গোষ্ঠ পালের জোড়া।

আরও ঘণ্টা দুয়েক কাটিল। দলটা খানিকক্ষণ স্রোতের কুঠাকাঠির মত এদিক সেদিক করিয়া কাটাইল। দুই-একজন সহায়রামবাবুদের সঙ্গে চলিয়া যাইতেও চাহিল; বাকি সবাই তাহাদের আটকাইয়া রাখিল।

খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই আবার আসরে আসিয়া জুটিল। ভাঙা আসর, এখানে সেখানে এক-আধজন শুইয়া গড়াইয়া আছে। আশে-পাশেও লোক বিরল, আলোও বেশীর ভাগ নির্ব্বাপিত। গোরাচাঁদ একটা বালিশের উপর কাত হইয়া বলিল, খাইয়েছে মন্দ নয়, তবে একটু একটেরেয় প'ড়ে গিয়েছিলাম, এই যা।

খানিকক্ষণ খাওয়ার আলোচনাই চলিল।

গোরাচাঁদ আবার বলিল, রাজু, তোর পদ্যটা পড়্ তো একটু, শুনি। গোড়াটায় বেশ লিখেছিস—

'আজকে সখা দিল-পেয়ালায় ফুর্ত্তি-সরাব উছলে ওঠে।'

ঘোঁৎনা বিরক্তভাবে বলিল, আরে দুৎ, উছলে ওঠে! তিলুর বিয়েটা জমতেই পেলে না, পদে পদে বাধা; এ যেন—। গণশা কোথায়? দেখছি না যে?

রাজেন বলিল, তাই তো!

শুইয়া বসিয়াই সকলে চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল।

কে. গুপ্ত হঠাৎ ঘোঁৎনার কাঁধটা নিজের কাছে টানিয়া বলিল, দেখুন তো, গণেশবাবুর মতই না?

ঘোঁৎনা বলিল, তাই তো বোধ হচ্ছে, অন্ধকারে ওখানে কি করছে ছোঁড়া?

সদর-বাড়ির বাঁ দিক দিয়া একটা রাস্তা স্টেশনের দিকে গিয়াছে এবং তাহারই একটা সরু ফেঁকড়া ঘন বন জঙ্গল রাবিশ প্রভৃতির মধ্য দিয়া অন্দর-বাড়ির পিছন দিকে হারাইয়া গিয়াছে। সেই রাস্তাতেই একটা বিচালির গাদার আড়ালে গণশাকে দেখা গেল, অতি সন্তর্পণে চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে করিতে আসিতেছে। বিচালিটা

পার হইয়া বেশ সহজ ভাব ধারণ করিল। দলের মধ্যে আসিয়া সকলের উৎসুক প্রশ্ন নিবারণ করিয়া চাপা গলায় বলিল, চুপ।

বলিয়া নিজেও একটু চুপ করিয়া রহিল। ঘোঁৎনা তাহার কাপড় হইতে একটা চোরকাঁটা ছাড়াইয়া লইয়া প্রশ্ন করিল, কোথায় গিয়েছিলি রে গণশা?

গণশা মুখটা একটু নীচু করিল, সবাই ঘেঁষিয়া আসিলে বলিল, ত্রি-ত্রিলুর বাসরঘর দেখে এলাম।

'সে কি!' 'ভুৎ, মিছে কথা।' 'মাইরি?'—বলিতে বলিতে সবাই আরও ঘেঁষিয়া আসিল। কে. গুপ্ত বলিল, ত্রিলোচনবাবু আছেন তো? —কান-টান—জামায় রক্ত—টক্ত—

আপনার ত্রিলোচন এখন সহস্রলোচন ইন্দ্র হয়ে ব'সে আছে, চা-চ্চারিদিকে অপ্সরী, কিন্নরী, ঠানদিদি—

রাজেন কল্পনায় চিত্রটা আঁকিয়া লইয়া বলিল, উঃ, যেতে হবে মাইরি।

গণশা জানাইয়া দিল, অভিযানটা বেজায় শক্ত। সরু রাস্তাটা একটু গিয়া আর নাই। তাহার পর দূরের গান-বাজনা আর মাঝে মাঝে হাসির শব্দ লক্ষ্য করিয়া, ঘন আগাছার মধ্য দিয়া ছাই, গোবর, ভাঙা ইট, সুরকির গাদা প্রভৃতির উপর দিয়া বাড়ির পিছন দিকে পৌছিতে হইবে। সে আরও মারাত্মক জায়গা, চাপ জঙ্গল, ঘুটঘুটে অন্ধকার। দুইটা ঘর পার হইয়া বাসরঘরটা। খড়খড়ি-দেওয়া পাশাপাশি দুইটা জানালা, শীতের জন্য বন্ধ। একটার জোড়ের কাছটা একটু ফাঁক হইয়া গিয়াছে, আর অন্যটাতে একটা খড়খড়ির নীচের দিকে একটা ছোট্ট ফালি উড়িয়া গিয়াছে। ভ-ভ্ভগবানের দয়া—। বলিয়া গণশা বিবরণ শেষ করিয়া প্রশ্ন করিল, বো-ব্বোঝ; চাও যেতে কেউ?

ঘোঁৎনা বলিল, আলবৎ যাব, এর আর বোঝাবুঝি কি আছে?

কে. গুপ্ত বলিল, সাপখোপ—

ঘোঁৎনা ধমক দিয়া বলিল, রাত্তিরে ওই নাম করছেন? আচ্ছা কাঠগোঁয়ার তো!

কে. গুপ্ত ধাঁধায় পড়িয়া চুপ করিয়া গেল।

গণশা বলিল, তবে হ্যাঁ, জঙ্গলের ওদিকে খানিকটা ফাঁকা মা-ম্মাঠ আছে ; যদি তাড়া করে তো—

গোরাচাঁদ প্রশ্ন করিল, কি দেখলি জানলার ফাঁক দিয়ে গণশা ? এক ঘর বুঝি খুব স্থন্—

রাজেন বাধা দিল, থাক্, বর্ণনা করলে আবার বাসি হয়ে যাবে।

সে করাও যায় না।—বলিয়া গণশা সকলের উৎসুক কল্পনাকে একেবারে চরমে উদ্দীপিত করিয়া তুলিল।

৪

দুইটা জানালার মধ্যে হাত চারেকের জায়গা। একটা রাজেন আর গণশা, অপরটা ঘোঁৎনা আর কে. গুপ্ত দখল করিল।

পথে গোরাচাঁদের পা দুইটা হাঁটু পর্য্যন্ত একটা গোবর-গাদায় ডুবিয়া গিয়াছিল। গণশার কানের কাছে ফিসফিস করিয়া বলিল, ওরে গণশা, বড্ড কুটকুট করছে, উঃ, কি করি বল্ তো ?

গণশার মন তখন অন্য রাজ্যে। একটি ষোড়শী আসিয়া কনের মুখের ঘোমটা তুলিয়া ত্রিলোচনকে বলিতেছে, এই দেখ ভাই। আহা, বেচারী এইজন্যে মনমরা হয়ে ছিল গো ! দেখ দিকিন কেমন !

গোরাচাঁদ গণশার কাঁধটা একটু টিপিয়া বলিল, শুনছিস ? গেলাম, গেলাম মাইরি, গোবরটা নিশ্চয় পচা ছিল।

গণশা ছিদ্রপথে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া অন্যমনস্কভাবে প্রশ্ন করিল, কি ক'রে জানলি ?

গোরাচাঁদ খিঁচাইয়া বলিল, কি ক'রে জানলি ! ভয়ানক কুটকুট করছে যে পা দুটো।

গণশা চোখ দুইটা ছিদ্রপথে আরও ভাল করিয়া বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন ?

গোরাচাঁদ নিরাশ হইয়া অপর জানালায় চলিয়া গেল, ঘোঁৎনার জামার খুঁটে একটা টান দিয়া বলিল, ঘোঁতু, পচা গোবরের কোন রকম ওষুধ—

না, হয় না ; ফেলে দে।—বলিয়া ঘেঁৎনা তাড়াতাড়ি আবার দৃষ্টিটা গবাক্ষবদ্ধ করিল।

ষোড়শী ঢলঢলে চোখ দুইটি তখন বরের মুখের উপর রাখিয়া আবদারের সুরে বলিতেছে, হ্যাঁ ভাই বর, অমন চাঁদপানা মুখ একখানা দেখিয়ে দিলাম, মজুরি হিসাবেও একখানা গান—

একটি কিশোরী বলিল, হ্যাঁলা সরীদি, জানিস না, দয়া করলে কি আকে রস দেয় ? কানে মোচড না দিলে কি গান বেরোয় ?

ঘেঁৎনা কে. গুপ্তকে টিপিয়া ধীরে ধীরে বলিল, দেখলেন, ওইটুকু মেয়ে অবলীলাক্রমে বিদ্যাসুন্দর আউড়ে দিলে।

কে. গুপ্ত প্রশ্ন করিল, সে আবার কি ?

ঘেঁৎনা মুখ ঘুরাইয়া লইয়া মনে মনে বলিল, তোমার মুণ্ডু, ছাতুখোর !

ওদিকে রাজেন গণশাকে প্রশ্নে প্রশ্নে বোঝাই করিতেছিল, পোষ মাসে বিয়ে হয় না, না রে গণশা ? ধর্, যদি তেমন তেমন জরুরি হয় ? আচ্ছা, মাঘ মাসে ? মাঘ মাসের গোড়ায় দিন-টিন আছে কি না খোঁজ রাখিস ?

ঘরের ভিতর কানমলার অনেকগুলি সমর্থনকারিণী জুটিয়া গেল। ত্রিলোচন ভয়ে ভয়ে হাত বাড়াইয়া বলিল, থামুন ; আমি গাইব, তবে কথা হচ্ছে, গানের অন্তরাটা হারিয়ে যাচ্ছে, বাংলা নয় কিনা। যদি একবার ভেতরের বারান্দায় গণশাকে ডাকিয়ে পাঠান তো—

গণশা তাড়াতাড়ি মুখটা সরাইয়া লইয়া অতিরিক্ত উৎকণ্ঠার সহিত ফিসফিস করিয়া বলিল, কি সর্ব্বনাশ বল দিকিন ! ইডিয়ট ! এক্ষুনি ওদিকে ডাক পড়বে, এখন কি করা—

রাজেন দেখিতেই ছিল ; হাতটা একবার 'না'র ভঙ্গীতে নাড়িয়া গণশাকে টানিয়া লইল। গণশা শেষের দিকটা শুনিতে পাইল, আমরা গণশা কি ঢ্যাপসা এদের ডাকতে যাই আর কি—

গোরাচাঁদ গণশা আর রাজেনের মাঝখানে মুখটা গুঁজিয়া দিয়াছিল। হঠাৎ পায়ের চিড়বিড়ানিটা বাড়িয়া যাওয়ায় এক রকম নাচিতে নাচিতেই সরিয়া আসিল। সঙ্গে সঙ্গে গণশাকে টানিয়া লইয়া চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, আবার চাগিয়েছে রে, গেলাম মাইরি।

তুই সব মাটি করলি ; আয় তো এদিকটায় ফাঁকায় একটু স'রে।
সেই মেয়েটা এতক্ষণ বোধ হয়—

পাশেই হঠাৎ দুয়ার খোলার আওয়াজ হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে একরাশ এঁটো পাতা, খুরি, গেলাস দুইজনের মাথায় কাঁধে পিঠে সজোরে আছড়াইয়া পড়িল। তাহার পর তাহাদের ফিরিবার সঙ্গে সঙ্গেই 'ওগো বাবা গো' ডাকাত—বলিয়া স্ত্রীকণ্ঠে একটা চীৎকার, ঝনাৎ করিয়া দুয়ার বন্ধ, সশব্দে পতন, গোঙানি, বিভিন্ন কণ্ঠে হাঁকাহাঁকি, বিভিন্ন দিকে ছুটাছুটি, সবগুলা যেন এক মুহূর্তে সংঘটিত হইয়া বাড়িটাকে তোলপাড় করিয়া তুলিল।

দলটার যে যেখানে ছিল, একটু হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ভাবিবার সময় নাই, শুদ্ধ জীবধর্ম্মের প্রেরণায় কাজ। কোন রকমে বাঁচিতে হইবে, যেমন করিয়াই হোক না কেন।

কে. গুপ্ত যেদিক হইতে আসিয়াছিল, সোজা সেই দিকে ঘুরিয়া ছুট দিল ; সদরের দিকে নয় ; একেবারে সোজা।

ওই পালায়, পেছু নাও।

উত্তর দিকে ছুটেছে।

ঘোঁৎনা পলাইবার উপক্রম করিয়া ঘুরিতেই একটা গাছে ধাক্কা লাগিল। বোধ হয় পেঁপেগাছ, খুব মোটা।

ওদিকে কে হাঁকিল, না, বন্দুক না নিয়ে বেরিও না ; খবরদার। টোটা ভ'রে বেরুবে।

ঘোঁৎনা তরতর করিয়া পেঁপেগাছটার উপর উঠিয়া পড়িল। একটু উপরে উঠিয়াই টের পাইল, কতকগুলা ডাল বাহির হইয়া একটা ঝোপ ; আপাতত সেখানটায় একটু থামিল।

গণশা গোরাচাঁদের কোমরের র‍্যাপারটা টানিয়া বলিল, সা-স্‌সামনেই ফাঁকা মাঠটা, শিগগির নেমে পড়্।

রাজেন বলিল, তার চেয়ে চেঁচিয়ে বল্, আমরা বরযাত্রী।

তুই আলাপ ক-কয়্গে মুখ্যু।—বলিয়া গণশা গোরাচাঁদকে এক রকম টানিতে টানিতে পা বাড়াইল।

পাশেই বাসরঘরে একটু যেন ধস্তাধস্তি হইতেছে। একজন বয়স্থার গলার আওয়াজ, ওরে, না না, জানলা খুলিস নি, ওদের হাতে বন্দুক থাকে, ওরে অ নীহার! কি নির্ভয় মেয়ে সব বাবা আজকালকার!

জানালাটা টানা-হিঁচড়ার মধ্যে খুলিয়া গেল। রাজেন এক রকম লাফ দিয়াই গণশা-গোরাচাঁদকে ধরিয়া ফেলিল। তাহার পরেই পাতলা আগাছার মধ্য দিয়া ছুট। হাত-কয়েক পরে জমিটা সামনে একটু নামিয়া গিয়াছে, তাহার পরেই ফাঁকা। তিনজনে ঢালুটুকু এক রকম লাফ দিয়াই কাটাইল; পরক্ষণেই ঝপাং ঝপাং করিয়া তিনটা শব্দ।

ওরে, পুকুরে পড়েছে—খিড়কির পুকুরে, তিনটে।

খিড়কির দরজা খুলিয়া গেল।

লালঠেনে হবে না, গ্যাস-লাইটটা নিয়ে আয়।

একটা টর্চ হ'লে হ'ত—বরযাত্রাদের কাছে একটা আছে, নিয়ে আয়; তারা ঘুমোচ্ছে বোধ হয়, জাগিয়ে দে।

তিনজনে প্রাণপণে সাঁতার কাটিতে লাগিল। রাজেন চাপাস্বরে বলিল, এই তোর মাঠ? কি ভীষণ পানা রে বাবা! উফ!

গণশা বলিল, ঘা-ঘাস ভেবেছিলাম। ডুব-সাঁতার কাট্।

সমস্ত পাড়ায় সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। বেটাছেলের গলার আওয়াজ ক্রমেই বেশি শোনা যাইতেছে। নানা রকম প্রশ্ন, উত্তর, হুকুম।

এই পুকুরে?

হ্যাঁ, ঘিরে ফেল। লাঠি শড়কি যাই হোক, সবাই এক-একটা হাতে রেখো, ভয়ঙ্কর লাস এক-একটা।

রঘো বাগদীকে খবর দেওয়া হয়েছে?—এটা যেন জগুদার স্বর।

এক কোণ হইতে গগনবিদারক আওয়াজ আসিল, এজ্ঞে, এই যে মুই রামদা নিয়ে রয়েছি। নেমে পড়ব?

এপার হইতে উত্তর হইল, না, ঘিরে ফেল চারিদিক থেকে। ওরে কুকুর দুটোকে খুলে দে।

দেখতে পাচ্ছ কেউ?

রঘো বলিল, যেন তিনটে মাথা ওদিকপানে।

গণশা ডুব দিল।

ছুটো।

রাজেন গোরাচাঁদ ডুব দিল।

গোঁত্তা দিয়েছে সব।

নজর রাখিস।

রাজেন মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল, কতক্ষণ ডুবে থাকা যায়?

গোরাচাঁদ প্রতিপ্রশ্ন করিল, কতক্ষণ ভেসে থাকা যায়? আমার পেটে জায়গাই ছিল না, তার ওপর জল—

রাজেন বলিল, পানার জল। উঃ, কি কামড়ায় র‍্যা?

গণশা বলিল, মাছ। আবার পচা গোবরের চার পেয়েছে কিনা।

যে টর্চ আনিতে গিয়াছিল, খিড়কির নিকট হইতে চেঁচাইয়া বলিল, বরযাত্রীরা তো নেই জগুদা, দুজন খালি মদ খেয়ে নাক ডাকাচ্ছে। ডাকাত পড়েছে বলতে বললে, প'ড়ে থাক, উঠিও না।

পুকুরের এক দিক হইতে জগুদার কর্কশ আওয়াজ হইল, আপনারা তা হ'লে কোন্ দিকে আছেন মশাই? একবার টর্চটা বের করুন না।

অপর একজন বলিল, তারা আবার এই সময় কোথায় গেল। পরের ছেলে—ভাবনার কথা তো!

গোরাচাঁদ হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, এই গণশা, এই তালে জানিয়ে দে, আমরা এখানে, কোন ভাবনা নেই।

রাজেন বলিল, আর টর্চটা ভিজে গেছে।

গণশা বোধ হয় জানাইতে যাইতেছিল, কিন্তু ঠিক এই সময় পাশে একটা ঢিল আসিয়া পড়ায়, সে সঙ্গে সঙ্গে জলের মধ্যে ডুবিয়া পড়িল।

ওই যে, ওইখানটায় একটা ঘায়েল হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকটা ছোট বড় ঢিল আসিয়া আশেপাশে পড়িল। একটা বন্দুকের আওয়াজও হইল।

আর দেরি করা চলে না। গোরাচাঁদ হাঁপাইতে হাঁপাইতে চেঁচাইয়া বলিল, ঢিল ছুঁড়বেন না আপনারা।

রাজেন বলিল, বন্দুকও ছুঁড়বেন না।

একজন কথাগুলো বাঁকাইয়া বলিল, বটে বটে, কি ছুঁড়তে তা হ'লে হুকুম হয় ?

একজন ইয়ার গোছের ছোকরা ও-কিনারা হইতে বলিল, ফুল ছুঁড়ুন, চন্দনে ডুবিয়ে।

গোরাচাঁদ দম লইয়া বলিল, আমরা বরযাত্রীর দল।

চারিদিকে একটু নিস্তব্ধ হইয়া গেল, আধ মিনিট-টাক মাত্র। তাহার পর সকলের বুদ্ধি ফিরিয়া আসিল। ওপারে কে একজন বলিল, রসিক আছে তো !

পেঁপেগাছ হইতে ঘেঁাৎনা এই তালে বলিতে যাইতেছিল, আমিও একজন আছি এখানে; কিন্তু অবিশ্বাসের বহর দেখিয়া আর বলা হইল না।

পাশের কিনারা হইতে উত্তর আসিল, ওই যে শুনেছে বরযাত্রীদের পাওয়া যাচ্ছে না—ওরে আমার চালাক রে !

তিনজন এই দিকেই অগ্রসর হইতেছিল; পায়ে মাটি ঠেকিল। রাজেন বলিল, না, দিব্যি ক'রে বলছি, আমারা বরযাত্রী, উঠলেই টের পাবেন। থু-থু, কি পানারে বাবা !

গণশা লম্বা ডুব দেওয়াতে অতিরিক্ত হাঁপাইতেছিল। রাজেন বলিল, রঘু বাগদী এদিকে নেই তো ?

আবার সেই উৎকট বক্রোক্তি, বটে, বটে, ওরে, রঘুকে ডাক্।

তিনজন আবার ঝপাঝপ করিয়া জলে পড়িল। তখন জগুদার কণ্ঠের আওয়াজ হইল, আচ্ছা, উঠে আয়, কিন্তু এক এক ক'রে। রঘু, তুই একটু ওদিকেই থাক্, তোয়ের থাকবি কিন্তু।

রাজেন প্রথমে উঠিল। হাত-পা এক রকম অবশ হইয়া গিয়াছে, সর্ব্বাঙ্গে পাঁক, পানা, কুটাকাঠি। ঠকঠক করিয়া কাঁপুনি। কোমরে জড়ানো র‍্যাপারের পরতে একটা বড় চাঁদামাছ লণ্ঠনের আলোয় চকচক করিতেছে। বুকটা হাপরের মত উঠানামা করিতেছে; কোন রকমে দুইটা কথা ধাক্কা দিয়া বাহির করিল, এই দেখুন।

পূর্ব্বপরিচিত সেই কালো লম্বা ছেলেটা বলিল, বাঃ, কি চমৎকার !

আর একজন বলিল, চোখ জুড়িয়ে গেল !

গোরাচাঁদ উঠিয়া আসিল। রাজেনেরই মত, অধিকন্তু কাপড়টা খুলিয়া গিয়াছে, নীচে আণ্ডারওয়ার। রাজেন হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, এ গোরা।

সেই ফাজিল ছেলেটা বস্ত্রের সংক্ষিপ্ততা লক্ষ্য করিয়া বলিল, হাইল্যাণ্ডের গোরা বলুন।

গণশা ফিরিয়াই আবার ডুব দেওয়ায় পিছনে পড়িয়া গিয়াছিল; অর্দ্ধমৃত অবস্থায় উঠিয়া আসিল। গোরাচাঁদেরই অনুরূপ, বাড়তির মধ্যে মাথায় একটা ছোট্ট কচুরিপানার চূড়া।

সেই ছেলেটা পিছন হইতে সম্ভ্রমের স্বরে বলিল, কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ।

উঠেছে, উঠেছে ওই দিকে।—শব্দ করিতে করিতে চারিদিকের লোক আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইল।

একজন বলিল, কি বলছে? এরাও বরযাত্রী? দড়ি নিয়ে এস।

অন্য একজন বলিল, বরযাত্রীরা নেই কিনা, ধরা প'ড়ে তাদের জায়গা দখল ক'রে নিচ্ছে।

সেই দুষ্টবুদ্ধি ছোকরাটা সামনে আসিয়া বলিল, আরে তাদের যে আমি ইষ্টিশানের দিকে যেতে দেখলাম। আর তাদের দেখলেই জগুদা তক্ষুনি চিনে ফেলত, না জগুদা?—বলিয়া একটি অর্থপূর্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল।

দেখতেও হ'ত না, গলা শুনেই চিনতাম।—বলিয়া একবার তাহার দিকে কেমন একভাবে চাহিয়া, হঠাৎ নিজের গলাটা পরিষ্কার করিবার দরকার পড়ায় জগুদা সরিয়া গেল।

কন্যাকর্ত্তা বৃদ্ধগোছের। ছেলেটার দিকে পিটপিট করিয়া চাহিয়া বলিলেন, তুই যেতে দেখলি তাদের? তা হবে; কয়েকজন চ'লে যাবে ব'লে তখন গোঁও ধরেছিল; আর তারা ছিল ছ-সাতজন।

গোরাচাঁদ বলিল, পাঁচজন ছিলাম।

জগুদা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আর তাদের মধ্যে একজন তোতলা ছিল, সবচেয়ে হারামজাদা।

গণশা তাড়াতাড়ি দম লইয়া বলিল, এই যে ম-মশাই আম্মো রয়েছি ; বে-বেজায়—

মা-স্মাইরি ! অমনই তো-তোতলা সেজে গেলে !

কন্যাকর্ত্তা বলিলেন, অত তোতলা তো ছিল না।

দুই-তিনজন ধূর্ত্তামি করিয়া বলিয়া গেল, একজন বোবা ছিল।

একজন খোনা ছিল।

একজন খোঁড়া ছিল।

তা এখনও হতে পারে।

কন্যাকর্ত্তা প্রশ্ন করিলেন, তা ওদিকে কি করছিলে সব ?

তিনজনে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। রাজেন গণশাকে একটু ঠেলিয়া বলিল, বল্ না রে।

গণশা মুখটা খিঁচাইয়া বিরক্তভাবে কহিল, আরে দুৎ, আমার কথা বে-বেশি আটকে যাচ্ছে, বি-বিশ্বাস করবে না।

গোরাচাঁদ কহিল, রাজেন বললে, দিব্যি খাওয়ালে ভদ্দরলোকেরা ; চল্, তিলোচন বোধ হয় এতক্ষণ বাসরে গান ধরেছে, বাড়ির পেছনে দিব্যি নিরিবিলিতে।

রাজেন যোগাইয়া দিল, পুকুরধারটিতে ব'সে একটু—

গণশা থাকিতে পারিল না, বলিল, আমি ব-বললাম, থাক্, দ-দরকার কি ? মে-মেয়েছেলেরা রয়েছেন—

গোরাচাঁদ গণশার দিকে একটা তির্য্যক দৃষ্টি হানিল ; একটু উপস্থিত-বুদ্ধি খরচ করিয়া বলিল, আমি বললাম, মেয়েছেলেরা গান ধরলেই উঠে পড়ব, তাঁরা তো আমাদেরই বোনের তুল্য।

রাজেন বলিল, মার পেটের বোনের—

কন্যাকর্ত্তা গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, সব ধাপ্পাবাজি ! মার পেটের বোনের ! কেউ গেল থানায় ? রঘু !

রঘু বাগদী পিছনেই দাঁড়াইয়া ছিল ; বলিল, এজ্ঞে, এই যে আছি

মুই। আপনাদের যেমন হয়েছে কর্ত্তা, ওইসব কথা পেত্তয় করেন! আয়েশ ক'রে গান শোনবার কি নন্দনকানন রে! সব একেলে শৌখিন ডাকাত, দেখছেন না?

রঘুর উপস্থিতিতে এবং কথাবার্ত্তায় সবাই আরও ঘাবড়াইয়া গেল। রাজেন বলিল, আচ্ছা, পুলিস ডাকবার আগে আমাদের কর্ত্তাদের কাছে নিয়ে চলুন না একবার, তাঁরা তো ভুল করবেন না।

গোরাচাঁদ বলিল, না হয় বরের কাছে।

কর্ত্তা শাসাইয়া উঠিলেন, খবরদার, বরের কাছে যেন না নিয়ে যাওয়া হয়।

পিছন হইতে একজন বৃদ্ধগোছের লোক বলিলেন, আর দেখ, বর-কনে যেন ঘর থেকে না বেরোয়; কোথায় কে আছ, কত রকম বিপদ হতে পারে, দুর্গা দুর্গা।

জগুদা বলিল, আচ্ছা, বরকর্ত্তার কাছেই নিয়ে চল সবাইকে। রঘু, পাশে পাশে থাকিস।

তিনজনেই নিজের নিজের মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া বলিল, তা হ'লে একখানা ক'রে শুকনো কাপড় আর জামা—

সমস্ত দলটাতে একটা চেঁচামেচি-গোছের পড়িয়া গেল।

মাইরি?

ওঁদের জামাই সাজিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

একটা চৌঘুড়ি নিয়ে এস।

যেমন ভাবে পুকুর থেকে উঠেছিল সেই রকম ভাবেই যেতে হবে; তাতেও যদি চেনে, তবেই—

সেই দুষ্টবুদ্ধি ছেলেটা বলিল, দময়ন্তী নলকে অমন অবস্থাতেও কি ক'রে চিনেছিলেন? বরং যে পানাগুলো খ'সে গেছে, আবার চাপিয়ে দাও।

অগত্যা সেই অবস্থাতেই অগ্রসর হইতে হইল। দলটা রঙ-বেরঙের মন্তব্য প্রকাশ করিতে করিতে আগে পিছে চলিল।

সদর-বাড়িতে মাঝখানের ঘরটিতে কর্ত্তা ও বরের মেসো এক জায়গায়

মড়ার মত পড়িয়া। এক কোণে পুরুতঠাকুর তাঁহার বধিরতার কল্যাণে গাঢ় নিদ্রায় অচৈতন্য। বাহিরের বারন্দায় দীনে নাপতে কাজকর্ম্ম সারিয়া কর্ত্তাদের বোতল-ঝাড়া একটু প্রসাদবিন্দু পাইয়াছিল, তাহাতেই তাহার ষোল আনা ফলপ্রাপ্তি হইয়াছে।

দলটা বারান্দায় আসিয়া উপস্থিত হইল। জগুদা 'বেয়াই-মশাই!' বলিয়া বরকর্ত্তাকে জাগাইতে যাইতেছিল, সেই ছেলেটা হঠাৎ সামনে আসিয়া বলিল, দাঁড়ান, ওরাই আগে দেখাক, কে বরের বাবা, কে বরের মামা, কে বরের বোনাই, কে বরের—

তিনজনে কটমট করিয়া তাহার পানে চাহিল। গোরাচাঁদ বলিল, কেন, ওই তো বরের বাপ।

গণশা টীকা করিল, ভ-ত্তবতারণবাবু।

ওই বরের মেসো অনন্তবাবু, ওই পুরুত-মশাই—কালা, রাতকানা। বাইরে দীনে নাপতে।

ছেলেটা দমিবার নয়, চোখ বড় বড় করিয়া বলিল, সব খোঁজ নিয়েছে রে!

একজন বলিল, বোধ হয় শিবপুর থেকে ধাওয়া করেছে।

অনেক ডাকাডাকি এবং ঠেলাঠেলির পর ভবতারণবাবু 'উ' করিয়া এক শব্দ করিলেন। দুই-তিনজন চীৎকার করিয়া প্রশ্ন করিল, দেখুন তো, এই কি আপনাদের বরযাত্রী?

অনেকবার প্রশ্ন করায়, অনেক কষ্টে কর্ত্তা রক্তাভ চক্ষু দুইটি চাড়া দিয়া অল্প একটু উন্মীলিত করিলেন; আরও অনেক চেষ্টার পর প্রশ্নটার একটু মর্ম্মগ্রহণ করিয়া অস্পষ্টস্বরে বলিলেন, কে বাবা, নন্দি-ভিরিঙ্গি, থিলোচনের বরযাত্র এশ্চো? এক শিলিম চড়াও তো বাবা।

তিনজনেই একরকম আর্ত্তস্বরেই চীৎকার করিয়া বলিল, জ্যাঠা-মশাই, আমরা গোরাচাঁদ, রাজেন, গণেশ—

গজানন, শিঃ তুই শেক্কালে বাপের বিয়ে দেখতেলি?—বলিয়া অবশ অঙ্গুলি দিয়া সবাইকে সরিয়া যাইতে ইশারা করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন। বৃথা পরিশ্রম ভাবিয়া তাঁহাকে আর কেহ জাগাইতে চাহিল না।

বরের মেসো অনন্তবাবুর একটুও সাড়া পাওয়া গেল না। গোরাচাঁদ নিরাশভাবে বলিল, হা ভগবান!

পুরোহিত মহাশয়কে তোলা হইল। কথাটা তাঁহাকে শুনাইতে এবং ভাল করিয়া বুঝাইতে সবিশেষ বেগ পাইতে হইল। তিনি বলিলেন, ডাকাতরা বলছে, বরযাত্রী? তা আমি তো রাত্রে দেখতে পাই না বাবা, প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত তাদের বসিয়ে রাখ না হয়।

গোরাচাঁদ অগ্রসর হইয়া পদধূলি লইয়া বলিল, ন্যায়রত্ন-মশাই, আমি গোরাচাঁদ।

গোরাচাঁদ, এস দাদা, আজকের দিনে আর কি আশীর্ব্বাদ করব? শীঘ্র একটি বিবাহ হোক, কন্দর্পকান্তি হও—

সেই সর্ব্বঘটের ছেলেটা একটু কাছে ঘেঁষিয়া চেঁচাইয়া বলিল, কন্দর্পকান্তি আশীর্ব্বাদের আগেই হয়ে ব'সে আছে।

পাশ থেকে কে একজন বলিল, মানস-সরোবরে চান ক'রে।

ন্যায়রত্ন মহাশয় ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, তা বইকি, তোমরা সুপুরুষ তো আছই; তা গোরা রে, এঁরা কি বলছেন ডাকাতরা নাকি বলছে, তারা বরযাত্রী? কি অনাসৃষ্টি! চিনে দাও তো দাদা।

রাজেন বলিল, এরা বলছে—এঁরা বলছেন বরযাত্ররা ডাকাত।

ন্যায়রত্ন মহাশয় একটু ধাঁধায় পড়িয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, ঠিক অর্থ গ্রহণ হচ্ছে না, ডাকাতরা বরযাত্রী, না বরযাত্রীরা ডাকাত?

দলের একজন ডান হাতটা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া বলিল, সামলাও ন্যায়ের ধাক্কা, এখন তৈলাধার পাত্র, না পাত্রাধার তৈল? ডাকাতরা বরযাত্রী, না বরযাত্রীরা ডাকাত?

গণশা মরিয়া হইয়া হাতজোড় করিয়া, ম-ম্মশাই, আমি পারলে সো-স্সোজা ক'রেই বলতাম, কি-কিন্তু সত্যিই তোতলা; দয়া ক'রে একবার বর তি-ত্তিলুর কাছে নিয়ে চলুন, তারপর পু-পুলিসে দিয়ে দেবেন না হয়। উঃ, শী-শ্‌শীতে কালিয়ে গেলাম।

বলা বাহুল্য, কথাবার্ত্তার ভঙ্গীতে অনেকের সন্দেহটা মিটিয়াই আসিতেছিল, বিশেষ করিয়া বয়স্কদের মধ্যে। তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন, তাই নিয়ে চল না হয়, রঘুকে এগিয়ে দাও।

কর্ত্তা বলিলেন, জগু, বাড়ির মেয়েদের তা হ'লে বলগে।

দলটি তিনজনকে ঘিরিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। ঠানদিদি আর মেয়েরা বরের চারিদিকে ব্যূহ সৃষ্টি করিয়া বাহির-হইতে-পাওয়া খবরের টুকরা-টাকরাগুলা লইয়া নিজের নিজের কল্পনাশক্তির পবিচর্চ্চা করিতেছিল। কর্ত্তা চেঁচাইয়া বলিলেন, একবার বরকে বাইরে পাঠিযে দাও।

ওমা, কি অমুঙ্গলে কথা, কি হবে! কোনমতেই না।—বলিয়া সবাই ব্যূহটা আরও সুদৃঢ করিয়া ঘেরিয়া ফেলিল। কন্যাকর্ত্তাকে নিজেকেই ভিতরে যাইতে হইল।

এমন সময় একটা কাণ্ড হইল। ঘোঁৎনা পুকুরের দিকটা খালি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খুব সন্তর্পণে পেঁপেগাছ হইতে নামিয়া চুপিসারে সদর-বাড়িতে দলটির পিছনে আসিয়া দাঁড়াইযা ছিল। সেখানকার কথাবার্ত্তায আত্মপ্রকাশের উৎসাহ না পাইয়া খুব সাবধানে বাড়ির মধ্যেও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। ত্রিলোচনের দ্বারা সনাক্ত হইবার সুযোগটা হারানো কোনমতেই সমীচীন হইবে না ভাবিয়া, কি হয়েছে র‍্যা গণশা? এত গোলমাল কিসের?—বলিতে বলিতে ভিড় ঠেলিয়া আসিয়া সামনে দাঁড়াইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে—অ্যাঁ, তোদের এ কি দশা?—বলিয়া হাত-চোখ-কাঁধের ভঙ্গীসহকারে একখানি নিখুঁত অভিনয় করিল।

তিনজনেই বলিয়া উঠিল, ঘোঁৎনা যে! কোথায় ছিলি? দেখ্ না, এ ভদ্দরলোকেরা কোনমতেই—

ঘোঁৎনা গাছের উপর হইতে পুকুরপাড়ের সব কথাই শুনিয়াছিল, বলিল, তোরা যখন আমার বারণ না শুনে পুকুরের দিকে গান শুনতে গেলি—

মুরুব্বিয়ানায় গোরাচাঁদের গা জ্বলিয়া উঠিল, গণশা বুঝিতে পারিয়া তাহাকে টিপিয়া থামাইল।

আমি ভাবলাম, দুত্তোর, একটু বেড়িয়ে আসা যাক। খানিকটা দূরে গেছি, এদিকে একটা সোরগোল। তাড়াতাড়ি ফিরলাম। একে অজানা জায়গা, তায় রাত্তির, খানিকটা এদিক, খানিকটা ওদিক ক'রে শেষে পথ ভুলে—

একটা পেঁপেগাছে উঠে পড়লাম।

সবাই এই শেষের বক্তা সেই ফাজিল ছোকরাটির পানে চাইল। তাহার ঠিক মোক্ষম জায়গাটিতে আসিয়া দাঁড়াইবার কেমন একটা গূঢ় শক্তি আছে, ইতিমধ্যে কখন ঘোৎনার পাশটিতে আসিয়া জুটিয়া গিয়াছে। সে নিজের টিপ্পনীর পর আর কিছু না বলিয়া ঘোঁৎনার চারিদিকের লোকদের সরাইয়া দিয়া ঘোঁৎনাকে একটু সামনে আগাইয়া দিল। সকলেই দেখিল, তাহার পিছনে, কোমরে জড়ানো র‍্যাপারের সঙ্গে বাঁধা দুইটা ডাঁটাসুদ্ধ পেঁপের পাতা, একটা শুকনো, একটা পাকা—মাঝারি সাইজের। গাছে থাকিতে কখন আটকাইয়া কাপড়ের সঙ্গে বাঁধা পড়িয়া গিয়াছে, ঘোঁৎনার সাড় হয় নাই।

দোসরা ধাপ্পাবাজ। লাগাও চাঁটি।—একটা গোলমাল উঠিতেছিল, এমন সময় শ্বশুরের সঙ্গে ত্রিলোচন আসিয়া রকে দাঁড়াইল।

সত্যিই যে তোরাই দেখছি! আমি বলি, বুঝি ডাকাতই পড়ল। তা জলে ঝাঁপ দেওয়ার কুবুদ্ধি হ'ল কেন? আর কে. গুপ্ত কোথায়? গোরা, তোর দাড়িতে কি ঝুলছে, মুখ তোল্ তো!

দাড়িতে বোধ হয় একটা পানার শিকড় ঝুলিতেছিল, কিন্তু মুখ তুলিবার তখন আর গোরাচাঁদের অবস্থা ছিল না—গোরাচাঁদেরও নয়, গণশারও নয়, রাজেনেরও নয়, ঘোঁৎনারও নয়।

সন্দেহ সম্পূর্ণ কাটিয়া যাওয়ামাত্র একটা রব পড়িয়া গেল—

ওরে, শুকনো কাপড় নিয়ে আয় তিনখানা।

কাপড়, জামা, র‍্যাপার—শিগগির।

চা করতে ব'লে দে, দেরি না হয়।

আহা, ভদ্দরলোকের ছেলে, বাসরঘর দেখবার ইচ্ছে হয়েছিল তো—

সেই ছেলেটা বলিল, কষ্ট ক'রে বললেই হ'ত জগুদাকে।

ওরে, নিয়ে এলি কাপড় ? দেরি কেন ?

কাপড আসিল দুই দিক হইতে। বাসরঘরের ভিতর হইতে লইয়া আসিল একটি কিশোরী। চারিখানি বেশ চওড়াপেড়ে শাড়ি, চারটি সায়া, চারটি ব্লাউজ। একটু মিষ্টি ধারালো হাসি হাসিয়া বলিল, বাসরঘরে ওঁদের চারজনকে ডাকছেন।

ননীচোরা

১

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সৃষ্টির পাট, একটু যদি নিশ্বাস ফেলিবার সময় থাকে; তাহার উপর ওই দজ্জাল ছেলে সামলানো। ভোরে উঠিয়া বাসী কাজ সারা, তাহার পর স্নান সারিয়া পূজার বাসন মাজা, পূজার ঘর নিকানো—এই দুই প্রস্থ হইয়া গিয়াছে, এখন তিন নম্বর আরম্ভ হইয়াছে এই রান্নাঘরে। স্বামীর নয়টায় গাড়ি, দেবরের দশটায় স্কুল। আমিষের ল্যাঠা চুকিলে শাশুড়ীর হবিষ্য রান্না। মাথার ঠিক থাকে না।

কাকা-ভাইপোতে দাপাদাপি করিতে করিতে ভিতরে ঢুকিল। কাকা কুঁজো হইয়া অত জোরে দৌড়াইয়াও ভাইপোকে কোনমতেই ছুঁইতে পারিল না; যদিও ভাইপো এরই মধ্যে তিন-তিন বার আছাড় খাইয়াছে এবং প্রচণ্ড হাসিতে তাহার নিজের গতিবেগটাও নিশ্চয় ব্যাহত হইয়াছে।

উঠানের মাঝখানে একলাফে পলাতকের সামনে আসিয়া দুই হাতের আড়াল দিয়া বলিল, কি দৌড়ুস রে খোকা! কিন্তু এইবার?

জেতার চেয়ে হারার এই নূতনতর কৌতুকে খোকার হাসিটা আরও প্রচণ্ড হইয়া উঠিল।

আবার কাল দু'পয়সা লেট-ফাইন হয়েছে, এই ছ'পয়সা হ'ল; দিও বউদি।

বউদির মস্তবড় মহাল রয়েছে, নিলেম ক'রে নিও।—বলিয়া হাসিয়া কড়ায় খুন্তির একটা ঘা দিয়া বধূ ফিরিয়া বসিল।

সে জানি না, দাদাকে ব'লো।—বলিয়া দেবর হাসিয়া চলিয়া গেল।

বধূর ননদের কথা মনে পড়ে। সে দেবরের চেয়েও বয়সে ছোট;

কিন্তু এই জায়গাটিতে ঠিক কুটুস করিয়া একটি কামড় দিয়া বসিত। আহা বেটাছেলে, বড্ড নিরীহ জাত!

মা, মুনা।—বলিয়া খোকা আসিয়া পিঠে ঝাঁপাইয়া পড়িল। ওই ওর রীতি।

সর্ খোকা, আমার এখন মরবার ফুরসৎ নেই, শুনলি তো কাকার তাগাদা?

উঁ, থুনলি।—বলিয়া খোকা আর অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া ঝাঁকড়া মাথাটা মার উরু আর বাহুর মাঝখান দিয়া বুকে গুঁজিয়া স্বকার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া গেল। মা একটু স্থির হইয়া দিল খানিকটা স্তন্য, তাহার পর তরকারি নামাইবার মত হওয়ায় খোকাব মাথাটা বাহির করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, হয়েছে, যা এবার; ক্রমাগত দামালপানা করবি, খিদে পাবে ছুটে আসবি, আমি কাঁহাতক ব'সে ব'সে তোকে মাই দিই খোকা? ছাড়, যাও তো সোনা আমার। যা, একজন এবার নাইতে যাবে, যা দিকিন, গামছা কাপড় দিগে।

ছেলে মার পিঠের উপর লতাইয়া বাঁ হাতে মুখটা ঘুরাইয়া নিজের মুখের অত্যন্ত কাছে টানিয়া লইয়া প্রশ্ন করিল, বাবা অঙ্গা অঙ্গা মা?

এত কাজের ভিড়েও অত কাছে রাঙা ঠোঁট দুইটি পাওয়া গেলে মুহূর্ত্তের জন্য সব ভুলাইয়া দেয়। একটা চুম্বন দিয়া মা বলিল, হ্যাঁ, গঙ্গা গঙ্গা করবে যাও।

তরকারি নামাইতে ঢালিতে, কড়া চাঁছিয়া আবার চড়াইতে একটু দেরি হইয়া যায়। কড়ায় তেল দিবার জন্য পিছন দিকে তেলের বাটি লইতে গিয়া দেখিল, সেটা ছেলের দখলে; হাত দুইটি তেলে চোবানো, পেটটি তেলে চকচক করিতেছে, নীচে একরাশ তেলের ছড়াছড়ি। মার পানে চাহিয়া সংক্ষেপে বলিল, অঙ্গা অঙ্গা।

রোষে বিরক্তিতে প্রায় কাঁদ-কাঁদ হইয়া মা বলিল, ও মা গো! এ কি করেছিস খোকা? না বাপু, আমি আর পারি না এই হতভাগা ছেলেকে নিয়ে, কোন্ দিক সামলাই বল তো?

চড় উঁচাইয়া ধমকাইয়া বলিল, দোষ ওই ওরই ওপর তু ঘা কষিয়ে, ভিরকুটি ঘুচিয়ে ?

খোকা তৈলাক্ত হাত তুইটি পেটের উপর জড়সড় করিয়া অপ্রতিভ-ভাবে মার কড়া চোখের উপর চোখ তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মনে হইয়াছিল, সে একটা মস্ত শ্লাঘনীয় কার্য্য করিতেছে, মা দেখিয়া তাহার বাহাতুরিতে একেবারে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যাইবে, এ ধরনের সম্ভাষণ মোটেই আশঙ্কা করে নাই। একবার উঠানের দিকে চাহিয়া দেখিল, লাঞ্ছনাটা আর কাহারও নজরে পড়িল কি না! তাহার পর মার দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহার ঠোঁটটা একটু উলটাইয়া গেল। একবার তুই গালের একটা শিরা একটু কুঁচকাইয়া সামলাইয়া গেল; ভ্রূজোড়াটি তুই-তিন বার স্পন্দিত হইয়া উঠিল।

এসব রঙবেরঙের বিত্যুৎস্ফুরণ বর্ষণের পূর্ব্বলক্ষণ, মার জানা আছে। খোকার চোখের জল, সেটা দেখিতেও কষ্ট, সামলাইতেও কষ্ট, তাহা ছাড়া শাশুড়ীর গঞ্জনা, সে তো আছেই। মা হঠাৎ মুখের ভাব বদলাইয়া ফেলিয়া বলিল, ওরে খোকন, না না, তোকে বলি নি; তোমায় কি বলতে পারি বাবা! আমি যে তেলকে বলছিলাম, হতভাগা তেল, আমার যাতুর পেটে উঠে কি করেছিস বল্ তো ?—ওরে খোকা, কি চমৎকার পাখি দেখ্, তুই নিবি ? ও মা!

খোকা টালটা সামলাইয়া লইয়াছে, অর্থাৎ চোখের জল ছলছল করিতেছে বটে, কিন্তু উছলিয়া পড়িতে পায় নাই। মার পাশে ঠেস দিয়া ধরা গলায় বলিল, আঙা পাখি।

শাস্তিদূতের মত সামনের নিমগাছটায় একটা পাখি এইমাত্র আসিয়া বসিয়াছে। রঙটা রাঙা মোটেই নয়; খানিকটা মিশ-কালো, খানিকটা বাসন্তী-হলদে। তুই-এক বার গলা তুলাইয়া একটা হ্রস্ব তরল আওয়াজ করিল।

বর্ণজ্ঞান সম্বন্ধে ছেলেকে মর্য্যাদা দিয়া মা বলিল, হ্যাঁ, আঙা পাখি; নিবি খোকা ? তা হ'লে যা তোর কাকার কাছে, যা দিকিন। আয়, তেলটা একটু চারিয়ে দিই। হয়েছে, এইবার যাও।

খোকা অত্যন্ত ভাল ছেলে হইয়া গিয়াছে। একটু কুঁজো হইয়া, ছড়ানো বাসন-পত্র বাটনা-কুটনার মধ্যে খুব সন্তর্পণে পা ফেলিয়া চলিয়াছে, যেন কত বয়স, কত সাবধানী, লোকসানের কত ভয়! তাহার হঠাৎ ভাব-পরিবর্ত্তন দেখিয়া মা মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। কয়েক পা গেলে বলিল, ওরে খোকা, চুমো দিয়ে গেলি নি? মা যে ম'রে যাবে তা হ'লে।

খোকা ফিরিয়া আসিল, চুমা খাওয়া হইল, আবার বুড়ার চালে গন্তব্য পথে চলিল। মা একবার দেখিয়া লইয়া ঘুরিয়া বসিল, কড়ায় তেল দিতে দিতে বলিল, যাও কাকাকে বলগে। বল, কাকা, রাঙা পাখিটা—

পাখিটা মাঝখানের শব্দটায় একটা দীর্ঘ টান দিয়া আওয়াজ করিয়া উঠিল, গেরস্তর খোক্কা হোক।

কি বলে পাখি সেই জানে; কিন্তু এই সূত্রে মানুষের সঙ্গে তাহার একটা গাঢ় আত্মীয়তা আছে। ঘরে ঘরে তাহার সঙ্গে উত্তর-প্রত্যুত্তর, কথা-কাটাকাটি চলে। বধূ তপ্ত তৈলে একটা লঙ্কা ছিঁড়িয়া দিয়া বলিল, আর খোকার প্রার্থনায় কাজ নেই বাপু, ঢের হয়েছে; একটি সামলাতেই মানুষের প্রাণান্ত—

ওমা! অমন কথা ব'লো না, বউমা; ওই একটিতে ঢের হয়েছে? পাখির মুখে ফুলচন্দন পড়ুক, কোলে-পিঠে জায়গা না থাক্, ঘর আমার ভ'রে উঠুক দিন দিন।

শাশুড়ী যে ইহার মধ্যে কখন গঙ্গাস্নান সারিয়া পূজার ঘরের রকে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, বধূ সেটা কাজের ভিড়ে, বিশেষ করিয়া ছেলের দৌরাত্ম্যে জানিতে পারে নাই। হাতে গঙ্গাজলের ঘটি, পরনে গরদ। বধূ একটু লজ্জিতা হইয়া পড়িল; একটু থামিয়া বলিল, দেখ না এসে কাণ্ডটা মা, এক বাটি তেল ফেলে নৈরেকার করেছে। অপরাধের মধ্যে বলেছিলাম, নাইতে যাচ্ছে—

স্বামীর প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ায় আবার লজ্জিতা হইয়া থামিয়া গেল।

ফেলুক, দৌরাত্মির বয়েস এখন, সইতে হবে। ধীরে থির থাকলে

আলো ঠিকরোয় না বচারটে মাস উমা, ছিল না, বাড়ি যেন—ও বউমা, শিগগির দৌড়োও, খেলে আমার মাথা।

খোকা ঠাকুরমার গলা শুনিয়া পাখির কথা ভুলিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে; বধূর প্রতি উপদেশ শেষ করিবার পূর্ব্বেই দুলিতে দুলিতে তাঁহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিবার উপক্রম করিল। তাড়াতাড়ি হাত তুলিয়া কয়েক পা পিছাইয়া গিয়া বিপর্য্যস্তভাবে তিনি বলিতে লাগিলেন, স'রে যাও দাদু, আমায় ছুঁয়ো না—কি গেরো! ও বউমা, ওরে, তোর গায়ে রাজ্যির অনাচার দাদা, আমায় ছুঁস নি, দোহাই তোর—ও বউমা, তুমি বুঝি তামাশা দেখছ? অ দাদু, লক্ষ্মী আমার, সোনা আমার—

বউমা লজ্জার ঝাঁজের অছিলায় মুখে কাপড় দিয়া তামাশাই দেখিতেছিল। খোকা মস্ত একটা কৌতুক পাইয়া গিয়াছে; যতই না এড়াইবার চেষ্টা, সে ততই দুই হাত তুলিয়া ঠাকুরমাকে ছুঁইবার জন্য ছুটিয়াছে; হাসির চোটে সারা মুখটা সিন্দুরবর্ণ। ষাট বছরের বৃদ্ধা, নাতির সমবয়সী হইয়া সমস্ত রকটা ছুটাছুটি করিতেছেন আর চেঁচাইতেছেন, অ দাদু, খাস নি মাথা আমার, আবার নাওয়াস নি বুড়ীকে—ও বউমা, শিগগির এস বাছা সব ছেড়ে—

বউমা গরম তেলে তরকারি ছাড়িয়া তাড়াতাড়ির ভান করিয়া ধীরেসুস্থে হাত দুইটা ধুইয়া উঠিল। শাশুড়ী বুঝুন, উপদেশ দিলেই হয় না। ঠোঁটে কোথায় যেন একটু হাসি লাগিয়া আছে, পা চালাইয়া আসিয়া খোকাকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, এই রকম দাপাদাপি দিয়ে ঘর ভ'রে উঠলেই তো—

কথাটা শেষ করিবার পূর্ব্বেই দুষ্টামির হাসি সজোরেই প্রকাশ হইয়া পড়িল। ঢাকা দিবার জন্য খোকাকে বলিল, ঠাকুরমাকে ছুঁতে নেই এখন।

খোকা মার মুখের কাছে মুখ আনিয়া, ঘৃণায় নাকটা একটু কুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিল, ঠাম্মা, অ্যা ছিঃ, মা?

ঠাকুরমা হাসিয়া রাগিয়া বলিলেন, হাঁা, ঠাম্মা হ'ল অ্যা ছিঃ, আর তুমি ভারি পবিত্তির, নবদ্বীপের পণ্ডিত। আমার রীতিমত হাঁপ ধরিয়ে

দিয়েছে গো। কুশাসনটা বার ক'রে দাও তো মা, একটু ব'সে জিরিয়ে নিই, আর পেরেক থেকে মালাটাও নামিয়ে দিও। ওইঃ, একা হন না, আবার জুড়িদার এল। সর সর, পড়ল বুঝি ঘাড়ে।

২

বাঁ করিয়া ছোট একটি আওয়াজ করিয়া তিন-চারি দিবসের একটি বাছুর সদর-দরজায় প্রবেশ করিল, এবং সমস্ত উঠানটা দুড়দুড় করিয়া ছুটিয়া সামনে আসিয়া হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িল। খোকা উল্লসিত আবেগে 'গোউ গোউ' বলিয়া করতালি দিয়া উঠিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে হাত পা সোজা করিয়া দিয়া মার কোল হইতে নামিয়া ছুটিল।

ঠাকুরমা কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া বলিলেন, ঘাড়ে-টাড়ে পড়বে না তো বাপু? দেখো।

না, ও নিজেই বাঁচিয়ে পালায়। যাই, বাবাঃ!—বলিয়া একটা নিশ্চিন্ততার নিশ্বাস ফেলিয়া বধূ হেঁসেলে চলিয়া গেল।

একটার পর একটা চলিতেছেই, শ্রান্তি নাই, বিরামও নাই। এবার বাছুরের সঙ্গে চলিল। হাতে একটা ছোট শুষ্ক আমের ডাল তুলিয়া লইয়াছে, বাছুরটাকে ছোঁয় ছোঁয়, সে উঠানময় দুই-একটা চক্র দিয়া আবার দূরে দাঁড়াইয়া পড়ে। খোকা হাসিয়া লুটাইয়া যায়, উঠে, আবার ছুটে। সর্ব্বাঙ্গ ধূলায় ধূসরিত; কপাল, বক্ষ আর কাঁধের ধূলা ঘামের সঙ্গে কাদা হইয়া কণায় কণায় জমিয়া উঠিয়াছে, হাসির চোটে মুখে লালা উঠিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে, গলার হারটা কখনও বুকে, কখনও পিঠে। মাথার ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুলগুলার দুর্দ্দশার আর পরিসীমা নাই।

দেখাও যায় না, অথচ এই অশেষবিধ বিশৃঙ্খলতার মধ্যে খোকা যে কেমন ভাবে কি সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে, তাহা হইতে চোখ ফিরাইয়া রাখাও যায় না।

মা আড়চোখে দেখে, হাসে। তরকারি নাড়িতে গিয়া খুন্তিটা এক-এক বার কড়ার বাহিরে শূন্যে ওলট-পালট খায়।

ঠাকুরমার মালা অস্বাভাবিক দ্রুতবেগে ঘুরিতেছে, জপের সঙ্গে যে তাহার একটা যোগ আছে, তাহা বোধ হয় না ; কেন না, হিসাব রাখার মালিক যে মন সে উঠানে। খোকা সেখানে তাহাকে ধূলার মধ্যে, তাহার অকাজের মধ্যে, তাহার বিসদৃশ সাথীর মধ্যে, এক কথায় তাহার শত রকম বেহিসাবের মধ্যে টানিয়া লইয়াছে।

এ মোহ, এরূপ ভ্রান্তি হইবারই কথা। এই পরিবারের গৃহদেবতা গোপাল। ভগবান এখানে সম্ভ্রমের অধিকারী নন, স্নেহের ভিখারী। তিনি বিরাট নন ; তিনি অপ্রমেয় অজ্ঞেয় নন ; তিনি নন্দের দুলাল, যশোদার নয়নমণি, তাঁহার সম্বন্ধে ওসব কথা আর আসে কোথা হইতে। তিনি প্রতিদিনের, প্রতিক্ষণের সংসারের হাসি-অশ্রু দিয়া গড়া। যশোদা তাঁহাকে তাড়নাও করে, আবার নধর অধরে ক্ষীর, সর ননী দেয়, চাঁদমুখ মুছাইয়া ললাটে তিলক আঁকে, মাথায় শিখিপাখা, শ্যামদেহে পীতধড়া, হাতে পাচনি দিয়া ধেনুদলের সঙ্গে গোচারণে পাঠাইয়া দেয়। গোপাল যখন যায়, যতক্ষণ দেখা যায়, মায়ের চির-অতৃপ্ত নয়ন লইয়া চাহিয়া থাকে ; আবার সন্ধ্যায় গোধূলিক্ষণে আসিয়া দুয়ারে দাঁড়ায়, এখনই গোপাল মলিন মুখে মলিন বেশে আসিয়া মায়ের বক্ষলগ্ন হইবে।

সে সুদূর নয়, শিশুরা তাহাকে সবার ঘরে ঘরে আনিয়া দেয়, নিয়তই। খোকার মুখে কি তাহারই ছায়া পড়িয়াছে ? ধূলি-পাটল পেলব অঙ্গে কি তাহারই বর্ণাভাস ? কচি পায়ের চঞ্চলতায় কি তাহারই নৃত্যবিলাস ?

ঠাকুরমার মুখে স্নিগ্ধ হাসি, চোখে অশ্রু। ঝাপসা দৃষ্টিতে মুহূর্ত্তের জন্য এক-একবার মনে হয়, যেন গোপাল নিজেই,—ছায়া নয়, আভাস নয়। শ্যামদেহ ঘিরিয়া পীতবাস, মাথায় মোহনচূড়া বিস্রস্ত, হাতে পাচনবাড়ি, কপালের চন্দন কাদার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। ঠাকুরমার অঙ্গ আলোড়িত করিয়া যশোদার স্নেহ নামে ; আহা, অসহায় শিশু, খেলায় অসহায়, শ্রান্তিতে অসহায় ; কি যে করে, কি না করে, নিজেই জানে না। ও আবার দেবতা কবে হইল ?

যশোদা ঘরে ঘরে নিজের শিশুকে বিলাইয়া, মায়ের ব্যাকুলতা লইয়া

সবার বুকে আসিয়া উঠিয়াছে। ঠাকুরমা বলে, ওরে অ খোকা, ঘেমে নেয়ে গেলি যে! দেখ তো ছিষ্টিছাড়া খেলা ছেলের!

ওদিকে ধবলী 'স্বা' করিয়া আওয়াজ করে; চারিদিকে বিপদ-আপদ ঢের, অবুঝ বৎস, সে চোখের আড়ালে কেন যে যায়!

কিন্তু খেলা তবুও চলিতে থাকে।

অবশেষে বোধ হয় শ্রান্তি একটু আসিল। খোকা অবশ্য বাহ্যত সেটা স্বীকার করিল না। উঠানে বসিয়া হাসিতে হাসিতে ঘাড় এলাইয়া একবার মার দিকে চাহিল, একবার ঠাকুরমার দিকে চাহিল। হঠাৎ তাহার একটা কথা মনে হইল, খুব সহজ ব্যাপার, অথচ খুব মজা হয় তাহা হইলে। রকের উপর উঠিয়া গিয়া, আমের ডালটা দুই হাতে পিছনে ধরিয়া, ঘাড় দুলাইয়া প্রশ্ন করিল, ঠাম্মা খেব্বি?

ঠাকুরমা হাসিয়া উদ্বেলিত অশ্রু মোচন করিয়া বলিল, হ্যাঁ ভাই, খেলব, ডেকে নে, অনেক হয়েছে।

দেরি হইয়া যাইতেছে, উঠিয়া সজল নয়নে পূজার ঘরে প্রবেশ করিলেন।

সেদিন এই পরিবারের ক্ষুদ্র ইতিহাসে এক পরমাশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল।

ঠিক পূজা সেদিন হইল না, যেন একটি দুরন্ত উচ্ছৃঙ্খল শিশুর পরিচর্য্যায় কাটিয়া গেল, তাহার চঞ্চলতা আর প্রতিকূলতার জন্য পদে পদেই বাধা। বৃদ্ধা গোপালের সাজগোজ একটি একটি করিয়া খুলিয়া ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া আবার অতি সন্তর্পণে, প্রাণের দরদ দিয়া পরাইয়া দিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মৃদুস্বরে নানা রকম আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ—এইবার এই রকম ক'রে দাঁড়াও তো ঠাকুর, পীতধড়াটা এঁটে দিই। এই বাঁশী ধর। কতদিন থেকে ইচ্ছে, একটি সোনার বাঁশী গড়িয়ে দিই; সে সাধ আর গোপাল মেটাবে না? আর কবেই যে মেটাবে?

যেন প্রত্যক্ষ গোপালের সামনে কথাটা বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে। সারাদেহে ধূলি, বদনে স্বেদবিন্দু কল্পনা করিয়া বস্ত্রাঞ্চল দিয়া মুছাইয়া দেন। মুখে অনুযোগ, জগতের ভাবনা ভেবেই তুমি সারা হ'লে, নিজের দিকে আর দেখবে কখন?

হিন্দুর মন, পুতুল খেলার পাশে পাশে গীতার ধ্বনি উঠে। অলকা-তিলকা দিয়া শৃঙ্গার শেষ হয়। তখন আবার নিজের প্রগল্‌ভতায় হাসি পায়। হে ঠাকুর, আমার অহমিকা নিয়ে তোমার এ খেলার মর্ম্ম তুমিই বোঝ। আমি আবার তোমায় সাজাব, মোছাব! যেমন তোমার যশোদার ছেলে হওয়া, তেমনই আমার সেবা নেওয়া; তোমার লীলার অন্ত আমি আর কি পাব ঠাকুর?

শৃঙ্গারের সময় দেবতা বিগ্রহের মূর্ত্তিতে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন; কিন্তু পূজার সময় তাঁহাকে পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিল। আজ খোকার খেলার পথে আসিয়া তিনি যেন অতিমাত্র চঞ্চল। চিত্তের সমস্ত ব্যাকুলতা দিয়াও তাঁহাকে পূজার আসনে ধরিয়া রাখা যায় না। আজ তিনি ধ্যানাতীত। কখনও বায়ুর মত স্পর্শের অগোচর, সমস্ত ইন্দ্রিয় ব্যাপ্ত করিয়া আছেন, অথচ আকারে ধরা যায় না। কখনও তিনি নাই, একেবারেই বিলুপ্ত, শুধু শিশুতে শিশুতে সমস্ত বিশ্ব একাকার হইয়া যায়। মায়ের নত দৃষ্টির নীচে শিশুর হাসি, ছায়াশ্যাম বৃক্ষতলে খেলায় মত্ত শিশুর দল,—কোথাও দরিদ্রপল্লীতে জীর্ণ গৃহ, অবসরহীন জননী, উঠানে ছিন্নবাস-পরা শিশু-ভগ্নীর কোলে রুগ্ন শিশু, অশ্রুভরা নিষ্প্রভ তাহার চোখ, কোথাও শিশুর দুর্জ্জয় অভিমান, চাপা ঠোঁট, শান্ত গম্ভীর ভাব, মা খাবার খেলনা রাজ্যের যত জিনিস একত্র করিয়াও মন পায় না, এক-এক সময় সব মুছিয়া এক অপূর্ব্ব দৃশ্য ভাসিয়া উঠে, নবদূর্ব্বাদলশ্যাম নবনীতদেহ এক শিশু, মাথায় চিক্কণ কেশের চূড়া বায়ুভরে দোদুল, পীতবাস-পরা বঙ্কিম কটি, যমুনাকূলের বেণুবন তাহার চঞ্চল নৃত্যপর রাঙা চরণের ঘায়ে তৃণগুচ্ছে রোমাঞ্চিত, কখনও সে ধেনুর গায়ে লুটাইয়া পড়ে, কখনও নাচিতে নাচিতে বংশীধ্বনি করে, তাহার বাঁশীর স্বরে আকাশ বাতাস ভরিয়া যায়, বনপ্রান্তর পুষ্পে পুষ্পে মুঞ্জরিত হইয়া উঠে, যমুনার কালো জলে ঢেউয়ে ঢেউয়ে আলোর খেলা চলে।

দৃশ্যপট পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। যশোদার গৃহ, ঘরের মেঝের ভাঙা ননীর পাত্র। গোপালের মুখে হাতে যেখানে সেখানে চুরি-করা ননীর পোঁচ, শ্যাম ননীর দেহখানি স্নিগ্ধ সাদা ছোপে ছোপে অপরূপ হইয়া

উঠিয়াছে। রাণী আর পারে না, নিত্যই এই চৌর্য্যবৃত্তি, এই অপচয়; শাসন মানে না, এমন বিড়ম্বনার শিশুকে লইয়া করা যায় কি? তোকে এবারে না বাঁধলে চলছে না গোপাল, র'স্ তুই, দড়ি নিয়ে আসি। গোপালের কাতর দৃষ্টি, অনুনয় করিতে করিতে ক্ষুদ্র দেহখানি ত্রিভঙ্গ হইয়া বাঁকিয়া গিয়াছে, মা গো, আর হবে না, এই শেষ; তোর বাঁধন যে বড় কঠিন হয় মা।

আহা, শিশুর অদম্য লোভ, কিই বা করে সে?

পূজার সম্ভার পড়িয়া থাকে, মন্ত্র অনুচ্চারিত। মুদিত চোখের পক্ষ্ম ভিজাইয়া শুধু অশ্রুর ধারা গড়াইয়া পড়ে। হে শ্যামসুন্দর, এস, তোমার শিশু-মনের সমস্ত লোভ, তোমার সেই পরম করুণা নিয়ে এস। এখানে তোমার পায়ে সমস্ত উজাড় ক'রে দোব ব'লে ব'সে আছি, অথচ তুমি বিমুখ; হোথায় যশোদার কি পুণ্যবলে তার সমস্ত লাঞ্ছনা অঙ্গের ভূষণ ব'লে মেনে নিচ্ছ ঠাকুর?

অনেকক্ষণ এই রকম যেন একটা স্বপ্নের ঘোরে মনটা আচ্ছন্ন থাকে, হঠাৎ ছেলের বকাবকিতে চৈতন্য হয়—আবার আজ ভাতের দেরি ক'রে ফেললে? না, চাকরিটা না খেয়ে আর—

বধূর চাপা গলায় উত্তর, কি করব, যা দজ্জাল ছেলে হয়েছে! একটিবার যে কাছে ডেকে উবগার করবে—

ও! মনিব-ঠাকরুণের ছেলে না আগলালে বুঝি একমুঠো ভাত—

আরও চাপা গলায় প্রত্যুত্তর হয়, আঃ, চুপ কর, পূজোর ঘরে মা।

আবিষ্ট ভাবটা কাটিলে বৃদ্ধা নিজের মনেই বলিলেন, আজ তুমি তো ঠিক ধ্যানের রূপে দেখা দিলে না ঠাকুর, কেন, তা তুমিই জান।

পুষ্পরাশি চন্দনে মাখাইয়া বেদীতে নিক্ষেপ করিলেন; তাহার পর কুশিতে জল লইয়া নৈবেদ্য নিবেদন করিতে যাইতেই 'এ কি হ'ল!' বলিয়া যেন চিত্রার্পিতের মত কয়েক মুহূর্ত্ত নিশ্চল হইয়া গেলেন।

চোখের জলে এখনও দৃষ্টিটা একটু ঝাপসা রহিয়াছে, অঞ্চল দিয়া মুছিলেন। না, ঠিকই তো, রেকাবির মাঝখানের নৈবেদ্যের চূড়ার উপর বড় যে ক্ষীরের নাড়ুটি—সবচেয়ে যেটি বড়—সেইটি নাই! এইমাত্র

নিজের হাতের রচনা করা নৈবেদ্য, ওই নাড়ুটি একবার পড়িয়া গিয়াছিল, ভাল করিয়া বসাইয়া দেওয়া হয়, ভুলের তো কোন সম্ভাবনাই নাই!

তবুও নিজের অদৃষ্টকে বিশ্বাস হয় না, আবার ভাল করিয়া চোখ মুছিতে যান। কম্পিত হস্তে চোখে অঞ্চল দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু এক অননুভূতপূর্ব্ব ভাবের উচ্ছ্বাসে অভিভূত করিয়া ফেলে। শরীর কণ্টকিত, মনে হয়, যেন ঢেউয়ের পর ঢেউ ভাঙিয়া সমস্ত শরীরের বন্ধন শিথিল করিয়া দিতেছে। চক্ষের জল মুছিবে কে? কূল ছাপাইয়া বন্যা নামিয়াছে।

মুখে একটি মাত্র কথা, আনন্দ ব্যাকুল একটি মাত্র বিস্মিত প্রশ্ন, হে ঠাকুর, এ কি দেখালে?

৩

যখন বাহির হইয়া আসিলেন, চোখের পল্লব সিক্ত, মুখে একটি শান্ত জ্যোতি। বধূর বড় আশ্চর্য্য বোধ হইল, একটু ঘুরাইয়া প্রশ্ন করিল, মা, আজ তোমার এত দেরি হ'ল?

বউমা, একবার পূজোর ঘরে এস।

ঘরের দুয়ারের কাছে আসিয়া ঘুরিয়া বলিলেন, রান্নাঘরের কাপড়টা ছেড়ে এস বউমা।

বধূ কাপড় ছাড়িয়া আসিলে ভিতরে গিয়া বলিলেন, এই দেখ বউমা, আমি নিজের হাতে বড় নাড়ুটি মাঝখানে বসিয়েছিলাম, চোখ মেলে দেখি, নেই।

শাশুড়ীর মুখের আলো যেন বধূর মুখমণ্ডলে প্রতিভাসিত হইয়া উঠিল, সে চোখ দুইটি বিস্ফারিত করিয়া নির্ব্বাক বিস্ময়ে দাঁড়াইয়া রহিল। পুরুষানুক্রমে বৈষ্ণব, এ বাড়ির মাটির প্রতি কণাটি পর্য্যন্ত রাধাকৃষ্ণের রসে সিক্ত, বিশ্বাস এদের কোনখানে কখনও বাধা পায় না। গোপালের এ গৃহে পদার্পণই অলৌকিকত্বের মধ্য দিয়া। তাহার পর এই পরিবারের সঙ্গে তাহার লীলার লুকাচুরি চলিয়া আসিতেছে, বিশেষ করিয়া

পূর্ব্বজদের আমলে। তাহার মধ্যে কত ঘটনা ভ্রান্তি বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, কত আজ পর্য্যন্ত সংশয়ের আলো-ছায়ায় দুলিতেছে, কত বা একেবারেই নিসংশয়িত ধ্রুব সত্য—জীবনের চেয়েও সত্য, গোপালের বিগ্রহের মতই সত্য।

শাশুড়ী বলিলেন, এ সেই যাঁর নাম করতে পারি না, গোঁসাইয়ের বংশ বউমা, এ রকম ব্যাপার তো এ বাড়িতে নূতন নয়; তবে আজকাল আর আমাদের পুণ্যির জোর নেই এই যা। পূজো সেরে শ্বশুর ভাগবত পড়তেন, খুব তন্ময় হয়ে পড়তেন কিনা, তেমনই সুকণ্ঠও ছিল, একটি বছব তিনেকের শ্যামবর্ণ ছোট ছেলে এসে বসল, একখানি হলদে রঙে ছাপানো কাপড়, কোমর থেকে খ'সে গেছে, জড়িয়ে সড়িয়ে কাঁধে পুঁটুলি ক'রে নিয়েছে। বসল তো বসল, শ্বশুর একবার দেখে আবার নিজের মনেই প'ড়ে যেতে লাগলেন। অনেকক্ষণ পরে আর একবার একটু অন্যমনস্ক হতে গিয়ে ছেলেটির ওপর একটু নজর পড়ল, ঠায়, একভাবে ব'সে আছে। পাঠ শেষ করতে অনেকক্ষণ গেল। বই মুড়ে চোখ তুলে দেখলেন, ছেলেটি নেই, কখন উঠে গেছে। আহা, ছোট্ট ছেলেটি, হুড়োহুড়ি ক'বে ক্লান্ত হয়ে ব'সে ছিল, একটু নৈবিদ্যি হাতে দিই। এই ভেবে তিনি রেকাবি থেকে ক্ষীরের নাড়ুতে ফলেতে মুঠোটি ভ'রে বাইরে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁগা, যে ছোট ছেলেটি আমার ঘরে গিয়ে এতক্ষণ ব'সে ছিল, কোথায় গেল, দেখেছ?

সকলেই বলিল, কই না, দেখি নি তো।

শ্বশুর বললেন, সে কি! এই যে এতক্ষণ ব'সে ছিল আমার কাছে—ন্যাংটো, কাঁধে একখানা হলদে কাপড়, ভাসা ভাসা ডাগর চোখ দুটি!

শাশুড়ী একটু খিটখিটে ছিলেন, ধমক দিয়ে বললেন, জ্বালিও না বাপু; একবাড়ি লোক গিজগিজ করছে, ছোট ছেলে একটা এল, রইল, বেরিয়ে গেল, কাকে কোকিলে জানতে পারলে না! বউমা, ওঁর মিছরির পানাটা নিয়ে এস; রাত্তির বেলা করবেন, না নিজের মাথার ঠিক থাকবে, না অন্যের মাথা ঠিক থাকতে দেবেন।

কে আর মিছরির পানা খাবে? সেই নৈবিদ্যির ফল নাড়ু হাতে

ক'রে সমস্ত পাড়ার বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ালেন, হ্যাঁগা, এ রকম একটি ছেলে, হলদে কাপড় কাঁধে, তোমাদের বাড়ির ছেলে কি? দেখেছ কি? কিন্তু কে দেখবে? সে কি কারুর বাড়ির ছেলে যে, লোকে দেখবে তাকে?

শাশুড়ী একটু থামিলেন। দুইজনের চোখই জলে ভাসিয়া যাইতেছে। আবার বলিতে লাগিলেন, তখন এসে, সেই হাতের নৈবিদ্যি হাতে ক'রে পূজোর ঘরে ঢুকে আসনে শুয়ে পড়লেন। সমস্ত দিন গেল, সমস্ত রাত গেল, আহার নেই, নিদ্রে নেই। শেষরাত্রে একটু তন্দ্রা এসে স্বপ্ন হ'ল, পাড়ায় পাড়ায় ঘুরলেই কি আমায় পাবি? ওঠ্, তোর নৈবিদ্যি খেয়েছি, ক্ষীরের এক পাশে আমার দাঁতের চিহ্ন দেখতে পাবি। খা, আমার কষ্ট হচ্ছে, উপোসী ক'রে রেখেছিস।

অশ্রু মুছিতে মুছিতে দুইজনে বাহিরের রকে আসিয়া বসিলেন। এই ধরনের গল্প চলিতে লাগিল। তাহার সঙ্গে গীতা ও ভাগবতের তত্ত্ব-কথা, ভক্তের জন্য তিনি কি ভাবে কত লীলারূপ ধরেন, নিজের মুখে কোথায় কি আশার কথা কবে বলিয়াছেন, সেই সব।

গল্পের মধ্যে শাশুড়ী বলিলেন, এসব কথা কিন্তু কাউকে আর এখন জানিয়ে কাজ নেই বউমা; অবিশ্বাসীর কানে গেলে তিনি কষ্ট পান, কতবার স্বপ্নে বলেছেন, আমার লাঞ্ছনা হয় ওতে।

উঠানের ওদিকে সদর-দরজায় খোকার আবির্ভাব, কে কাপড় পরাইয়া দিয়াছিল, শুধু কোমরের গেরোটি লাগিয়া আছে; বাঁ হাতে কাপড়ের গাড় বাঁধা একটা ভাঙা কলাই-করা সানকি ডান হাতে সেই চিরন্তন লাঠি; সানকির উপর এক ঘা বসাইয়া মার দিকে চাহিয়া বলিল, গোউ—ছোনা।

মা হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ, নির্ব্বিবাদে মার খাচ্ছে কিনা, সোনা তো হবেই।

খোকা হঠাৎ শান্ত গরু আর শান্ত করা লাঠি ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া মার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং তাহার রেওয়াজ মাফিক বস্ত্রাঞ্চলের মধ্যে মাথাটা গুঁজিয়া দিল। ঠাকুরমা তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া প্রশ্ন

করিলেন, কোথায় গিয়েছিলি ভাই? আজ তোর সাথী তোর সঙ্গে খেলবার জন্যে যে—

খোকার পাঁচ-সাত টানের বেশি গ্রহণ করিবার কোন কালেই ফুরসৎ থাকে না। খেলার নামের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। চোখ দুইটা বড় করিয়া বলিল, ঠাম্মা, টুই—

এই সময় কাকা আসিয়া বলিল, বউদি, ভাত।

খোকা বোধ হয় ঠাকুরমাকে খেলিবার জন্য উৎসাহিত করিতে যাইতেছিল, সামনে এমন জবর সঙ্গী পাইয়া মত পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিল। ছুটিয়া গিয়া চোখে মুখে প্রবল আগ্রহের দীপ্তি ভরিয়া প্রশ্ন করিল, ছেয়ে, খেব্বি?

কাকা শখ করিয়া ভাইপোকে পিতৃত্বে বরণ করিয়াছে। পিতাপুত্রে আবার একচোট মাতামাতি চলিল।

আশায় আশায় দিন কাটিতেছে, গোপালের আগমনের কিন্তু কোন নিদর্শনই আর পাওয়া যায় না। নৈবেদ্যের পরিবর্দ্ধিত আয়োজন—শুদ্ধাচারে তৈয়ারি করা, দুইটি অন্তরের ভক্তিরস দিয়া সিঞ্চিত—যেমনকার তেমনই পড়িয়া থাকে। বাটিতে বাটিতে সর ক্ষীর ননী, রেকাবীতে ক্ষীরের ছাঁচ, ক্ষীরের নাড়ু, কোনটারই কোনখানে প্রত্যাশিত করচিহ্নটুকু পড়ে না। বধূ উদ্‌গ্রীব হইয়া চাহিয়া থাকে, শাশুড়ী বাহির হইলে মুখে গাঢ় নিরাশার ছায়া দেখিয়া আর প্রশ্ন করিতেও সাহস করে না।

চারিটি দিন কাটিয়া গেল। হাতে দুইটি নাড়ু লইয়া, রান্নাঘরের রকে আসিয়া শ্রান্তকণ্ঠে শাশুড়ী বলিলেন, নাঃ বউমা, কাল থেকে গয়লা-বউকে ব'লে দিও, যেমন দুধ দিচ্ছিল তেমনই দেবে। মিছে আশা। কই দাদু, পেসাদ খেয়ে যা রে।

বধূ ক্ষুব্ধচিত্তে বলিল, আমাদের কি সে রকম অদৃষ্ট মা?

খোকার কাকা ঘর হইতে চেঁচাইয়া বলিল, ও মা, ও হতভাগাকে কিচ্ছু দিও না; আমার সব নষ্ট ক'রে দিয়েছে, দেখ এসে বরং।

খোকা ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া হাজির হইল। বুকে পিঠে সর্ব্বাঙ্গে-

কালি, একটা চড়ের উপর দিয়াই ফাঁড়াটা কাটিয়া গিয়াছে বলিয়া মুখে হাসি। সিঁড়ি দিয়া রকে উঠিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, ক ক।

মা ধমক দিয়া বলিলেন, খুব ক খ হয়েছে; তোমার ঠ্যাঙ খোঁড়া না ক'রে দিলে আর—

ঠাকুরমা বলিলেন, থাক্, আর বকে না। হাতে নাড়ু দিয়া খোকাকে আলগোছে বুকের কাছে টানিয়া বলিলেন, তোর সাথী আমার পূজোর ঘরে কবে আসবে দাদু, ক্ষীর সর নিয়ে এই রকম দৌরাত্ম্যি করতে?

খোকা নাড়ু চিবানো বন্ধ করিয়া কথাটা যেন একটু বুঝিবার চেষ্টা করিল। তারপর পুনরায় বার কয়েক মুখ নাড়িয়া, খানিকটা গলাধঃকরণ করিয়া প্রশ্ন করিল, পেছা ঠাম্মা?

হ্যাঁ ভাই, পেসাদ খেতে সে আর আসবে না?

খোকা ঠাকুরমার মুখের খুব কাছে মুখটা লইয়া গিয়া, নিজের চোখ দুইটা খুব জোরে একটু বুজিয়া থাকিয়া, আবার খুলিয়া বলিল, ঠাম্মা, এনো কলো।

ঠাকুরমা হাসিয়া বলিলেন, মিছিমিছি চোখ ওরকম করতে যাব কেন রে হনুমান?

খোকা আর একবার চোখ বুজিয়া ব্যাপারটার পুনরভিনয় করিতে যাইতেছিল, 'ও বুঝেছি' বলিয়া ঠাকুরমা তাহাকে আবেগভরে বুকে চাপিয়া গভীর বিস্ময়ে বধূর পানে চাহিয়া বলিলেন, বউমা, দেখলে? আমি বলি তোমাদের, এ আমাদের ছলতে এসেছে।

বধূও বিস্মিত হইয়াছিল, তবে সেটা প্রধানত শাশুড়ীর আচরণে; নির্ব্বাক হইয়া সপ্রশ্ননেত্রে চাহিয়া রহিল। শাশুড়ী বলিলেন, ওর বলবার ইচ্ছে, একেবারে চোখ বুজে ব'সে থেকো, তা হ'লেই আসবেন। ঠিকই তো বউমা, এখন বেশ মনে পড়ছে কিনা, একটু দেখতে পাব আশা ক'রে একটা দিন ধ্যানের সময় ক্রমাগতই চোখ খুলে যাচ্ছে, তাতে কি আর তিনি আসেন মা? যেদিন আসেন, সেদিন কতক্ষণ যে একঠায় চোখ বুজে ছিলাম, এখন সেসব কথা মনে পড়ছে। তাতে

মন সুস্থির না হ'লে তো হবে না মা, গাছটিকে যদি ক্রমাগতই ওপড়াও, তবে কি গোড়া বসতে পারে? কিন্তু ওই শিশু, নিজের খেলায়ই মত্ত, কি ক'রে জানলে ও?

খোকাকে বুকে মিশাইয়া লইবার মত করিয়া সজল নয়নে প্রশ্ন করিলেন, তোর মনে কি আছে দাদু? বড় যে ভয় করে ভাই।

অমঙ্গল আশঙ্কায় মাও চক্ষে অঞ্চল দিল।

৪

তাহার পরদিন রবিবার ছিল, রান্নাবান্নার তাড়া নাই। বড় ছেলেকে রোজ আটটার সময় আহার করিতে হয় বলিয়া রবিবার দিন একটার সময় আহারে বসিয়া যুগপৎ নিজের স্বাধীনতা উপভোগ করে এবং চাকরির উপর আক্রোশ মিটায়। শাশুড়ী-বধূতে পরামর্শ হইল, পূজার সময় সেদিন বধূ পর্য্যন্ত বাড়িতে থাকিবে না, খোকাকে লইয়া পাশের বাড়িতে বেড়াইতে যাইবে। ভিতর-বাড়িতে শুধু শাশুড়ী থাকিবেন একা, পূজার ঘরে।

সেদিন রাত্রি থাকিতেই শাশুড়ী-বধূতে উঠিয়া, একান্ত শুচিতার সহিত স্নানাদি সারিয়া পূজার আয়োজন করিলেন। ক্রমে গব্য দ্রব্যের, ফুল ও চন্দনের গন্ধে ঘরটি ভরপুর হইয়া উঠিল। একটু বেলা হইলে বড় ছেলে রবিবারের অনিশ্চিত অড্ডায় চলিয়া গেল। ছোট ছেলের ক্যারম-প্রতিযোগিতা সামনে, সে মহলা দিতে গেল। বধূও এদিক-ওদিক একটু পাট সারিয়া খোকাকে লইয়া পাশের বাড়িতে চলিয়া গেল। নির্জ্জন নিঃশব্দ বাড়িটিতে শুধু একটি ব্যাকুল ভক্ত সংসারের সহস্র প্রয়োজনে বিক্ষিপ্ত চিত্তকে সাধ্যমত আকৃষ্ট করিয়া, আশায় অবাধ্য নয়নদ্বয়কে প্রতীক্ষায় সংযত করিয়া পূজার আসনে বসিয়া রহিল। শিশুর কথা দেবতারই ইঙ্গিত, খোকা চোখ বুজিতে বলিয়া চোখ খুলিয়া দিয়াছে। অনেকক্ষণ গেল, ক্রমেই শরীর-মন যেন কি-

একটা অপার্থিব সুষমায় ভরিয়া আসিতে লাগিল—প্রথম দিনের মতই, ক্রমে প্রথম দিনকেও অতিক্রান্ত করিয়া।

কাকা খোকাকে ঘাঁটাঘাঁটি না করিয়া বেশিক্ষণ থাকিতে পারে না, বিশেষ করিয়া ছুটির দিন। খেলার মধ্যেই একবার বাড়ি আসিয়া দেখিল, আর কেহ নাই, শুধু খোকা পূজার ঘরের নীচু জানালাটায় পেটটি চাপিয়া গভীর একাগ্রতার সহিত ভিতরে উঁকি মারিতেছে। কাছে যাইতে ডান হাতের কচি মাংসল আঙুল কয়টি জড়ো করিয়া অত্যন্ত গম্ভীরভাবে ফিসফিস করিয়া বলিল, তুপ, বাবা আবো।

তাহার মুখের ভাব দেখিয়া, বিশেষ করিয়া তাহার বাবা হওয়ার লোভ দেখাইবার ধরন দেখিয়া কাকার বেজায় হাসি পাইল। ফিসফিস করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমার মা কোথায়?

খোকা মুঠাটি গালের উপর বসাইয়া, ক্ষুদ্র তর্জ্জনীটি পাশের বাড়ির দিকে নির্দ্দেশ করিয়া একটু কুঁজোর মত হইয়া দাঁড়াইল, কোন কথা বলিল না। তাহার ভঙ্গীর নূতনত্ব আর বিচিত্রতায় কাকার হাসি চাপিয়া রাখা দুষ্কর হইল, পাশের বাড়িতে ছুটিয়া গিয়া বলিল, বউদি, শিগগির এস; একটা মজা দেখবে এস তোমার ছেলের।

বউদিদি নিশ্চিন্ত হইয়া গল্প করিতেছেন, বিবর্ণ মুখে বলিয়া উঠিল, ওমা, তাই তো! কখন চ'লে গেছে সেটা?

হনহন করিয়া ছুটিল, ছোটদের মধ্যে দুই-একজন সঙ্গও হইল।

খোকা জানালার কাছে নাই। দেবরের সঙ্গে সঙ্গে রকে উঠিয়া জানালার মধ্য দিয়া ভিতরে নজর দিয়াই বধূ বিস্ময়ে আশঙ্কায় নির্ব্বাক হইয়া গেল। শাশুড়ীর মুদিত নয়নযুগলে ধারা গড়াইয়া পড়িতেছে; একটু দূরে কালো পাথরের বাটিতে ক্ষীরের মধ্যে হাত ডুবাইয়া খোকা সতর্কভাবে ঠাকুরমার চোখের দিকে চাহিয়া; পলাইবার উদ্যমে শরীরটা মাটি হইতে একটু উঠিয়া পড়িয়াছে।

জানালা দিয়া ছায়া পড়িতেই ফিরিয়া চাহিয়া দুইটা হাত পেটে জড়ো করিয়া হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

ও মা গো!—বলিয়া বধূ ঘরের মধ্যে ছুটিয়া গেল। শাশুড়ী হঠাৎ

চক্ষু খুলিয়া আচ্ছন্নভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বউমা ? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সামনের দৃশ্যটিতে নজর পড়ায় আর উত্তরের প্রয়োজন হইল না।

বধূ বলিতে লাগিল, তোমার এই কীর্ত্তি হতভাগা চোর ? আমরা নাগাড়ে ক্ষীর সর মাখন তোয়ের ক'রে ক'রে হয়রান হচ্ছি, আর তোমার ভেতরে ভেতরে এই মতলব ? তুমি আমার কাছে না ছুটে যদি ধ'রে নিতে ঠাকুরপো, কি নৈরেকার, কি অনাচারটাই—

আমি কি জানি ? ভাবলাম, এর পরে নকল করবে ব'লে জানলা থেকে মার পূজো দেখছে ; ওঁর মালাজপের নকল করে, দেখ না ? ওর পেটে পেটে যে এ মতলব, তা কেমন ক'রে জানব ? সে বুজুটে ভাব যদি দেখতে ! আবার বলে, বাবা হব, চুপ কর।

হওয়াচ্ছি বাবা। এইজন্যে ঠাকুরমাকে কাল পরামর্শ দেওয়া হ'ল, চোখ বুজে থেকো—চেপে। চার দিন থেকে জুত হচ্ছিল না, না ?—বলিয়া রাগ না চাপিতে পারিয়া বধূ হাত উঠাইয়া আগাইয়া গেল।

শাশুড়ী এতক্ষণ বিস্মিত হাস্যে খোকার দিকে চাহিয়া এক রকম ধ্যানের ভঙ্গীতেই মৌন হইয়া বসিয়া ছিলেন। বধূ অগ্রসর হইতেই বলিয়া উঠিলেন, খবরদার বউমা। সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া খোকাকে কোলে লইয়া আসিয়া আসনে বসিলেন। ক্ষীর-মাখানো হাতটি তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন, এই তাঁর হাত বউমা, এই তাঁর চাঁদমুখ। বউমা, বললে বোধ হয় বিশ্বাস করবে না, আজ গোপাল এসেছিলেন। ধ্যান করবার সময় মনে হ'ল, যেন ঘর আলো ক'রে এলেন, ক্ষীরের বাটির মধ্যে হাত ডুবুলেন, এমন সময় তোমাদের গলা শুনে জেগে উঠলাম।

খোকার কীর্ত্তি রাষ্ট্র হইয়া গেল। কত মুখে বিদ্রূপের হলাহল উদ্গীরিত হইতে লাগিল। বধূরও ভ্রান্তি ঘুচিল বোধ হয় ; কিন্তু এক-জনের মনে কেমন করিয়া সত্যের একটি শিখা অম্লান আলোয় জ্বলিয়া রহিল। বধূকে আদেশ হইল, কাল থেকে খোকার জন্যে ছোট্ট একটি নৈবিদ্যি আমার আসনের পাশে রাখা থাকবে বউমা, যখন গোপালকে ওদিকে নিবেদন করব, খোকা তার নিজেরটি নিয়ে খেতে বসবে।

চৈতালী

ফাল্গুন গিয়া চৈত্র পড়িয়াছে। কয়েক দিন মাত্র হইয়াছে, কিন্তু তবুও রোদের দিকে চাওয়া যায় না। অদূরে জুট মিলটার গায়ে রোদ যেন ঠিকরাইয়া পড়িতেছে; কলের ক্লান্ত নিশ্বাসের মত অভ্র-রঙ লাগানো চিমনিটা দিয়া একটা তাম্রাভ ধুঁয়ার অস্পষ্ট রেখা মন্থর গতিতে কুণ্ডলি পাকাইতে পাকাইতে আকাশে মিশাইয়া যাইতেছে। প্রশস্ত মাঠটার সবুজ রঙে একটা অস্বস্তিকর চিক্‌চিকে শ্বেতাভা—মনে হয় তৃষ্ণার্ত্ত কি-একটা এই কাঁচা হরিৎ তাহার লালাক্ত জিব দিয়া যেন চাটিয়া বেড়াইতেছে। দূরে গঙ্গার দিকেও চাওয়া যায় না—রুক্ষ আকাশের নীচে জলের রেখাটা দুলিতেছে যেন একখানি কম্পমান মরীচিকা।

মাঠের ও-প্রান্তে একটা পত্রহীন পলাশ গাছের মাথায় এক থোকা টকটকে ফুল এখনও কি করিয়া আত্মরক্ষা করিয়া আছে। বেশ একটা প্রীতির ভাব জাগায় না, মনে হয়—দগ্ধাবশিষ্টের শেষ অগ্নিরেখা।

অশ্বিনী বলিল, এবার চৈত্রের রূপ দেখছ? বৈশাখ যে তা হ'লে কি বেশে আসবেন বলতে পারি না।

তারাপদ বলিল, জানলাটা বরং বন্ধ ক'রে দিই, সত্যি, চোখে বড় লাগছে আলোটা। সমস্ত বছরটাই প্রায় শুকো গেল, হবেই তো এ রকম।

উঠিতেই শৈলেন বলিল, থাক্ না, তোমরা না হয় এ দিকে মুখ ক'রে ঘুরে ব'স।

তারাপদ, অশ্বিনী, অক্ষয়—তিন জনেই মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করিয়া একটু হাসিল।

তারাপদ বসিতে বসিতে বলিল, তোমাদের অন্ত পেলাম না শৈলেন;—বর্ষা সরস, তাতে রস পাও বুঝি; কিন্তু এই জ্বলন্ত আকাশ আর ধরিত্রী,—চাইলে চোখ ঠিকরে পড়ে, এতে তোমরা কি রসের, কি

কবিত্বের যে সন্ধান পাও মাথায় ঢোকে না। নাঃ, তোমাদের নিয়ে যে কী মুশকিলেই—

শৈলেন স্থিরদৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া ছিল, মুখটা অল্প ফিরাইয়া লইয়া একটু হাসিল। সত্যই একটু আবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। তারাপদর পানে একটু চাহিয়া থাকিয়া হাসিয়াই বলিল, মুশকিল বরং তোমাদের নিয়েই—প্রত্যেকটি ব্যাপার তোমরা মানুষ বা জীবজন্তুর সুখ সুবিধের মাপকাঠি দিয়ে বিচার করবে। জল হয় নি—অর্থাৎ তোমাদের ধান-মুগ-মুসুরির অসুবিধে হয়েছে, কি তোমাদের গরু-ঘোড়ার একটু ঘাসের অভাব হয়েছে, বাস্, তোমরা চোখে অন্ধকার দেখছ ব'লে পৃথিবীর সব সৌন্দর্য্য লোপ পেল! ধর, যদি একটা বৃহত্তর প্রয়োজনে বা কোন এক বিরাটতর সত্তার—পুরুষেরই বল—অদ্ভুত সৌন্দর্য্যলিপ্সা মেটাবার জন্যেই এই রুক্ষতার সৃষ্টি হয়ে থাকে তো তাঁর সেই বিরাট আনন্দের সঙ্গেই আমাদের মনের সুর বাঁধবার চেষ্টা করাটাই কি বেশী সংগত—

এমন সময় অক্ষয় হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া জানালার বাহিরে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিল, দেখ দেখ, উস্—

সকলে নির্দ্দিষ্ট পথে দৃষ্টি ফিরাইয়া নিশ্চল হইয়া গেল। একটা মুষলাকৃতি বিরাট দেহ তাণ্ডবের মত্ত আনন্দে জ্বলন্ত মাঠের উত্তর হইতে দক্ষিণে চক্রগতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহার ধূলিপাটল অঙ্গ হইতে জীর্ণ-পত্রের ছিন্ন বসন ক্রমাগত পড়িতেছে খসিয়া, আর ক্রমাগতই সে শিকড়ের মত শীর্ণ বক্র অঙ্গুলি দিয়া সেটাকে জড়াইয়া লইতেছে। পাতায় পাতায় সংঘাতের ফলে যে একটা উগ্র মরমর উঠিতেছে, সেটা এত দূর থেকেও স্পষ্ট শোনা যায়।

তারাপদ বলিল, এ রকম ঘূর্ণি অনেক দিন দেখি নি,—কখনও দেখেছি কি না মনে পড়ে না।

অক্ষয়ের একটু যেন ঘোর লাগিয়াছিল, বলিল, ঘূর্ণিই তো? দেখ দেখ কপালে আগুন জ্বলছে!

একটানা নয়, তবে একটু থাকিয়া থাকিয়া সত্যই রুদ্রের তৃতীয় নয়নের

মত ঘূর্ণিটার ললাটে একটা অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিতেছে। যত আবর্জ্জনা দেহ-লগ্ন করিতে করিতে গতিটা হইয়া উঠিতেছে আরও প্রমত্ত।

তারাপদও একটু কি রকম হইয়া গিয়াছিল, কতকটা যেন নিজের মনেই বলিল, শুনেছি সব ঘূর্ণিই—ঘূর্ণি-মাত্র নয়।

আবার নিজেই সেটা সামলাইয়া লইয়া বলিল, অবশ্য মেয়েলী কথা।

অক্ষয়ের ঘোরটা তখনও কাটে নাই, একটু বিরক্তির কণ্ঠেই বলিল মেয়েলী! কপালের ঐ আলোটা তা হ'লে কি? ঐ দেখ, আবার—ঐ—ঐ—

শৈলেন বলিল, আগুনই। কোন্ উনুনের তাও সন্ধান পেয়েছি আমি।

সকলে তাহার মুখের দিকে চাহিল। শৈলেন পলাশ গাছটার পানে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া প্রশ্ন করিল, ফুলের সেই গোছাটা কোথায়?

সকলেই দেখিল, ডালের বেশ খানিকটা পর্য্যন্ত লইয়া ফুলের সমস্ত স্তবকটা অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। অক্ষয় প্রশ্ন করিল, 'বলতে চাও, ঘূর্ণিতে ডালসুদ্ধ মুচড়ে নিয়ে চ'লে গেছে?

শৈলেন মাথা দোলাইল, বলিল, বাংলার ম্যালেরিয়াগ্রস্ত ঘূর্ণি এর বেশি বোধ হয় পারে না, তবে অন্যত্র সে গাছকে-গাছ উপড়ে নিয়ে নাচের সহচর করেছে এ আমার নিজের চক্ষে দেখা।

সকলে ধরিয়া বসিল—গল্পটা তাহা হইলে বলিতে হইবে, চৈতালী গল্পই চলুক আজ।

* * *

শৈলেন মাথার তলায় মোটা তাকিয়াটা ভাল করিয়া বসাইয়া লইল, যাহাতে দৃষ্টিটা বেশ সোজাসুজি জানালার বাহিরে গিয়া পড়িতে পারে। বলিল, সে গল্পটা বলতে গেলে আমাকে আগে অক্ষয়ের ক্ষমা ভিক্ষা ক'রে নিতে হয়। তার মানে, যদিও সে ঘূর্ণিটা বোধ হয় একটা আটপৌরে চৈতালী ঘূর্ণি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না, তবু সমস্ত ব্যাপারটাকে

যোগাযোগের মধ্যে এমন কতকগুলো কাণ্ড হয়েছিল, যার টীকা আমি এখনও সম্পূর্ণ ভাবে ক'রে উঠতে পারি নি।

শৈলেন রহস্যের স্মৃতিতেই যেন একটু থামিয়া গেল, তাহার পর আবার আরম্ভ করিল, সেবার হঠাৎ নেপালে পশুপতিনাথ দর্শনের খেয়াল চাপল। চমকো না, ভক্তির টান নয়। শিব উদাসীন, কিন্তু আমি ওঁর বা ওঁদের সম্বন্ধে তার চেয়ে লাখোগুণ উদাসীন, এ কথা জানই। ঝোঁক চাপল দলে প'ড়ে। মেয়ে-পুরুষে বেশ একটি বড় দল হ'ল আমাদের। ওদের অবশ্য লোভ সাক্ষাৎ শিবকে দেখবে, আমার শখ দেখব হিমালয়। অন্তত এই উদ্দেশ্য নিয়ে তো বেরুলাম।

—কিন্তু জান, ধর্ম্ম জিনিসটা বড় সংক্রামক। চার দিন লাগল আমাদের হিমালয়েব গোড়ায় পৌছুতে। এই চার দিনেই দলের সবার মুখে ক্রমাগত শিবের কীর্ত্তিকাহিনী শুনতে শুনতে আমার মনে অল্প অল্প ক'রে রঙ ধরতে লাগল। তার পর দল ক্রমেই বাড়তে লাগল আর আলোচনাও ঘোরাল হয়ে উঠতে লাগল, শেষে এমন হ'ল যে, যখন হিমালয়ের গোড়ায় পৌছলাম তখন হঠাৎ দেখি, আর সবার মতনই আমিও এক রীতিমত শৈব হয়ে পড়েছি। আমার মানসিক পরিবর্ত্তন আর সেই সঙ্গে নিষ্ঠা দেখে সবাই সাব্যস্ত করলে—বাবাই আমায় ঘরছাড়া ক'রে টেনে নিয়ে এসেছেন।

—ক্রমে কথাটা আমিও বেশ জোরের সঙ্গে বিশ্বাস করলাম এবং বোধ হয় দেবতার এই বিশেষ অনুগ্রহের বিশ্বাসেই আমার আকাঙ্ক্ষাটা সব সীমানা ছাড়িয়ে একেবারে অসম্ভাব্যের কোটায় গিয়ে উঠল। আকাঙ্ক্ষা না ব'লে যদি আবদার বলি তো বোধ হয় আরও ঠিক হয়। হিমালয়ের নিচেকার গোটাকতক পাহাড় অতিক্রম করতে করতেই তার বিরাটতায় আমি যেন অভিভূত হয়ে পড়তে লাগলাম। কতকটা যেন একটা নেশার ভাব আমার মাথায় ঘনীভূত হয়ে উঠতে লাগল,—খুব বড় একটা কিছুর নেশা। মনে হ'ল, এই তো আমি পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে যা বিরাট্, সব চেয়ে যা রহস্যময়—দেবতাদের লীলাভূমি, শঙ্কর-উমার তপঃপ্রাঙ্গণ যে হিমালয় তার গহ্বরে বিচরণ করছি; এখানে এসেও কি আমায় ক্ষুদ্র সংকীর্ণ একটা মন্দিরের মধ্যে স্বল্লায়তন একটি শিলা-বিগ্রহকে দেখেই

দেবদর্শনের সাধ মিটিয়ে যেতে হবে? আমার প্রতি যদি দেবতার এতই করুণা যে, আমার কঠিন ঔদাসীন্তের মধ্যেও তাঁর আকর্ষণকে এমন প্রবল আর অমোঘ ক'রে তুলেছেন তো তিনি আমার কাছে নিজের স্বরূপে প্রকট হোন। কালের অপ্রমেয় অতীতে এই দেবভূমির উপর লোকাতীত যে সমস্ত লীলা সংঘটিত হয়েছিল, তার অল্প একটুও আবর্ত্তিত ক'রে আমার নয়নের সামনে ধরুন। আমি চরিতার্থ হব। তপঃক্ষীণা ধ্যানরতা উমার প্রশান্ত জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিই হোক, ভিক্ষার্থী শঙ্করের সামনে শিবানীর অন্নপূর্ণামূর্ত্তিই হোক বা মদন-ভস্মের সময় যোগিবরের প্রলয়-মূর্ত্তিই হোক—কালের যবনিকা তুলে আমায় দেখান একবার। তার জন্তে যা তপস্তা তা আমি করব। আমার জাগ্রত চেতনায় যদি সম্ভব না হয় তো স্বপ্নেই হোক বা আমার চেতনাকে সম্মোহিত করেই হোক, আমায় দেখান! আমি সেটাকেও সত্যরূপেই গ্রহণ ক'রে আমার তীর্থ-অভিযানের পরম সঞ্চয় ক'রে রাখব। তাঁর লীলাক্ষেত্রে এসেও যদি আমায় মাত্র স্থাবর শিলামূর্ত্তি দেখেই ফিরতে হয় তো ভাবব, আমি বঞ্চিত হলাম।

—যতই এগুতে লাগলাম, হিমালয়ের বিস্ময় যতই আমায় আচ্ছন্ন ক'রে ফেলতে লাগল, আমার মনটা ততই যেন অপ্রসন্ন হয়ে উঠতে লাগল।··· এই তো এসে পড়লাম ব'লে—ভিড়ের পেছনে শিলামূর্ত্তিকেও ভালভাবে না পেয়ে, আর শিলামূর্ত্তির পেছনে দেবতাকেও হারিয়ে দু-দিন পরে ফিরে যাব। শূন্তহাতেই যাব ফিরে। এই জন্তেই কি সুদূর বাংলা ছেড়ে এত আশা এত উত্তম নিয়ে আসা? যে দেবতার প্রসাদ লাভ করেছি ব'লে সবাই বলছে, এক এক সময় যে দেবতাকে অন্তরতম অন্তরে পাই ব'লেও যেন অনুভব করি, তাঁর কি ক'রে পূজো করব, যদি এই দারুণ নিরাশা মনকে তিক্ত ক'রে রাখে? বরকে অভিশাপে পরিণত করবার জন্তেই কি তিনি আমায় এখানে নিয়ে এলেন? আমার খাওয়া ক'মে এল, পথ অতিক্রম করার উৎসাহ ক'মে এল, দলের পক্ষে আমি যেন একটা বোঝা এবং সমস্তা হয়ে উঠতে লাগলাম, যে দল বিশেষ ক'রে আমার ওপরই একটা অলৌকিক শক্তির আকর্ষণ ধ্রুব ব'লে মেনে নিয়েছিল।

—এরই মধ্যে কিন্তু আমার মনে এক এক সময় আবার হঠাৎ কোথা থেকে একটা জোয়ার ঠেলে উঠত—একটা প্রবলতর বিশ্বাসের জোয়ার। সমস্ত মনটা লোকোত্তর কিছু একটা দেখতে পাবে ব'লে যেন উদগ্র হয়ে উঠত, মনে হ'ত, এই এক্ষুনি দেখতে পাবে,—সে এক অদ্ভুত ধরনের অনুভূতি, যাতে না-দেখতে পাওয়াটাই আশ্চর্য্য মনে হ'ত।...এই যে প্রত্যক্ষ সমস্ত ঘটনা—এই রুক্ষ ইন্দ্রিয়াধীন হিমাচল, এই দলের পর দল আমাদের যাত্রীদের অভিযান, তাদের প্রতিদিনের চলার ইতিহাস, চটিতে এসে নিতান্ত পার্থিব ব্যাপারগুলার অনুষ্ঠান—এই সবগুলোকেই কেমন যেন অলীক আর অদ্ভুত ব'লে মনে হ'ত। ঠিক যেন এসব মিলিয়ে আসছে আর সামনেই অন্য এক নাট্যশালার একটা পর্দ্দার দোল অনুভব করা যাচ্ছে। এখুনি পর্দ্দা উঠবে আর আরম্ভ হবে নটরাজের খেলা। বেশ অনুভব করছি, এই যে পেছনের জগৎ আমার, এটা সে খেলার সামনে প্রেক্ষাগৃহের মতনই আমার চেতনা থেকে বিলীন হয়ে যাবে।

—তোমরা বলবে—আশা-নিরাশার সঙ্গে উপবাস আর পথশ্রান্তি মিলে আমার মস্তিষ্ককে বিকৃত ক'রে আনছিল। সম্ভব।

—এই সময় একটা ব্যাপার হ'ল যার দ্বারা আমি আমার দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। তোমাদের বলতে ভুলে গেছি যে, মেলা লোককে কুড়িয়ে বাড়িয়ে নিয়ে আমাদের যাত্রা করতেই অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। ফলে, যদি বলা যায় যে, সব যাত্রীদলের মধ্যে আমরাই প্রায় শেষ দল ছিলাম তো বিশেষ মিথ্যা বলা হয় না। পৌঁছবার আগের দিন দুপুরবেলায় আমরা যে চটিতে এসে উঠলাম, সেখানে খবর পেলাম যে একটা আকস্মিক প্রবল ঝড় আর বৃষ্টিপাতে সামনের রাস্তায় একটা বড় রকম ধস্ নেমে রাস্তাটা বন্ধ হয়ে গেছে। এ রকম জায়গায় একটা আতঙ্কের কথা শুনলে তার সত্য মিথ্যা নির্দ্ধারণ করবার আর সাহস থাকে না মনে। স্থির হ'ল, আমরা একটা অন্যপথ দিয়ে ঘুরে যাব, তাতে আমাদের একটা দিন বেশি লাগবে। আমি ছাড়া সবাই বড় নিরুৎসাহ হয়ে পড়ল।

তিন জনেই প্রশ্ন করিয়া উঠিল, তুমি ছাড়া?

শৈলেন উত্তর করিল, হ্যাঁ, আমি ছাড়া বইকি।

তিন জনেই আবার প্রশ্ন করিয়া উঠিল, তার মানে?

শৈলেন উত্তর করিল, আমার মনে হ'ল, আমার মনের আবেদন যেন যথাস্থানে পৌঁছে গেছে। যদি তখন এও ভেবে থাকি যে, পাহাড়ের এই ধস্ কোন এক মহাশক্তির আবির্ভাবই সূচিত করছে তো কিছু আশ্চর্য্য হ'য়ো না। আমার মনটা তীক্ষ্ণ প্রত্যাশায় আরও চঞ্চল হয়ে উঠল। ঐ ধস্—আমাদের যাত্রাপথে যা একটা এত বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল, সেটা কার পদচিহ্ন মাত্র? তাকে দেখতেই হবে, তা সে যতই ভৈরব হোক না কেন।

—পথ অত্যন্ত খারাপ। ক্রমাগতই যেন মনে হচ্ছে, গভীরতর অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করছি। যখন পরের চটিতে পৌঁছলাম আমরা, তখন দিব্যি অন্ধকার হয়ে এসেছে। আমাদের সঙ্গে মাত্র আর একটি ছোট দল ছিল—যাত্রীরা উত্তর-মাদ্রাজ অঞ্চলের। সবাই তাড়াতাড়ি রাঁধবার-খাবার ব্যবস্থায় লেগে গেল।

অন্ধকারমগ্ন সেই জায়গাটা আর সেই রাত্রিটা আমার মনে একটা এমন ছাপ রেখেছে, যা এ জন্মে মেটবার নয়। চটিটা একটা পাহাড়ের গোড়ায়, তার পেছনের দেয়ালটা পাহাড়েরই একটা অংশ। সেই দেয়ালটা একটু একটু ঢালের ওপর যে কতদুর পর্য্যন্ত চ'লে গেছে কিছুই ঠাহর হয় না। চটির কলরব থেকে একটু আড়ালে এসেই একটা অদ্ভুত থমথমে ভাব। শব্দের রেশমাত্রও কোথাও কিছু নেই—অবস্থাটাকে যেন শুধু মৌনতা বললেই যথেষ্ট হয় না; মনে হয়, মৌনতাও যেন তার কাছে ঢের মুখর। সেই অন্ধকার, সেই রহস্যময় বন, সেই পাহাড়—যা কোথায় গিয়ে যে ঠেকেছে কেউ জানে না, আর, সমস্তকে আচ্ছন্ন ক'রে সেই অদ্ভুত স্তব্ধতা—এই সব কটি একসঙ্গে আমার মনকে ভরাট ক'রে আমায় উল্লাসে বিস্ময়ে যেন কি এক রকম ক'রে দিলে। মনের ভাবটা ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছি না—কেন না, মানুষ যখন একটা ভাবে অভিভূত হয়ে পড়ে, তখন তার স্মৃতিশক্তিটা হয়ে পড়ে বড় অস্পষ্ট; তবে আবছাগোছের একটু মনে আছে যে, হঠাৎ যেন একটা বিলুপ্ত হয়ে

যাওয়ার নেশা আমায় পেয়ে বসল—ঠিক আত্মহত্যা করবার নয়, শুধু বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার—এই তরল কষ্টিপাথরের মত অন্ধকারে, চির-অজ্ঞেয় বনাশ্রিত এই পাহাড়ে, এই অপরূপ শুদ্ধতায়। বিরাট্ এক অজগর তার অপলক ঘনকৃষ্ণ চক্ষু দিয়ে আমায় সম্মোহিত ক'রে ফেলে তার অন্ধকার জঠরে আকর্ষণ করছে। সব তুচ্ছ ক'রে, সব ভুলে আমি স্থির পদক্ষেপে চলেছি, কেন না গতির মধ্যে রয়েছে এক অপূর্ব্ব মাদকতা …আর একটা ঘূর্ণি উঠেছে, দেখ।

অপেক্ষাকৃত ছোট ঘূর্ণি; মিলাইয়া গেলে, সকলে আবার পূর্ব্ববৎ দৃষ্টি ফিরাইয়া বসিল। শৈলেন বলিল, খুব বেশি দূর যাই নি, কেন না একটু গিয়েই পদে পদে জঙ্গলের ডালপালার বাধা পেয়ে আমার চৈতন্য হয়েছিল—এটা বেশ মনে আছে। ঠিক যেন আমার মনে হ'ল, প্রাণপণে কে আমায় সামনে ঠেলে রাখবার চেষ্টা করছে, কার যেন নিঃশব্দ সতর্ক-বাণী শুনতে পাচ্ছি—'এস না, এস না, এ পথ নয়।' ভরা চৈতন্য হবার সঙ্গে সঙ্গে ফেরবার চেষ্টা করছি, কিন্তু সে তো আর সম্ভব নয়। সমস্ত রাত শুধু ঘুরে বেড়িয়েছি মাত্র। ভোরেও নয়, সকালেও নয়, যখন চটিতে ফিরলাম, তখন দুপুর গড়িয়ে গিয়েছে। সঙ্গীরা—দুই দলের সবাই যথাসাধ্য খোঁজাখুঁজি করে দুপুরের অল্প একটু আগে নিরাশ হয়ে বেরিয়ে পড়েছে। বোধ হয় আরও থেকে যেত কিছুক্ষণ, কিন্তু এই সময় একজন তিব্বতী লামা চটিতে হঠাৎ এসে পড়েন। তিনি সব শুনে বললেন, তিনিও পশুপতিনাথের পথেই যাচ্ছেন—আমায় সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসবেন।

—কথাগুলো শুনলাম আমার চটিওয়ালার কাছে; লোকটা তরাইয়ে এক সময় ছিল—ভাঙা গোছের এক রকম হিন্দী একটু একটু জানে, কাজ চালিয়ে নেয়। জিজ্ঞাসা করলাম, লামা কোথায়?

—চটিওয়ালা একটা অন্ধকারগোছের ঘর দেখিয়ে বললে, তিনি ওইখানে বিশ্রাম করছেন।

—বললাম, আমায় নিয়ে চল, অবশ্য যদি তাঁর আপত্তি না থাকে।

—ঘরের মধ্যে গিয়ে কিন্তু দেখলাম, কেউ নেই। বেরিয়ে বারান্দায় এসে চটিওয়ালা বললে, বাঃ, এই একটু আগে তো ঢুকলেন ঘরে!

—বাইরে রোদটা খুব স্বচ্ছ, এদিকে ঘরটা কতকটা অন্ধকার, ধাঁধা লাগল না তো? সংশয়টা চটিওয়ালাকে জানাতে সে আবার ঘরে ঢুকল, আমিও পেছনে পেছনে গেলাম। অন্ধকার কোণটার পানে গলাটা একটু বাড়িয়ে চটিওয়ালা এবার একটা ডাকও দিলে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমরা দুইজনেই চমকে উঠলাম। উত্তর এল আমাদের পেছন থেকে, ফিরে দেখি, ঠিক দরজার বাইরে বারান্দায় একজন দীর্ঘকায় পুরুষ আমাদের দিকে স্থিরদৃষ্টিপাত ক'রে দাঁড়িয়ে। চটিওয়ালা একটু অপ্রতিভ হাসি হেসে কি একটা কথা বললে, তিনি তার উত্তরও দিলেন। চটিওয়ালা আবার কি একটা প্রশ্ন করলে, তারও উত্তর হ'ল। কিন্তু লক্ষ্য করলাম, এবার স্বরটা একটু যেন রুক্ষ, দৃষ্টিতেও একটু যেন বিরক্তি—কারুর কথায় বিশ্বাস না করলে তার মুখের ভাবটা যেমন হয়, কতকটা সেই রকম। এবার চটিওয়ালার মুখে একটু খোশামোদের হাসি ফুটে উঠল, একটা কথাও কি বললে, না-বুঝতে পারলেও মনে হ'ল, একটা জবাবদিহি দিয়ে লোকটির বিরক্তিটা মিটিয়ে দিতে চায়। তার পর একটা প্রশ্ন করলে। তার উত্তরে লোকটা আমার পানে স্থিরভাবে সেকেণ্ড কয়েক চেয়ে থেকে ঠিক তিনটি শব্দে কি একটা কথা বললে। সমস্ত শরীরটি নিশ্চল, শুধু চাপা ঠোঁট দুটি অল্পমাত্র একটু নড়ল।

—ঘরের মধ্যে সেই প্রথম না-পাওয়া থেকে তীক্ষ্ণদৃষ্টির সঙ্গে এই স্বল্পাক্ষর প্রশ্ন, আমার কেমন যেন একটা অস্বস্তি হচ্ছিল। পূর্ব্বেই বলেছি, লোকটা বেশ দীর্ঘাকৃতি, মুখটা তিব্বতী ছাঁদেরই, তবে সাধারণত এদের মুখ যেমন ভাবলেশহীন হয় তেমন নয়—বেশ বুদ্ধিদীপ্ত। মোঙ্গোলীয় জাতের বয়স নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে শক্ত, তবুও সমস্ত আকৃতিটার কোথায় যেন কি আছে, যার দ্বারা একটা ধারণা আপনি থেকেই বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, বয়সটার মধ্যে কিছু একটা অসাধারণত্ব আছে—যেন আমাদের বয়সের মাপকাঠি দিয়ে মাপা চলে না—শতও হতে পারে, দুই শত হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়, যদি তার ওপরেও কিছু হয় তো তা হ'লেও কিছু আশ্চর্য্য হবার নেই। আমাদের চেহারায় থাকে খণ্ডিত কালের নিশানা, ওর চেহারায় কালের যদিই বা কিছু ছাপ লেগে থাকে তো

সে অখণ্ড কালের।—সমস্ত মাথাটি মুণ্ডিত, গায়ে হলদে-রঙে-ছোবানো মোটা সিল্কের একটা তিব্বতী আলখাল্লা। লোকটা তিব্বতী নিশ্চয়, কিন্তু একটু বিস্মিত হয়ে দেখলাম বৌদ্ধ নয়, কেন না হাতে একটি রুদ্রাক্ষের মালা ; তার মানে, লামা নয়, বোধ হয় কোন মঠধারী শৈব। আমি একটু বিস্মিত হলাম এই জন্যে যে, আমার ধারণা ছিল তিব্বতী মাত্রেই বৌদ্ধ।

—প্রশ্নটা বুঝতে না পেরে একটু অস্বস্তির সঙ্গে মুখের পানে চেয়ে আছি, চটিওয়ালা বললে, বলছেন ঠিক সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে বেরুবেন।

—অদ্ভুত প্রস্তাব, যেখানে সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে আশ্রয় না খুঁজে বের করতে না পারলে জীবনই বিপন্ন, সেখানে আশ্রয় ছাড়বারই ব্যবস্থা হ'ল সূর্য্যাস্তে! একটু হতভম্ব হয়ে লোকটির মুখের পানে চাইলাম, প্রস্তরমূর্ত্তিতে কোন পরিবর্ত্তন না দেখে, চটিওয়ালার মুখের দিকে চেয়ে বললাম, বেশ, তাই হবে।

—চ'লে আসতে আসতে চটিওয়ালা রুক্ষস্বরেই বললে, অথচ আমার যেন মনে হচ্ছে ঘর থেকে বেরুন নি বাবু ; কখন বেরুলেন ? এই সব তিব্বতী লামারা সব কিছুই—

—হঠাৎ পেছনের দিকে একবার চেয়ে চুপ ক'রে গেল।

—বুঝলাম, নিশ্চয় এই রকম গোছের কোন মন্তব্য করতেই তিব্বতীর মুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠেছিল, এবং ফিরে না দেখলেও মনে হ'ল, সে সেইখানেই দাঁড়িয়ে আমাদের দেখছে ব'লেই চটিওয়ালা হঠাৎ থেমে গেল। অস্বীকার করব না, একটু যেন গা-ছমছম করতে লাগল—লোকটার চেহারা অশ্রদ্ধা জাগায় না—মোটেই না, বরং বেশ একটা সম্ভ্রম জাগায়, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে জাগায় অপরিমেয় রহস্যের ভাব। রাত্রিকে সামনে রেখে এই লোকের সঙ্গে পা বাড়াতে বেশ একটু গা-ছমছম করতে লাগল ; চটিওয়ালার অসমাপ্ত মন্তব্য সেটা আরও বাড়িয়ে দিলে।

—তারপর আবার এল সেই জোয়ার, সেই উগ্র কৌতূহলের জোয়ার। মনটা আস্তে আস্তে একটা অদ্ভুত উল্লাসে ভ'রে উঠতে লাগল। বুঝলাম, আমার প্রার্থনা মঞ্জুর হয়েছে, দূত এসেছেন আমায় নিয়ে যেতে। রহস্য-লোকের যাত্রা তো সন্ধ্যার মহেন্দ্রলগ্নেই ; সামনে থাকবে দূরবিস্তৃত রাত্রি—

অন্ধকার—অন্ধকার—আরও, আরও অন্ধকার, তার পর যাত্রাপথের অসীম নিরাশা, অসীম ক্লান্তির শেষে আসবে প্রদোষ তার সামনে দীপ্ত দিবালোক নিয়ে। দেখব আমি লোকাতীত এক নতুন জগৎকে, সেখানে বিস্মৃত অতীতের রহস্যলীলা মরণহীন কালের কোলে নিত্য লীলায়িত হচ্ছে। কোথা শঙ্কর? কোথা উমা? কোথা যক্ষ-গন্ধর্ব্বলোকের সঙ্গে লোকের অপূর্ব্বমিলন? কোথা স্বর্গমর্ত্তচারী দেবর্ষিদের জ্যোতিঃ-পথ-রেখা? দিব্যাঙ্গনাদের প্রমোদভূমি? প্রত্যক্ষ করতে হবে। ভয়? ভীতু যে, সে কি? যে বিপদকে আহ্বান করতে পারলে না, মরণকে যে পরম ত্রাতা ব'লে আলিঙ্গন ক'রে নিতে পারলে না, তাকে যে এই খর্ব্ব বিরস বৈচিত্র্যহীন জীবনকে আঁকড়ে প'ড়ে থাকতে হবে,—যে জীবন হীনতর, দীর্ঘীকৃত মরণেরই নামান্তর মাত্র। কী আনন্দ! আমি যাব। এই অগণিত যাত্রীদের মধ্যে দেবতা আমায়ই বেছে নিয়েছেন এই মহা-সৌভাগ্যের জন্যে! আমার ললাটেই তাঁর জয়টীকা দিয়েছেন পরিয়ে, আমারই জন্যে পাঠিয়েছেন তাঁর দূতকে! তাঁর অসীম করুণার জন্যে কোটি কোটি প্রণাম। আমি যাব, যাব। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা ক'রে থাকা আমার অসহ্য হয়ে উঠছে ক্রমেই—

শৈলেন ভাবের উন্মাদনার মধ্যে ভাষাকে একটা ঝঙ্কার দিয়াই জানালার বাহিরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া থামিয়া গেল। খানিকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই ভাবেই চুপ করিয়া রহিল—যে রহস্য-অভিযান এক দিন সত্য হইয়াছিল জীবনে আজ হঠাৎ উদ্বেলিত স্মৃতিতে সেই অভিযান যেন রেখা-অনুরেখায় ফুটিয়া উঠিয়া এক অপ্রত্যক্ষ নূতনতর বাস্তবের রূপ ধরিয়াছে। এই আবেশের মধ্যে এরা তিন জনেও মৌন হইয়াই রহিল।

শৈলেন আবার আরম্ভ করিল, চলার কথা আমি বিশেষ কিছুই বলব না, পথের বর্ণনারও চেষ্টা করব না। হিমালয়ের বর্ণনার জন্যেই চাই কালিদাস—ঐ রকম এক উত্তুঙ্গ প্রতিভা। দিন নেই, রাত্রি নেই, চলেছি, আর প্রতি পদক্ষেপে পেয়েছি নতুন বিস্ময়। রাত্রির কথায় তোমরা আশ্চর্য্য হচ্ছ, কিন্তু সত্যি আমরা রাত্রিতেও চলতাম পথ। ব্যাপারটা খুব আশ্চর্য্যের নয়; আমরা যে ক্রমোচ্চ পথে চলছিলাম বেশি শাখাপ্রশাখার

ঘন জঙ্গল তাতেই ক্রমেই ক'মে আসছিল, মোটেই অলৌকিক নয়, নিত্য ভৌগোলিক ব্যাপার। আমরা যে স্তরে আরম্ভ করেছিলাম, সেইটে ছিল ঘন বনের শেষ চিহ্ন, আমরা সেই রাত্রির প্রথম অংশেই সেটা অতিক্রম ক'রে গেলাম। আশ্চর্য্যের মধ্যে এইটুকু দেখলাম যে, যে পথে আমরা যাচ্ছিলাম সেটা রেড রোড না হ'লেও যে পথে এতক্ষণ চলেছি তার চেয়ে ঢের সহজ, ঢের পরিচ্ছন্ন। হতে পারে আমি একটা প্রবল আকর্ষণে ছোট ছোট সব বাধাকেই অগ্রাহ্য ক'রে চলেছি, তবু এ কথা মানতেই হয় যে খুব বেশি বাধা তেমন কিছুই ছিল না। আর একটা কথা যা তখন ভেবে দেখি নি, অথবা যা তখন, কেন জানি না, অত্যন্ত অস্বাভাবিক ব'লে মনে হয়েছিল, তা এই যে, সে রাত্রে এবং পরে সব রাত্রেই বরাবর একটা অস্পৃষ্ট আলো পেয়ে গেছি। পরে মিলিয়ে দেখেছি, সে আলো—বা আলোর আভাস বলাই ঠিক—বেরিয়েছে সেই তিব্বতী সঙ্গীর দেহ থেকে। তোমরা আপত্তি করবে জানি, কিন্তু এটাও খুব একটা অলৌকিক জিনিস নয়। কখনও কখনও মানুষের মধ্যে যে এ জিনিসটা পাওয়া যায়, বিজ্ঞান থেকে ধর্ম্মশাস্ত্র পর্য্যন্ত সব কিছুই এটা স্বীকার করে। বিজ্ঞান বলে, এটা শরীরের মধ্যে কোন একটা রাসায়নিক দ্রব্যের আধিক্যের জন্যে হয়। ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে বিজ্ঞান-ঘেঁষা ব'লে আপাতত থিয়োসফিকেই ধরা যাক—থিয়োসফি বলে, ও একটা তেজ বটে তবে অলৌকিকের চেয়ে লৌকিকই বেশি। প্রয়োজনমত উৎকর্ষ করলে সবারই হতে পারে। কতকটা অন্ধকারের মধ্যে পূর্ণ দৃষ্টিশক্তির মত। এই আমার থিয়োরী; না হয়, সম্মোহন তো মানই, ধ'রে নাও আমি সম্মোহিত হয়েই বরাবর একটি অস্পৃষ্ট আলোককে অনুসরণ ক'রে চলতাম। যাই হোক, ব্যাপারটা হ'ত, আর আমার কাছে আগাগোড়াই এত সহজ ভাবে দেখা দিয়েছিল যে, আমি কখনও বিস্মিত হই নি বা প্রশ্ন করি নি। এই সঙ্গে এটাও জেনে রাখ যে, হিমালয়-গর্ভে পদে পদেই এত বিস্ময়, এত নূতনত্ব যে প্রশ্ন করবার প্রবৃত্তিটা লুপ্ত হয়ে আসে।

অশ্বিনী বলিল, দু-একটা উদাহরণ ছাড়তে ছাড়তেই চল না।

শৈলেন তাহার পানে চাহিয়া ক্ষণমাত্র কি একটা ভাবিয়া লইয়া বলিল,

দাঁড়াও, কথাটা আমি একটু ভুল বুঝেছি। হিমালয়—হিমালয় হ'লেও প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলির মধ্যে যে সর্ব্বদাই রহস্য আর বিস্ময় আছে এমন নয়, শুধু অপরূপত্ব আছে—এইটুকু বলতে পারি। তবে আমি মাঝে মাঝে একটা অতিপ্রাকৃত জগতেরও পেয়েছিলাম সন্ধান। তাই বা কেমন ক'রে বলি ?—তখন চেষ্টা করি নি, মনের অবস্থা চেষ্টা করবার মত ছিল না, তাই বিস্মিতই হয়েছিলাম ; পরে কার্য্য-কারণের সম্বন্ধ মিলিয়ে অনেক-গুলোরই যেন রহস্য উদ্ঘাটন করতে পেরেছি, অবশ্য অনেকগুলোর পারি নি এখনও, কিন্তু সেটা আমার জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার অল্পতার জন্যেও তো হতে পারে। তা ভিন্ন এখনও পারি নি ব'লে যে ভবিষ্যতেও কখনও পারব না, তাই বা কেমন ক'রে মেনে নিই ?

অক্ষয় একটু তর্কের ঝাঁজের সঙ্গে প্রশ্ন করিল, তা হ'লে বলতে চাও যে, অলৌকিক ব'লে নেই কিছু এত বড় সৃষ্টিটার মধ্যে ?

শৈলেন একটু মাথা নিচু করিয়া চিন্তা করিয়া কি একটা উত্তর দিতে যাইতেছিল তারাপদ বলিল, এ সব পরে হবে, আগে গল্পটাই শেষ কর।

শৈলেন বলিল, হ্যাঁ, একটা কথা ভুলে যাচ্ছিলাম,—যাত্রার দ্বিতীয় দিনেই আমি একবার পশুপতিনাথের কথা তুলেছিলাম। তাতে লোকটা ভ্রূভঙ্গী ক'রে আমায় কি একটা প্রশ্ন করলে। তার অর্থ যাই হোক, আমার যেন মনে হ'ল জিজ্ঞাসা করলে, সত্যই কি আমি সেইখানেই যেতে চাই ? হয়তো অন্য কিছু জিজ্ঞাসা ক'রে থাকবে, কিন্তু আমার চিন্তার গতির জন্যেই এই মানেটা ক'রে আর আমি কিছু বলতে সাহস করলাম না। যেদিকে যাচ্ছিলাম, সেইদিকেই হাতটা বাড়িয়ে ইঙ্গিত করলাম—আমি ওর পথেই চলব। মনে হ'ল, ও যখন মনের অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখতে পাচ্ছে, তখন প্রবঞ্চনার চেষ্টা করা কেন ? তার পর চলেছি ; কত দিন যে চলেছি, প্রথম প্রথম হিসেব রাখলেও কয়েক দিন পর থেকে আর রাখতে পারি নি, চেষ্টাও করি নি বোধ হয়। দিনের পর রাত এসেছে, রাতের পর দিন ; আমরা চলেছি, এমন একটা ব্যস্ত অধীরতার সঙ্গে যেন বিশেষ কোথাও একটা পৌঁছতে সামান্য বিলম্ব হয়ে গেলে আমাদের সমস্ত যাত্রাটাই

মাটি হয়ে যাবে। উৎকট ঔৎসুক্যের জন্যই হোক বা যে-জন্যেই হোক, এক-একবার মনে হ'ত খুব সুদূরের বাঁশির অতি ক্ষীণ সুরের মত কি একটা কানে এসেই মিলিয়ে গেল, কিংবা অতি দূরের একটা গন্ধের রেশ—যেন এই তরঙ্গায়িত, শ্রেণীর পর শ্রেণীবদ্ধ গিরিস্তূপের কোন্ সুদূর প্রান্তে একটা মহোৎসবের আয়োজন হচ্ছে—তারই আসরে সুর বাঁধার এই ছিন্ন সংগীত, তারই জন্য সুগন্ধি সমাবেশের এই খণ্ডিত আভাস। কত উপত্যকা, অধিত্যকা পেরিয়ে, পর্ব্বতের চূড়ার পর চূড়া ডিঙিয়ে আমরা চলেছি। খর্ব্ব এক রকম ঘাসের স্তর পেরিয়ে ঝাউয়ের স্তরে পড়লাম, সেটা পেরিয়ে প্রথম তুষারের দেশে সবুজ মখমলের মত এক রকম উদ্ভিদ, মাঝে মাঝে নেমে আবার পরিচিত অপরিচিত উদ্ভিদের স্তরে। বাঁধার হাঙ্গাম নেই, আহার মাত্র ফল-মূল, কখনও কখনও কোন লতাপাতার রস। সবগুলোই যে সুস্বাদ তা নয়, তবে সবগুলো থেকেই যে শক্তি পেয়েছি, এ কথা অস্বীকার করতে পারি না। বিশ্রাম করতে পেরেছি অতি অল্পই, একটানা তিন ঘণ্টার বেশি যে কখনও নিদ্রা দিতে পেরেছি ব'লে মনে হয় না—অবশ্য সূর্য্য বা চন্দ্র যতটুকু দেখতে পেতাম, তারই আন্দাজে বলছি; কিন্তু কখনও ক্লান্ত হই নি। শেষে আমরা একদিন আমাদের পথের উচ্চতম জায়গাটিতে একটা ঘন বরফের অধিত্যকায় এসে পৌছলাম, তার পর শুধুই নামতে আরম্ভ করলাম। আবার সেই সবুজ মখমলের মত উদ্ভিদ, তার পর ঝাউ, তার পর বেঁটে খড়ের বন, কিন্তু তার পর যখন অনেক রকম গাছের সংস্থানে ঘন জঙ্গল আশা করছি তখন এক দিন সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে এসে পড়লাম অত্যন্ত একটা রুক্ষ দেশে—না আছে একটি জলের ধারা, না আছে একটি সবুজের রেখা, যেন একটা প্রকাণ্ড পোড়া মাটির নরম তাল সমস্ত নিশ্চিহ্ন ক'রে ওপর থেকে নামতে নামতে কয়েকটা ঢেউ তুলেই হঠাৎ কঠিন হয়ে গেছে। এইখানে এসে আমাদের যাত্রা শেষ হয়ে গেল।

শৈলেন চুপ করিয়া বালিশে এলাইয়া পড়িল। তারাপদ সিগারেট খাইতেছিল, হাতটা বাড়াইয়া বলিল, এবার দাও।

তিন জনেই প্রবল আপত্তি করিয়া উঠিল। অক্ষয় বলিল, বাঃ, শেষ হয়ে গেল! এত দূর বন জঙ্গল নদী বরফ পার করিয়ে এনে তুমি আমাদের এই আঘাটায় তুলে ছেড়ে দেবে নাকি? আর কিছু না হোক মনগড়াও দু-একটা বিস্ময়ের নমুনা—

শৈলেন সিগারেটের ধুঁয়া ছাড়িয়া বলিল, প্রথম বিস্ময় হ'ল, এই রুক্ষ প্রাকৃতিক দৃশ্য থেকে এক সময় দৃষ্টিটা কাছে ফিরিয়ে নিয়ে এসে দেখি আমি সঙ্গিহীন।

সকলেই একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, আশ্চর্য্য!—সে কি!

শৈলেন বলিল, অবস্থাগতিকে বোধ হয় স্মৃতিবিভ্রম ঘ'টে থাকবে। তাই আমার যা তখন সব চেয়ে আশ্চর্য্য ব'লে মনে হয়েছিল তা এই যে, আমি কি ক'রে ভাবলাম যে আমার একজন সঙ্গী ছিল? ছিল না তো কেউ। গভীর নিদ্রার পর ক্লান্তির মত আমার সমস্ত শরীর মন থেকে যাত্রাপথের যা কিছু সবই যেন মুছে গিয়ে খুব অস্পষ্ট একটা স্মৃতিমাত্র অবশেষ রইল। মনে স্পষ্ট শুধু এই রইল যে, আমি এখানে রয়েছি। ভয়ের বদলে একটা পুলক-রোমাঞ্চ আমার শরীরে ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলে আমায় কোন্ এক ঊর্দ্ধলোকে যেন তুলে ধরলে। বেশ বুঝলাম, এইবার পট উঠবে। সেই সুরের তরঙ্গ, সেই শত পুষ্পসারের গন্ধ আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। তাদের উৎসের সন্ধানে আমি সব শক্তিকে নিয়োগ ক'রে দিলাম। জ্যোৎস্না-পক্ষ অনেক দিন থেকেই চলছিল, সেই শুকনো মাটির ঢেউ ভাঙতে ভাঙতে আমি এগিয়ে চললাম, এইটুকু জ্ঞান আছে—ক্রমাগত নেমেই চলেছি, তার পর আকাশে স্বচ্ছ চাঁদ যখন প্রায় পশ্চিমে হেলে পড়েছে, সেই সময় মনে হ'ল, বাড়ি ছাড়ার পর থেকে আজ পর্য্যন্ত পথ চলার যত ক্লান্তি যেন আমার ঘাড়ে একসঙ্গে চেপে এল; একটা চাতালের ওপর দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি, সেইখানেই অবসন্ন দেহে শুয়ে পড়লাম।

—জানি না তার পরের দিনের কথা, কি আরও দু-দিন পরের কথা—যখন ঘুম ভাঙল দেখলাম, পূর্ব্ব দিকে প্রথম উষার অস্পষ্ট আলো দেখা দিয়েছে। সেই ক্ষীণ আলোতেই সামনে যা দেখলাম তাতে বিস্ময়ে আনন্দে আমার সমস্ত মন আচ্ছন্ন হয়ে গেল। কেন্দ্র থেকে চারি দিকে প্রায় চার পাঁচ

মাইলের দূরত্ব নিয়ে একটা বিশাল উপত্যকা। চারি দিকে পাহাড় ধাপের পর ধাপে উঠে গেছে—গোড়ায় ঘন জঙ্গলের আবরণে নীল, তার পর সেই নীল স্তরে স্তরে ফিকে হতে হতে শেষ রেখায় গিয়ে বরফের রূপালিতে মিলিয়ে গেছে। সূর্য্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে যেমন সেই রূপালির গায়ে সোনার জলের প্রলেপ পড়ল, নীচের তরাইও অমনি ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। তার পর চোখের সামনে যা একে একে ফুটে উঠতে লাগল, তাকে দৃশ্য বলব, কি কাব্য বলব বুঝে উঠতে পারছি না। কাব্যই—উদীয়মান সূর্য্যের এক এক ঝলক কিরণে সেই কাব্যের এক-একটা পাতা যেন আমার চোখের সামনে উল্টে যেতে লাগল। একটা ছোট গণ্ডীর মধ্যে অত বিচিত্র রঙের সমারোহ আমি জীবনে কখনও দেখি নি। কত ফুল—রাঙা, হলদে, সাদা, নীল, বেগুনে—রঙের আর ইয়ত্তা নেই, স্তবকের পর স্তবক চলেছে তো চলেছেই। দূরে অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে, আবার সূর্য্যের বর্দ্ধমান তেজ সেগুলোকে জাগিয়ে তুলছে। কত বিচিত্র লতাগুল্ম, গাছপালা—তাদের সবুজটা গাঢ় আর ফিকে রঙের উঁচু-নিচু পর্দ্দায় যেন একটা অপূর্ব্ব সংগীতের সৃষ্টি করেছে।...ভোরের প্রথম দিকেই এক সময় তারাইয়ের সুপ্তি চকিত ক'রে কোথায় একটি মাত্র পাখীর কণ্ঠস্বর উঠল। ঠিক যেন মনে হ'ল, মূল গায়েন গানের প্রথম কলিটা ধরিয়ে দিলে, তার পর একসঙ্গেই উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিমের সমস্ত কোণকান থেকে হাজার হাজার পাখীর কাকলি সমস্ত তরাই সুরে সুরে ভরাট ক'রে দিয়ে পাহাড়ের অলিগলি বেয়ে বাইরে ছুটে চলল। একটা হাওয়া উঠেছিল, পাখীদের এই সমতানকে দুলিয়ে, খেলিয়ে, গাছে গাছে রঙের ঢেউ তুলে, একটা অদৃশ্য স্রোতের মত পাহাড়ের দেয়ালে দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে ঘুরতে লাগল। সবার ওপর সেই মিষ্ট গন্ধ—অপূর্ব্ব, কল্পনা করা যায় না যে একই বায়ুস্তরে একই সময়ে এত বিচিত্র গন্ধ ঠাসাঠাসি ক'রে থাকতে পারে, সবুজটাকে সুর বলেছি, এ যেন আরও সূক্ষ্মতর এক সংগীত।...বিস্ময়ের মধ্যেই এক বার মনে পড়ল, যত দিন চলেছি তাতে তো এটা ভরা বসন্তই হওয়া উচিত, ফাল্গুনের শেষ কি চৈত্রের আরম্ভ; কিন্তু যত বসন্ত কি হিমালয়ের এই একটি তরাইয়ের মধ্যে গাদাগাদি ক'রে আসতে হয়! আর এ কি

হিমালয়? নাগরাজের সে পৌরুষ গাম্ভীর্য্য কোথায়? এতটা পথ এলাম, এ হাল্কা রূপ তো কোথাও দেখি নি—এ যেন এক সুরনর্ত্তকী তার হাস্যে-লাস্যে, সাজসজ্জায়, বিলাস-বিভ্রমে ধ্যানমগ্ন যোগিবরের—

—বেশ মনে পড়ে, যখন চিন্তার ঠিক এই জায়গাটিতে, আমার দৃষ্টি হঠাৎ সামনের একটা দৃশ্যের ওপর আটকে গিয়ে আমি নিশ্চল স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

—বহুদূরে তরাইয়ের পশ্চিম দিকে, উঁচু একটা চাতালের ওপর পূর্ব্বাস্য হয়ে ধ্যানরত এক বিরাট মূর্ত্তি। তাঁর পদ্মাসনবদ্ধ উন্নতশরীরের ওপরের দিকটা আচ্ছন্ন ক'রে দীর্ঘ জটাভার, বায়ুচালিত লতার মতই ফণীর দল তাঁর বিরাট শরীরের ওপর মসৃণ গতিতে চ'লে বেড়াচ্ছে; এক এক সময় যেন শত শত ক্রুদ্ধ ফণায় উচ্ছ্বসিত,—সূর্য্যের কিরণে সমস্ত দেহ উজ্জ্বল শ্বেতাভ—এমন ভাবে কিরণ-পুঞ্জ এসে পড়েছে যে, একটু বেশিক্ষণ দৃষ্টিটাকে ধ'রে রাখলেই মনে হয় যেন ধাঁধা লেগে গেল।

—আমি এক মুহূর্ত্তেই বুঝে গেলাম, ব্যাপারটা কি। আমার সমস্ত মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে একটা বিদ্যুতের প্রবাহ খেলে গেল। তার পরে আমার যে অভিজ্ঞতা, সেটা যে চৈতন্যের কোন্ স্তরের তা আমি ঠিক ক'রে বলতে পারি না। আমার দু-দিন থেকে উপোস যাচ্ছিল,—এক পাতার রস খাওয়া ছাড়া সেই সমস্ত দিনটাও কিছু খাই নি। শুধু ব'সে ব'সে অপলক নেত্রে দেখে গেছি—জেগে, কি তন্দ্রায়, কি গাঢ় ঘুমের স্বপ্নে, কি মনের আরও গভীরতম কোন অজ্ঞাত চেতনার স্তরে, কিছুই বলতে পারব না। শুধু দেখলাম, দিন আর একটু অগ্রসর হতে নটরাজের নাট্যশালার আর একটা পট উঠল। সেই বসন্ত, যার কাছাকাছিও কিছু একটা কেউ পৃথিবীতে কখনও দেখে নি, সেটা রূপে, শব্দে, গন্ধে আরও যেন শতগুণ মদির হয়ে উঠল। ক্রমে নেশার মত একটা অনুভূতি সমস্ত ইন্দ্রিয়কে অবশ ক'রে ফেলতে লাগল—মনে হ'তে লাগল, এই বসন্তই সত্য আর সব কিছু মিথ্যা, মনের শত নিষ্ঠা দিয়ে জীবনে যা-কিছু অর্জ্জন করেছি সবই যেন অক্লেশে ফাগুনের এই অনন্ত শিখায় আহুতি দেওয়া যায়। সব সাধনার, সব তপস্যার—সেই যেন চরম সার্থকতা। চিন্তার মধ্যেই আর একটা আশ্চর্য্য

ব্যাপার ঘটল। পূবের পাহাড়ের সোনা-রূপার ওপর দিয়ে সূর্য্যের যে কিরণ এসে পড়ছিল, সেইগুলোই বিভিন্ন ভাবে প্রতিফলিত হওয়ার জন্যেই হোক বা আমার দৃষ্টিবিভ্রম হোক, অথবা দুটোর মিলিত পরিণতিই হোক, এক সময় মনে হ'ল উর্দ্ধে কোথা থেকে আলোর পথ বেয়ে কারা সব নেমে এসে সেই তপস্যা-বেদীর চারি দিকটা ফেললে ঘিরে, আর সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হ'ল তাদের বিলাসোচ্ছল নৃত্য। যা ছিল পাখাদের কাকলি মাত্র, সুরে সুরে ঘনীভূত হয়ে তারই একটা অংশ যেন এক অপার্থিব সংগীতে রূপান্তরিত হয়ে উঠল। সব চেয়ে আশ্চর্য্য এই যে, আয়োজনের এই পূর্ণতার মধ্যেও কোথায় একটা কি অভাবের সুর ঘনিয়ে উঠতে লাগল,—একটা অব্যক্ত যাতনা, একটা চাপা হাহাকার। বহুক্ষণ ধ'রে চলল, আমারও মাথার মধ্যে একটা ঘূর্ণি জেগে উঠছে। দিন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, আলো উজ্জ্বলতর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রঙের রাশি হয়ে উঠছে আরও তীক্ষ্ণ,—যেন তরাইয়ের শেষ পুষ্পকলিটি পর্য্যন্ত কিসের তাড়ায় তাড়াতাড়ি ফুটে উঠছে, সংগীত হয়ে উঠছে আরও উচ্ছল, হওয়া মদিরতায় আরও বিহ্বল,—বেশ বোঝা যাচ্ছে সবগুলোই একটা ক্লাইম্যাক্সের দিকে মত্ত গতিতে এগিয়ে চলেছে,—লয় ক্রমশই দ্রুত করতে করতে সংগীত যেমন শেষতম সমের পানে ছুটে চলে।

—তার পর, দুপুরের একটু পরেই এই রহস্যময় মাদকতা যখন শেষ সীমায়, হঠাৎ যোগীর ধ্যানভঙ্গ হ'ল। সব গেল বদলে, বাতাসের গতিটা পর্য্যন্ত। এতক্ষণ ছিল দক্ষিণপ্রবাহী, হঠাৎ মূর্ত্তির পেছন থেকে গিরিসঙ্কট বেয়ে আগুনের হালকার মত একটা বায়ুস্রোত ঢুকে পড়ল। একটা বিকট ঝম্-ঝম্-ঝম্ শব্দ, তার পরেই সেকেণ্ড-কয়েকের জন্যে সমস্ত তরাইটা স্তব্ধ হয়ে গেল, সব যেন একটা উৎকট ভয়ে আঁতকে উঠছে। এর পরেই যা আরম্ভ হ'ল, তাকে মদনভস্মের পুনরভিনয় ভিন্ন আর কিছুই বলা চলে না। প্রথমেই সেই মূর্ত্তিটা মাথার জটা ফুলিয়ে, গায়ের আভরণ ফণিদলকে ত্রস্ত ক'রে উগ্র দৃষ্টিতে জেগে উঠল। আর, শুধু এক দক্ষিণ দিক ছাড়া সব দিক দিয়েই সেই রকম আগুনের হালকার মত স্রোত ঢুকতে লাগল—পাহাড়ের অলি-গলি যেখানেই একটু পথ পেলে সেখান দিয়েই। ক্রমে

চারিদিককার হাওয়ার সংঘর্ষে, তাণ্ডব নাচে ভূতনাথের সঙ্গীদলের মতই, ঘূর্ণির পর ঘূর্ণি। সেও নিশ্চয় এই চৈতালী ঘূর্ণিই, কেন না, আগেই বলেছি, আমি যা দেখছিলাম সেটা ফাগুন-শেষের বা চৈত্র-আরম্ভের ব্যাপার ;— চৈতালী ঘূর্ণিই, কিন্তু তার কাছে এ ঘূর্ণি শিশুমাত্র। গাছ উপড়ে, ফুলে-ভরা গাছের ডালগুলোকে লুফতে লুফতে প্রলয় হুঙ্কারে সমস্ত তরাইটা ওলটপালট ক'রে ফিরতে লাগল। ধূলোয় দিগন্ত হয়ে এল অন্ধকার, ডাল-পাতার সংঘর্ষে পাহাড়ের কোলে দাবাগ্নি জ্ব'লে উঠে সেই ধূলোকে গৈরিকে রাঙিয়ে আগুনের মতই উত্তপ্ত ক'রে তুললে। সূর্য্যও হয়ে উঠল প্রলয়ের সূর্য্যের মতই প্রখর। চারিদিকে পাহাড়ে ঘেরা সেই প্রকাণ্ড তরাইয়ের গহ্বরে একটা হুঙ্কার গর্জ্জে ফিরতে লাগল—সংহার —সংহার—শুধুই সংহার। তার সঙ্গে মিশল ধ্বংসের হুতাশ, মৃত্যুর আর্ত্তনাদ। একটা দিন যার প্রভাত ছিল এত অপরূপ সুন্দর, অপরাহ্ণে সেটা অকস্মাৎ এত বিকট হয়ে উঠতে পারে কল্পনাও করা যায় না।

—ক্রমে ঘূর্ণির ধূলো-বালির সঙ্গে পোড়া জঙ্গলের ছাই মিশে তরাইটাকে লুপ্ত ক'রে সূর্য্যকে নিষ্প্রভ ক'রে আনলে। মাতুনি আরও বেড়েই চলল। ঘূর্ণিতে গাছের জ্বলন্ত শাখা ঘোরাতে ঘোরাতে ধ্বংসের অট্টহাসের সঙ্গে চারিদিকে অগ্নিবৃষ্টি ক'রে ঘুরতে লাগল, মাঝে মাঝে দৃশ্য আরও বীভৎস—শূন্যে জ্বলন্ত শাখার সঙ্গে ফুলের শাখার জড়াজড়ি— চাপা আর্ত্তনাদের সঙ্গে ফুলের স্তবক দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠে মুহূর্ত্তে এক মুঠো ছাই হয়ে ধুঁয়ায়-ভরা আকাশে মিলিয়ে গেল। বিনষ্টতপা শঙ্করের তৃতীয় নয়নের আগুন পঞ্চশরের শেষ চিহ্নটি পর্য্যন্ত ভস্মীভূত না ক'রে তৃপ্ত হবে না।

—কখন সূর্য্যাস্ত হ'ল বোঝা গেল না, ধূলো আর ধোঁয়ার সঙ্গে কখন যে মেঘ এসে মিশে গেছল তাও টের পাই নি। এক সময় বৃষ্টি নামল— বোধ হয় সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পরেই।

শৈলেন চুপ করিল। আর তিন জনেও খানিক্ষণ চুপ করিয়াই রহিল ; তাহার পর অক্ষয় একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া বলিল, আশ্চর্য্য !

শৈলেন বাহিরের দিকে চাহিয়াছিল, তাহার পানে দৃষ্টি ফিরাইয়া প্রশ্ন করিল, কোন্‌টে?

অক্ষয় উত্তর করিল, কোন্‌টে নয়? সেই মঠধারী; তার আবির্ভাব, তিরোভাব—দুই-ই। সেই ধ্যানমগ্ন বিরাট মূর্ত্তি, যা শেষে অমন ক'রে প্রলয়ে মেতে উঠল—

অশ্বিনী কথাটা কাড়িয়া লইয়া বলিল, এমন কি সেই খণ্ডপ্রলয়ের মধ্যেও তোমার অক্ষত থাকাটা পর্য্যন্ত—

শৈলেন বলিল, তোমরা যে অর্থে আশ্চর্য্য বলছ তার কিছুই নয়, তবে অসাধারণ বটে, বিশেষ ক'রে সমতলবাসী বাঙালীর দৃষ্টিতে। রাতটা আমি সেইখানেই কাটালাম—আশ্রয় খোঁজাখুঁজি করবার ইচ্ছা বা উৎসাহ কিছুই ছিল না। সকালে পিছন দিকের একটা সঙ্কীর্ণ পথ দিয়ে নেমে যখন তরাইয়ের কোলে এলাম, দেখি রঙ-বেরঙের-কাপড়-পরা স্ত্রী-পুরুষের দল তরাই ছেড়ে ফিরে যাচ্ছে। এক নূতনতর কৌতূহলে নিজেকে পাহাড়ের আড়ালে রেখে রেখে আমি এগিয়ে গেলাম। দেখলাম, অধিকাংশই সব যুবক আর যুবতী, কচিৎ এক-আধটা প্রৌঢ়, বৃদ্ধ নেই—একটু তিব্বতীঘেঁষা চেহারা হ'লেও সব অপূর্ব্ব সুন্দর। আর দেখলাম সকলেই সেই মহাশ্মশানের এক-এক মুঠো ছাই সংগ্রহ ক'রে নিয়ে যাচ্ছে।

তারাপদ প্রশ্ন করিল, ছাই!

শৈলেন বলিল, ছাই। বুঝতে পারছ না? আমাদের দেশের দোল-পর্ব্বের ঠিক বিপরীত একটা পর্ব্ব, একটা বাৎসরিক অনুষ্ঠান; যে মদন নিত্যই যুব-হৃদয়ে পঞ্চশরের আগুন জ্বালছে, তার বিরুদ্ধে শঙ্করের রোষাগ্নিপূত রক্ষা-কবচ।

—তারাও সবাই অক্ষত দেখে আমি একবার চারিদিকে চেয়ে দেখলাম। দেখি, এই বিরাট নাট্যশালার একটা অডিটোরিয়াম বা প্রেক্ষাগৃহ আছে—প্রেক্ষাপ্রাঙ্গণ বললে আরও ঠিক হয়। তার অসাধারণত্ব এইখানে যে সেটা কলকাতা বা অন্য কোন জায়গার একটা সাধারণ অডিটোরিয়ামেরই মতন। রুক্ষ, কঠিন-হয়ে-যাওয়া গলা পাথরের পাহাড়টা সিঁড়ির মত থাকে থাকে ওপর দিকে উঠে গেছে, মাঝে মাঝে কতকটা ব্যালকনির মতনই এক

একটা অংশ সামনের দিকে ঠেলে এসেছে। তার ওপর থাকলে নিচের ধাপগুলো চোখের আড়ালে প'ড়ে যায়। বুঝলাম, আমি খুব উঁচুতে এই রকম একটা ব্যালকনিতে আশ্রয় পেয়েছিলাম। আমার বা আমাদের গায়ে যে আঁচড় লাগে নি, তার কারণ আগেই বলেছি—ঘূর্ণিগুলো এক দক্ষিণ দিকটা ছেড়ে আর সব দিক দিয়েই এসেছিল—স্বভাবতই ধ্বংসলীলাটাও অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই দিকটা বাদ দিয়েই। সেটার মধ্যে আশ্চর্য্য কথা তো দূরে থাক্, অসাধারণত্বেরও কিছু নেই—নিতান্ত ভৌগলিক ব্যাপার—হিমালয় এবং তিব্বতের সংস্থান আর আদিম ইতিহাসটা জানলেই সবটা পরিষ্কার হয়ে যাবে ; একটু পরে বুঝিয়ে দিচ্ছি। এখন শুধু জেনে রাখ যে, আমি যেখানটায় গিয়ে পৌঁছেছিলাম সেটা হিমালয়ের শেষ প্রান্ত।

—এবার তোমার দ্বিতীয় আশ্চর্য্যের কথা। তরাই যাত্রীশূন্য হ'লে সেই মূর্ত্তির দিকে এগুতে আরম্ভ করলাম—

অক্ষয় বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, মূর্ত্তি ছিল তখনও ?

শৈলেন উত্তর করিল, প্রায় দেখা যায় পাহাড়ের গা থেকে একটা অংশ ঠেলে এসে একটা জীব, জন্তু বা মানুষের আকারে দাঁড়িয়ে বা ব'সে থাকে। কত যুগ ধ'রে উত্তরায়ণের সঙ্গে তিব্বতের হাওয়া তেতে উঠতে যে ঘূর্ণির সৃষ্টি হয়ে এসেছে, সেই সব ঘূর্ণি বালির উকো দিয়ে এই রকম একটা ঠেলে-আসা পাথরের গায়ে খাঁজখোঁজ তৈয়ের ক'রে একটা আসনবদ্ধ মানুষের মূর্ত্তি সৃষ্টি ক'রে ফেলেছে। পাহাড় অঞ্চলে খুবই সাধারণ একটা দৃশ্য—বিশেষ যেখানে ঝড়ের প্রাবল্য আছে। সমস্ত বৎসর ধ'রে এই মূর্ত্তির কোণ-কানে কোন বিচিত্র রঙের লতাপাতা জন্মে সমস্ত মূর্ত্তিটাকে—

অক্ষয় একটু নিরাশ হইয়াই বলিল, এই পর্য্যন্ত থাক্।

তারাপদ, এমন কি অশ্বিনীর মত অবিশ্বাসীও এই বিরতিতে আপত্তি করিল না। তিন জনেই বাইরের তপ্ত প্রকৃতির পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। যেন অন্তরে যে সুরের প্রবাহ, তাহাকে নষ্ট না হইতে দিয়া বাহিরে তাহার সংগত খুঁজিতেছে।

শুধু শৈলেনের মুখেই একটা মৃদুহাস্যের জের কোথায় যেন লাগিয়া রহিল।

(বিভূ-শ্রেষ্ঠ)—৮

শ্যামল-রাণী

১

মিত্তিরদের মেয়ে সুধা আজ বছর দুই পরে বাপের বাড়ি আসিল। গিয়াছিল যখন—একা। আজ পালকি হইতে নামিল, কোলে ননীর পুতুলের মত একটি শিশু। সাত বছরের ছোট বোন শৈল আহ্লাদের চোটে হাততালি দিয়া উঠিল, দিদিকে ঠিক ওপর-ঘরের পটের গণেশ-জননীর মত দেখতে হয় নি মা, যেটা নতুন টাঙানো হয়েছে? না গো বউদি?

সুধা মাকে আর ভাজকে প্রণাম করিয়া হাসিয়া বলিল, গণেশ-জননীর মা তবুও বছরের শেষে একবার ক'রে তাঁর মেয়েকে—

গলা ভারী হইয়া গেল, চোখ ডবডব করিয়া উঠিল, ঠোঁটে হাসিটা কিন্তু লাগিয়াই রহিল। বাপের বাড়ি আসার মিশ্র অনুভূতি, একটুতেই হাসি ধৌত করিয়া অশ্রু উছলিয়া উঠে।

খোকাকে বুকে লইয়া, চুমা খাইয়া, মা আঁচলে চোখ দুইটা মুছিয়া বলিলেন, মার কি অসাধ বাছা? যা সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পারে দিয়েছি! তারপর, ভাল ছিলি সুধা? ওমা, এটা কি চমৎকার হয়েছে গো! ছেলেবেলাতে তুই ঠিক এই রকমটি ছিলি, বেশ মনে আছে কিনা!

মেয়ের আবদারের সঙ্গে নূতন মায়ের গরবের সুর মিশাইয়া সুধা বলিল, তুমি তো বলবেই। আমি কিন্তু অমন দস্যি ছিলাম না বাপু, কক্ষনই না। আমায় তো নাজেহাল ক'রে দিয়েছে। সামলানো কি সোজা!

ভাজ ততক্ষণ খোকাকে লইয়াছে। একটু একান্তে ঠোঁট টিপিয়া বলিল, একটিতেই?

ননদ-ভাজের মধ্যে এক ধরনের চোখোচোখি হইয়া গেল।

শৈল খোকার দিকে হাত বাড়াইয়া বলিল, দাও আমার কোলে বউদি, আমি তো মাসী হই।

খোকাকে দিয়া বউদিদি হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ, ক্ষুদে মাসী।

সুধাও হাসিয়া উঠিল। ছোট ভাইপো মন্তু মার পিছনে আঁচল ধরিয়া অপ্রতিভভাবে দাঁড়াইয়া ছিল, আর পিসীর সহিত পটের গণেশ-জননীর সাদৃশ্য খুঁজিয়া হয়রান হইতেছিল; সুধা তাহাকে কোলে লইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, হ্যাঁরে খোকা, পিসীকে ভুলে গেলি? দেখছ মা, ছেলের বেইমানি? আর এই পিসী এক দণ্ড না হ'লে চলত না!

মন্তু ছুটিয়া পলাইয়া শৈলর কাছে গিয়া দাঁড়াইল এবং যাইতে যাইতে শিশুর দিকে চাহিয়া, নিজের মনোগত সমস্যার একটা মীমাংসা করিয়া লইয়া বলিল, খোকা ঠিক পটের গণেশের মত মোটা হয়েছে, না মেজপিসী?

খোকার মাসী চোখ দুইটা কপালে তুলিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, মার পানে চাহিয়া ভীত স্বরে বলিয়া উঠিল, শুনলে মা? খোকা নাকি গণেশের মত মোটা হয়েছে! এই বেস্পতিবারের বারবেলা ছেলেটাকে খুঁড়লে! ষাট ষাট!

তাহার রকমখানা দেখিয়া মা সুধা বউদিদি তিনজনেই হাসিয়া উঠিল।

সুধা বলিল, রোববারের সকাল একেবারে বেস্পতিবারের বারবেলা হয়ে গেল! ঠিক সেই রকম গিন্নী আছে শৈলী, না মা? বরং আরও বেড়েছে।

বউদিদি হাসিয়া বলিল, তোমার জায়গা দখল করেছে। বাড়িতে একটি থাকা চাই তো, নইলে গরু বেড়াল পায়রা এদের সংসার কে দেখবে বল?

দুই বৎসর পূর্ব্বে পর্য্যন্ত সেই ব্যাপার ছিল। আজ সে কথার উল্লেখে একটু লজ্জা করিয়া আসিল বটে, কিন্তু সুধা আগ্রহটাও দমন করিতে পারিল না; জিজ্ঞাসা করিল, পায়রাগুলো বিদেয় ক'রে দিয়েছ

নাকি মা? পুসীটার এবারে কটা ছানা হ'ল? আর শ্যামলী? তার বাছুরটা কেমন হ'ল? যাক, একটা সাধ মিটবে এবার, শ্যামলীর দুধ খেয়ে যাব। ভাবতেও কি রকম হয়, না মা? এই সেদিনকার শ্যামলী, এতটুকু বাছুর, বাড়ি এল—সিঁদুর হলুদ দিয়ে গোয়ালে তোলা হ'ল, আর আজ তার নিজেরই বাছুর!

বউদিদি যেন ওত পাতিয়া ননদের কথাগুলি শুনিতেছিল, এই পর্য্যন্ত আসিলে একটু অর্থপূর্ণ হাস্যের সহিত সংক্ষেপে বলিল, ওই রকমই হয়।

বাড়িতে আসিয়া পড়িয়াছে। প্রবেশ করিতে করিতে সুধা আবদারে নালিশের সুরে বলিল, দেখছ মা, বউদিকে?

অল্পক্ষণ পরেই শ্বশুর-বাড়ির বউ-মানুষের ভাব আর মাতৃত্বের গাম্ভীর্য্য যাহা একটু লাগিয়া ছিল, সুধার দেহ-মন হইতে একেবারে অপসৃত হইয়া গেল। জামা কাপড় ছাড়া, বাক্সপত্তর গোছানো সব ভুলিয়া সে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পুসীটাকে প্রথমে তল্লাস করিয়া বাহির করিল, এক আঁজলা চাল উঠানের মাঝখানে ছড়াইয়া দিতেই পায়রাগুলি ঝাঁকে ঝাঁকে নামিয়া বকবকুম আওয়াজ করিয়া ভোজের মধ্যে সংস্কৃত-উদ্গারী পণ্ডিতদের মত এক মহাসমারোহ লাগাইয়া দিল। সুধা তাহাদের সামনে রকে পা ছড়াইয়া বসিয়া পুসীকে কোলে চাপড়াইতে চাপড়াইতে সুর করিয়া ছড়া কাটিতেছিল—

সারা ভারত বাড়ি বাড়ি ষষ্ঠী-ঠাকুর ব'য়ে
একেবারেই হ'ল পুসীর সাতটা ছেলেমেয়ে ;
বর দাঁড়াল শাপে গিয়ে, অন্ন দেওয়া ভার—

এমন সময় বোনপোকে টহল দেওয়াইয়া শৈল আসিয়া উপস্থিত হইল, পিছনে পিছনে দুইটি বেড়ালছানা, সুধার কাছে পরিচয় করাইয়া দিল, পুসীর ছানা; একটি শেয়ালের পেটে গেছে, তবুও কি একবার ঘুরে দেখে! মুয়ে আগুন মায়ের, ওকে আর আদর ক'রো না, দু চক্ষের বিষ। মা ষষ্ঠী কি দেখে যে ওকে দেন অতগুলো ক'রে। হ্যাঁ দিদি, এই ছেলে হ'ল তোমার দুষ্টু?

খোকার মাথাটা নিজের কাঁধে চাপিয়া চাপড়াইতে চাপড়াইতে বলিল, এমন ঠাণ্ডা ছেলে এ তল্লাটে দেখাক দিকিন কেউ! বাছা আমার 'মাসী' বলতে অজ্ঞান।

মা, বউদিদি, সুধা তিনজনেই হাসিয়া উঠিল। সুধা বলিল, আচ্ছা মা, পাঁচ মাসের একটা শিশু, সে ওকে কখন 'মাসী' বললে বল দিকিন? আবার বলতে অজ্ঞান হয়ে গেল!

মা বলিলেন, মাসী হয়ে ওই জ্ঞানরহিত হয়েছে, কি যে করবে, কি বলবে—

শৈল তাহার মাসীত্ব লইয়া এমন ব্যাখ্যানায় অপ্রস্তুত হইয়া খোকাকে রকে বসাইয়া দুড়দুড় করিয়া পলাইতেছিল। দুয়ারের নিকট হইতে হঠাৎ ছুটিয়া আসিয়া সন্ত্রস্তভাবে বলিল, ও দিদি, শিগগির পুনীকে নামিয়ে খোকাকে কোলে নিয়ে ভব্যিসব্যি হয়ে ব'স; তোমার সই, সই-মা, ও-পাড়ার সতী-পিসী—একপাল সব দেখতে আসছে তোমায়; দাও নামিয়ে, দিলে?

সুধা ধীরে-সুস্থে বাটি হইতে এক মুঠা চাল উঠানে পায়রার ঝাঁকের উপর ছড়াইয়া দিয়া বলিল, ব'য়ে গেছে আমার; শ্বশুর-বাড়ির কনে-বউ নাকি?

২

গাড়িতে সমস্ত রাত্রি জাগার জের, বিকাল হইয়া গেলেও সুধা অঘোরে নিদ্রা দিতেছিল। শৈল হন্তদন্ত হইয়া আসিয়া তাহাকে ঠেলিয়া উঠাইল, ও দিদি, শ্যামলী ফিরে এসেছে, তার বাছুর দেখসে; কি চমৎকার যে হয়েছে, এ তল্লাটে অমন বাছুর কেউ যদি—

মা ধমক দিয়া উঠিলেন, না, এ তল্লাটে যা-কিছু এক তোদেরই আছে। দেখ দিকিন, সমস্ত রাত ঘুমোয় নি মেয়েটা, মিছিমিছি এসে তুললে!

শৈলর মনে দিদির আর খোকার আসার সঙ্গে সঙ্গে কোথা হইতে

একটা তোড় নামিয়া গিয়াছে; কিন্তু সেটা যেন নিজের বেগেই সব জায়গায় ধাক্কা খাইয়া মরিতেছে। উৎসাহের মুখে মার নিকট ধমক খাইয়া বেচারী সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল, দিদির কথায় আবার সামলাইয়া উঠিল। উঠিতে উঠিতে সুধা হাসিয়া বলিল, ভাগ্যিস শৈলী তুললে মা! স্বপ্ন দেখছিলাম, খোকাকে না দেখে শ্বশুরের যেন ভীমবতি দাঁড়িয়ে গেছে; এসে বলছেন, এক বছর হয়ে গেল বউমাকে পাঠিয়েছি; কতদিন আর রাখা চলে? যাবেনই নিয়ে, তোমরা হাতে ধ'রে কাকুতি-মিনতি ক'রে বলছ, এই মোটে আজ সকালে এসেছে বেই-মশাই—। কে শোনে? সেজে-গুজে কাঁদতে কাঁদতে বেরুচ্ছি, এমন সময় শৈলী—

শৈল চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া একেবারে তদ্গত হইয়া শুনিতেছিল; উল্লাসে হাততালি দিয়া নাচিয়া উঠিল, দেখ, কেমন আমি দিদিকে বাঁচিয়ে দিয়েছি; যদি না—

তাহার পর সবার হাসিতে নিজের ভুলটা বুঝিতে পারিয়া, একেবারে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া দিদির কোলে মিশিয়া গেল।

সুধা বলিল, ওঠ্, দেখিগে চল্।

নামিতেই খোকা জাগিয়া উঠিল। দেখেছ? ওর টনক নড়ে, কোথাও যদি এক পা যাবার জো আছে!—বলিতে বলিতে খোকাকে তুলিয়া লইল, ভাজের দিকে চাহিয়া বলিল, বউদি, তুমিও এস ভাই।

হাতের পাটটা সেরে আসছি, তুমি এগোও।—বলিয়া সে পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

শ্যামলী গোয়ালঘরে তৃপ্তির গাঢ় নিশ্বাসের সঙ্গে জাবনা খাইতেছিল, আর মাঝে মাঝে মুখ তুলিয়া সামনের খোলা জায়গায় চঞ্চল উৎক্ষিপ্যমান বৎসটির পানে চাহিয়া এক-একটি হ্রস্ব অথচ গভীর আওয়াজ করিয়া নিজের বাৎসল্য-স্নেহ প্রকাশ করিতেছিল। সুধা সামনে আসিয়া বলিল, কি লা শ্যামলী, চিনতে পারিস? ওমা, কত বড়টা হয়ে গেছে গরুটা!

শ্যামলী নাদা হইতে ঘাড়টা বাহির করিয়া জাবনা চিবাইতে চিবাইতে প্রশ্নকর্ত্রীর পানে একটু চাহিল, তাহার পর হঠাৎ মুখনাড়া বন্ধ

করিয়া দুই পা আগাইয়া আসিয়া সুধার ডান হাতটা সুদীর্ঘ টানের সঙ্গে চাটিতে আরম্ভ করিয়া দিল। বুকের নিকট হইতে একটা অব্যক্ত ভরাট আওয়াজ বাহির হইয়া আসিতে লাগিল, এবং প্রবল নিশ্বাসে মুখের উপরের জাবনার কুটাকাঠিগুলা সুধার শাড়ির উপর উড়িয়া সাঁটিয়া যাইতে লাগিল।

খানিকক্ষণ জিবের আঁচড় সহ্য করিয়া সুধা সুড়সুড়িতে ঘাড়টা কুঞ্চিত করিয়া বলিল, ওরে থাম্, বাছুর চেটে তোর যা জিব হয়েছে, আমার এক পর্দ্দা চামড়া উঠে গেল! দেখ কাণ্ড, আবার খোকাকে চাটতে যায়!

হাসিয়া দুই পা পিছাইয়া গেল। শ্যামলী ব্যগ্রভাবে একবার দড়িতে টান দিয়া ঘাড়টা নাড়িয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে বাছুরটার উপর নজর পড়ায় 'ম্বা' করিয়া ডাক দিয়া উঠিল এবং বাছুরটা ছুটিয়া আসিলে কিছুক্ষণ আগন্তুকদের ভুলিয়া সপ্রেমে তাহার গাটা ঘন ঘন একচোট চাটিয়া দিয়া আবার সুস্থির হইয়া দাঁড়াইল।

শৈল চোখ মুখ কৌতুকে বোঝাই করিয়া বাছুরের সৌন্দর্য্য ব্যাখ্যান করিতে যাইতেছিল, দুই-একটা কথা বলিয়া দিদির দিকে চাহিতেই থমকিয়া গেল। দিদি ডান হাতের তর্জ্জনীটা গালে চাপিয়া, নিতান্ত বিস্ময়ে ঘাড় কাত করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল; বলিল, দেখলি শৈলী, কাণ্ডটা?

শৈল এমন কিছু কাণ্ড দেখিতে পায় নাই, যাহাতে দিদির এতটা ভাবান্তর হইতে পারে। প্রশ্ন করিতে যাইতেছিল, তাহার পূর্ব্বেই সুধা শুরু করিয়া দিল, দেখলি না ঠেকারটা? খোকাকে চাটতে দিলাম না, তা স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলে—তোমার খোকা আছে, আমার নেই? এই দেখ। কেমন ডাকলে, কেমন কোলে টেনে নিয়ে চাটতে লাগল! হ্যাঁলা শ্যামলী, গেরস্তকে এতদিনেও একটা নই-বাছুর দেওয়ার মুরোদ হ'ল না, উল্টে আমার সঙ্গে টেক্কা দিতে এলি! মুয়ে আগুন, ব্যাটা-বাছুরের আবার গুমোর কি লা? কি কাজে লাগবে? কদ্দিনই বা কাছে ধ'রে রাখতে পারবি? আমার এই সোনার চাঁদের সঙ্গে তুলনা হ'ল কিনা—

বউদিদি আর মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, বউদিদি হাসিয়া বলিল,—কি কথা হচ্ছে গো পুরনো সইয়ের সঙ্গে ?

দিদির কথাবার্ত্তা শুনিবার পর শৈল শ্যামলীর ব্যবহারে দিদির চেয়েও ক্ষুব্ধ ও বিস্ময়ান্বিত হইয়া গিয়াছিল, বড় বড় চোখ করিয়া আরম্ভ করিল, বললে পেত্যয় যাবে না মা, দিদির কোলে খোকাকে দেখে শ্যামলী ঠেকার ক'রে—

কোন্ ফাঁকতালে হঠাৎ ছেলেবেলার সুধা আসিয়া তাহার মূক সখীর সঙ্গে মুখর আলাপ জমাইয়া তুলিয়াছিল, শরমের স্পর্শে আবার সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হইয়া গেল। নদীর মধ্যে হঠাৎ যেন ঝরনার উচ্ছলতা আসিয়া পড়িয়াছিল। শৈলকে ধমক দিয়া সুধা বলিল, হ্যাঁ, গরুর নাকি আবার ঠেকার হয় ? পাগলের মত যা-তা বকিস নি শৈলী।

শ্যামলীর কাণ্ডের চেয়ে দিদির কাণ্ড আরও দুর্ব্বোধ্য বলিয়া বোধ হইল ; শৈল অপ্রতিভ হইয়া হাঁ করিয়া দিদির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সুধা মাকে বলিল, বলছিলাম মা, শ্যামলীর শেষে ব্যাটা-বাছুর হ'ল ? নই হ'লে নিয়ে যেতাম আমি। শ্বশুর কি ভাল একটা নাকি ওষুধ জানেন, খাওয়ালে নাকি নই-বাছুর হতেই হবে। হাসছ বউদি, কিন্তু একেবারে নাকি পরীক্ষিত, নড়চড় হবার জো নেই।

মাও না হাসিয়া পারিলেন না, বলিলেন, তিনবার তো 'নাকি' বলিল, অথচ নড়চড়ও হবার জো নেই ; শ্বশুর তোর ভারি গুণী তো !

সুধা লজ্জায় 'যাও' বলিয়া মুখ ফিরাইল।

ভাজ বলিল, তার চেয়ে তুমি শ্যামলীকে নিয়ে যাও না ঠাকুরঝি, ঠাকুর-জামাইয়েরও পণ রক্ষা হয়।

সুধা ঘাড় নীচু করিয়া বাড়ির দিকে পা বাড়াইয়া বলিল, না বাবু, আমি চললাম, শাশুড়ী-বউয়ে একজোট হয়ে আমার পেছনে লাগলেন সব।

৩

সে একটা আলাদা কাহিনী, বিবাহের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়ানো। যতই বড় হইতেছে, তাহার লজ্জাটা সুধাকে ততই অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে।

হরবিলাস শর্দ্দার বিবাহ-সংক্রান্ত বিল লইয়া সারা দেশটায় সামাল সামাল রব পড়িয়া গেল; লোকে বলিল, কালাপাহাড় এবার কলম হাতে করিয়া আবির্ভূত হইয়াছে। সে আজ প্রায় চার-পাঁচ বৎসরের কথা; সুধা আট পারাইয়া নয়ে পড়িবে। দুপুরে সরকারদের চণ্ডীমণ্ডপে যখন গ্রামের মাতব্বরদের মধ্যে আসন্ন ধর্ম্মবিপ্লব লইয়া সুত্যগ্র আলোচনা চলিতে থাকে, সে তখন তাহাদের নূতন গোয়াল-ঘরের পিছনে লিচুগাছের ছায়ায় খেলাঘর পাতিয়া জীবনের মাঝখানে বিচরণ করিতে থাকে। হালদারদের নিমাই হয় কর্ত্তা, সে হয় গিন্নী। দুই বছরের শিশু শৈল হয় মেয়ে। পুসী বেড়ালটা তখন বাচ্চা, চারখানা ইটের একটা ছোট্ট ঘরে কাপড়ের পাড়ে বাঁধা থাকিয়া অসহায়ভাবে বসিয়া থাকে, 'মিউ মিউ' করিয়া শব্দ করিলে সুধা বিব্রত হইয়া বলে, ওদিকে গরুটা ডেকে ডেকে সারা হয়ে গেল, কোন্ দিকটা যে সামলাই!

সই বউমা হয়। নিমাইয়ের ভাই ননী প্রায়ই অসুখে ভোগে, যেদিন আসিতে পারিল, সেদিন হয় সে বাড়ির ছেলে—সই-বউমার বর, সে দীর্ঘকাল অনুপস্থিত থাকিলে সইকে নূতনত্বের খাতিরে বিধবা বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়।

আসল সংসারে যে সব কথা হয়, নকলে তাহার প্রতিধ্বনি উঠে। সুধা রান্না করিতে করিতে কড়ায় খুন্তির দুই-তিনটা ঘা দেয়, উনানের মধ্যে কাঠটা একটু ঠেলিয়া দিয়া ঘুরিয়া বসে এবং হাঁটু দুইটা মুড়িয়া ডাকে, বলি হ্যাঁগা, শুনছ?

নিমাই আসিয়া উপস্থিত হয়, জিজ্ঞাসা করে, কথাটা কি?

সুধা তাহার গাফিলতিতে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া যায়; নিজের গৃহিণীত্ব ভুলিয়া বলিয়া উঠে, নাঃ, তোমায় শিখিয়ে শিখিয়ে পেরে উঠলাম না নিমুদা; বাবার মত হাতে হুঁকা কই?

ছেলেটা বড় ভুলো-মন, খুঁজিয়া পাতিয়া হুঁকাটা লইয়া আসে। একটা পেঁপের ডাঁটার নীচের দিকটা একটু ছেঁদা করা, মাথায় একটা কলকে-ফুল বসানো। একখানা ইট পাতিয়া তাহার উপর বসিয়া প্রশ্ন করে, কি বলছিলে?

বলছিলাম আমার মাথা আর মুণ্ডু; নাকে তেল দিয়ে সব ঘুমুচ্ছ, সরকার বাহাদুর যে এদিকে জাতকুল নিয়ে টানাটানি লাগিয়েছে— হিঁদুয়ানি যে যেতে বসল! শুনছি নাকি মেয়েদের আর বাইশ বছরের কমে বিয়ে দিতে দেবে না!

কর্ত্তা নিমু বলে, বাইশ, না আঠারো?

বড় তফাত! আজ আঠারো, কাল পালটে বাইশ ক'রে দেবে। বলি, সুধীটার কথা ভাবছ?

আট বছরের শিশু, ওর কথা আর কি ভাবব? শুনছি, জেলায় এই নিয়ে একটা মীটিং হবে; গ্রাম থেকে ডালঘেঁটে পাঠাবার জন্যে তারণ খুড়োর কাছে লোক এসেছিল।

সুধা আরও গম্ভীর হইয়া বাধা দিয়া বলে, বাইরের লোক তোমার জাত বাঁচাবে, সেই ভরসায় আছ? তোমাদের ঘটে কি একটুও বুদ্ধি—

তাহার কড়া চোখ দেখিয়া নিমাই একটু থতমত খাইয়া যায়; তাহা ছাড়া নিজে একটু হাঁদা বলিয়া কথাটা সাক্ষাৎভাবে আঘাতও করে। আমতা আমতা করিয়া একটু নিচু হইয়া বলে, ধ্যাঃ, বুদ্ধি নেই কে বললে? খালি ঐ কথা!

রাগের চোটে সুধা পিঁড়ি ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলে, তোমার দ্বারা হবে না নিমুদা, তুমি বাড়ি যাও। 'যে মেয়েমানুষের দশ-হাত কাপড়ে কাছা জোটে না, সে আবার বুদ্ধির খোঁটা দেয়'—রেগে এইখানে এই কথাটা বলতে হবে না? শুনলে না, সেদিন বাবা মাকে বললেন?

সুধার মূর্ত্তি দেখিয়া নিমাইয়ের নিজেরই কাছাকোঁচার ঠিক থাকে না।

কোন রকমে কাপড়টা সামলাইয়া লইয়া বলে, আচ্ছা, বলছি, ব'স্‌; তোর মা কিন্তু ওরকম রেগে কাঁই হয়ে ওঠে না সুধী, তা ব'লে দিচ্ছি; তোকে নিয়ে ঘর করা বড় শক্ত।

এই সময় একদিন সুধার বাপ রামরতন বাঘমারীর হাট হইতে শ্যামলীকে কিনিয়া আনিলেন। ইহাতে যে শুধু পুসী বেড়ালটা গাভীত্ব হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া বাঁচিল, তাহাই নয়, খেলাঘরের ঘরকন্নার পদ্ধতিতেও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিল।

রান্নাবান্না, ঘর ঝাঁট দেওয়া, জল তোলা—এ সবের পাট উঠিয়া গিয়াছে; এখন কর্ত্তা গিন্নী, ছেলে বড সবলে শ্যামলীব পিছনে হয়রান, কোথায় নধর ঘাস জন্মাইযাছে, কোঁচড় ভবিয়া তুলিয়া আনা; কে কোথায় গাছ কি ডাল কাটিয়াছে, পাতা সংগ্রহ করা; ওদিকে গ্রামে সবার বাগানে যে কি হইয়াছে, নেউল-তাড়ানো চুনদাগা হাঁড়িতে আর কাজ হয় না। নিমাই তো সুধাকে তুষ্ট করিবার এমন স্বর্ণ সুযোগ পাইযা একেবারে মাতিয়া উঠিয়াছে; এতদিন স্কুলে যে সময়টা নষ্ট হইত, তাহারও বহুলাংশ এখন শ্যামলী-পরিচর্য্যায় সার্থক হইয়া উঠিতেছে। এই সব করিয়া যে সময়টুকু উদ্ধৃত হয়, তাহাতে সুধা সকলকে গো-তত্ত্ব শিক্ষা দেয়।

বলে, তোমরা যে মনে কর মশাই, ওরা আসল গরু, বুদ্ধিসুদ্ধি নেই, তা নয়। সব বোঝে, দেখছ না, কি রকম ক'রে আমাদের কথা শুনছে? সত্যযুগে ওরা কথাও কইত।

ননী বলে, ওরা তো ভগবতী।

বাৎসল্যের মৃদু হাস্যের সহিত সুধা বলে, হ্যাঁ, ভগবতী, তা ব'লে কি লক্ষ্মী-সরস্বতীর মা ভগবতী? তা নয়; ও অন্য রকম ভগবতী। হ্যাঁ, কি যে বলছিলাম—সত্যযুগে ওরা কথাও বলত, তারপর কোন্‌ মুনির শাপে বোবা হয়ে যায়। অনেক কান্নাকাটির পর মুনি বলেন, আচ্ছা, যা, তোদের কোন কষ্ট হবে না, তোদের বুদ্ধি একটু মানুষের মাথায় সাঁদ ক'রে দিচ্ছি, তোদের নিজের জাত যেমন তোদের ইশারা বুঝবে, মানুষেও সেই রকম বুঝতে পারবে। কাছে গেলে শ্যামলী যখন তোমার হাত চাটে,

তখন তোমার তো বুঝতে বাকি থাকে না যে, ঘাস পাতা তুলে আনতে বলছে—সে কেমন ক'রে বোঝ মশাই? যখন—

ভক্তিমান ননী বলে, আর গরু তো স্বর্গ, ওদের গায়ে তেত্রিশ কোটি দেবতা থাকেন।

সুধা বলে, থাকেনই তো, মুখে বেম্মা থাকেন, মাথায় জগন্নাথ থাকেন, ন্যাজে কার্ত্তিক থাকেন—

সই দয়াপরবশ হইয়া বলে, আহা, কার্ত্তিক ঠাকুরের বড় কষ্ট ভাই; সব্বদা ন্যাজ ধ'রে ঝুলতে হয়।

সুধা বলে, চুপ, বলতে নেই। তাহার পর নিমাইয়ের পানে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি হানিয়া বলে, আর অত দেবতা থাকেন ব'লেই তো গরুর জন্যে চুরি-টুরি করলে কোন দোষ হয় না, বরং পুণ্যিই হয়। এই দেখ না, একটা পিঁপড়ে মারলেও কত পাপ হয় তো? কিন্তু মা কালীর সামনে পাঁঠা বলি দিলে কোন দোষ হয় কি?

যুক্তিটা অকাট্য; ইঙ্গিতটাও অস্পষ্ট নয়, ফলে নিমাইদের গোয়াল হইতে কোঁচড়-ভরা খোল, কুঁড়ো, কলাই হাজির হইয়া শ্যামলীর উদরে প্রবেশ করে। সইও সাধ্যমত পুণ্য-সঞ্চয়ে মনোযোগী হইয়া উঠে।

৪

এদিককার খবর সংক্ষেপত এই—

জেলায় মীটিং হইয়াছিল। হরবিলাস শর্দ্দাকে যথাযোগ্য গালাগালির পর ছেলেদের বিবাহযোগ্য বয়স ষোল এবং মেয়েদের বারো ধার্য্য করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। সরকারদের চণ্ডীমণ্ডপে এর তুমুল আলোচনা হইয়াছিল, তাহাতে হরবিলাস শর্দ্দা এবং জেলার উকিল ও অন্যান্য উদ্যোক্তাদের যথাযোগ্য গালাগালির পর ছেলেদের ন্যূনতম বয়স চৌদ্দ এবং মেয়েদের দশ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ও-পাড়ার তিনকড়ি খুড়ীর বাড়িতে উৎকট রকমের এক মেয়ে-মীটিং বসিয়াছিল, তাহাতে হরবিলাস শর্দ্দা, গবর্মেন্ট বাহাদুর, জেলার উকিল এবং সরকারদের চণ্ডীমণ্ডপে-

যাহারা তামাক পোড়ায়, সকলকেই একসাটে ভাগাড়ে দেওয়া হইয়াছে। গ্রামের নানারূপ কেচ্ছা-কাহিনী আলোচনার পর সকলের মনের বোঝা হালকা হইলে ধার্য্য হইয়াছে যে, ইহাদের পুরাপুরি মতিচ্ছন্ন হইবার পূর্ব্বেই বয়স-নির্ব্বিশেষে গ্রামের সমস্ত অনূঢ়া কন্যাকে পাত্রস্থা করিয়া জাতি কুল বাঁচাইতেই হইবে;—তা বর কানা হউক, খোঁড়া হউক, মুলা হউক, কুঁজা হউক, মন্ত্রটা কোন রকমে আওড়াইয়া দিতে পারিলেই হইল।

বিধি-ব্যবস্থার যথেষ্ট অভাব থাকিলেও দুপুরের এই মহিলা-মজলিসই সাধারণত জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করে; বিশেষ করিয়া মজলিসের কর্ণধার যদি তিনকড়ি খুড়ীর মত কেহ থাকেন।

পাড়ায় পাড়ায় কন্যা মহামারী পড়িয়া গেল।

কয়েকদিন পরের কথা। বিকালে সুধা বাগানের এক কোণে শ্যামলীর গলা জড়াইয়া আদর করিতেছিল, শ্যামলী, শ্যমলী, শ্যামল-রাণী, তুমি আর কারুর নয় সোনামণি—

শ্যামলী তাহার সমস্ত পিঠখানি চাটিয়া চাটিয়া বোধ হয় জানাইতেছিল, না, আমি আর কাহারও নয়, একান্ত তোমারই।

এমন সময় মা আসিয়া বলিয়া উঠিলেন, দেখ কাণ্ডখানা! সমস্ত পাড়া তোলপাড় ক'রে মরছি, আর মেয়ে কিনা পাঁদাড়ের মধ্যে গরুর সঙ্গে সোহাগে ব্যস্ত! তোকে না আজ দেখতে আসবে সুধী? গা মাজতে হবে না? চুল বাঁধতে হবে না? চ'লে আয় শিগগির।

দেখিতে আসিলেন পণ্ডিতপাড়ার সাব-রেজিস্ট্রারবাবু, নাম জগবন্ধু রায়। বিদেশী লোক, মেদিনীপুরে বাড়ি, কার্য্যোপলক্ষে বদলি হইয়া এখানে বছর দুই তিন আছেন। ছেলেটি এখানে থার্ড ক্লাসে পড়ে; বছর তেরো বয়স হইবে। জগবন্ধুবাবু একটু বাহিরের খবরাখবর রাখেন এবং প্রত্যেক বিষয়ই যুক্তিতর্কের শেষ সীমানা পর্য্যন্ত ঠেলিয়া তুলিয়া অনুধাবন করেন। ছেলে তাঁহার একটু ছেলেমানুষ, কিন্তু এর পরেই তো সেই আঠারো। অনেক জায়গায় আবার মীটিং করিয়া হাঁকাহাঁকি করিতেছে—ছেলেদের বয়স করা হউক বাইশ চব্বিশ। এক মিস্ মেয়ো আসিয়াই এই ব্যাপার! ইতিমধ্যে যদি আর একটি আসিয়া পড়ে তো

চক্ষুস্থির! ছেলেদের বয়স যে কোথায় গিয়া ঠেকিবে, কে জানে? বিবাহ জিনিসটাই থাকিলে হয়! বোধ হয় বৈদিক বিবাহপদ্ধতি উঠিয়া গিয়া সিভিল ম্যারেজের ধুম পড়িয়া যাইবে। শেষকালে চল্লিশ বছরের বুড়ো ছেলে 'লাভ' করিয়া কোর্টে বিবাহ রেজেস্টারি করিয়া কাহাকে ঘরে তুলিবে, কে বলিতে পারে? এখন একটু ভুলের জন্য শেষকালে জাত কুল সব যাক আর কি!

মেয়ে খুব পছন্দ। আশীর্ব্বাদও হইয়া গেল, এবং খুব কাছাকাছি একটা দিন স্থির করিয়া যোগাড়যন্ত্র আরম্ভ হইয়া গেল।

সুধার মনটা ভাল নাই। যতদূর জানা আছে, বিবাহ জিনিসটা মন্দ নয়; কিন্তু ভাবনার কথা এই যে, শ্যামলীকে ছাড়িয়া যাইতেই হইবে। আশীর্ব্বাদের পরদিন সকালবেলা সই আসিয়াছিল, সুধার মেজাজের জন্য খেলা জমে নাই। যাওয়ার সময় মুখ ভার করিয়া বলিয়া গিয়াছে, আচ্ছা লো, আমারও একদিন বিয়ে হবে, তখন দেখে নোব।

সুধা শ্যামলীর জন্য মনমরা হইয়া ঘাস ছিঁড়িতেছিল, নিমাই আসিয়া বলিল, ওগো, শুনছ?

ঘাড় বাঁকাইয়া শাসনের ভঙ্গীতে সুধা বলিল, তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি কবে হবে নিমুদা?

নিমাই ভড়কাইয়া গিয়া প্রশ্ন করিল, কেন র‍্যা?

কেন র‍্যা! আমায় আর ও-রকম ক'রে ডাকা চলে তোমার?

নিমাই সব কথা শুনিল; শেষের দিকে পাত্রের পরিচয় পাইয়া উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিল, চমৎকার হবে। সে তো হরিহর, আমাদের স্কুলে থার্ড ক্লাসে পড়ে, আমি খুব জানি তাকে। মাইরি বলছি, বেশ হবে ভাই।

সুধা মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল, তোমাদের তো খুব ফুর্ত্তি; আমার মনে যে কি হচ্ছে—

নিমাই কোন রোমান্সের গন্ধ পাইল কি না সেই জানে, মাঝখানেই ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, কেন র‍্যা সুধী?

বাছুরটার কথা ভাবছ? আমি শ্যামলীকে ছেড়ে থাকতে পারব?

আর আমায় ছেড়ে শ্যামলীই বাঁচবে? কথাটা বলিয়া নিমাইয়ের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিতেই ঠোঁট দুইটি কাঁপিয়া উঠিল, চক্ষুর কূল ছাপাইয়া দুই ফোঁটা জল জমিয়া উঠিল। নিমাই হাত দিয়া মুছাইয়া দিয়া বলিল, কাঁদিস নি সুধী, খুড়ীমাকে বলব আমি।

ইহার পর শান্তভাবে চিন্তা করিয়া দেখা গেল, খুড়ীমাকে বলাও চলে না, আর ওসব উপায়ে কাজও হইবে না। ক্রমাগতই দুইজনে পরামর্শ হইতে লাগিল—বাগানের ঝোপঝাড়ের মধ্যে বসিয়া, গোয়াল-ঘরের কোণে, সন্ধ্যার সময় পুকুর-ঘাটের ভাঙা রাণার নীচে। খেলা হয় না; ননী, সই আমল পায় না; সই যাইবার সময় নাক কুঁচকাইয়া বলে, বিয়ের কনের অত বেটাছেলে-ঘেঁষা হওয়া ভাল নয় লো—এই শাস্ত্রবাক্য ব'লে দিলাম।

৫

বিয়ের রাত। পাশাপাপি দুই গ্রামের বর-কনে; বরপক্ষ-কন্যা-পক্ষের লোকজনে বাড়িটা গম্‌গম্‌ করিতেছে। উঠানে বিবাহের সরঞ্জাম, চারিদিক গোল করিয়া বিবাহ-সভা রচনা করা হইয়াছে, ছেলে বুড়া ঠাসাঠাসি হইয়া বিবাহ দেখিতেছে।

অনুষ্ঠানের মধ্যে পুরোহিত সুধার বাপকে বলিলেন, এইবার তুমি মেয়ের ডান হাতটি তুলে ধর, সম্প্রদান করতে হবে। তুমি হাত পাত তো বাবা, শ্বশুরের দান নেবে। কই গো, হাতে জড়াবার মালাগাছটা?

সুধার বাপ সুধার হাতটা একটু তুলিয়া বাড়াইয়া ধরিলেন।

বর কিন্তু একটা কাণ্ড করিয়া বসিল। তাহার হাতটা এতক্ষণ বাহিরেই ছিল, হঠাৎ কাপড়ের মধ্যে টানিয়া লইয়া গোঁজ হইয়া বসিল। সকলে যেন স্তম্ভিত হইয়া গেল। পুরোহিত পাকা লোক, হাসিয়া বলিলেন, হাত বের কর বাবা, লজ্জা কি? বড্ড ছেলেমানুষ কিনা!

সভার মধ্য হইতেও অনুরোধ, উপরোধ, হুকুম, ধমক কিছুই বাকি রহিল না। বর কিন্তু ক্রমাগতই হাত শক্ত করিয়া নিজের কোলের

মধ্যে চাপিয়া ধরিতে লাগিল। মুখটা ফ্যাঁশা হইয়া গিয়াছে, ঘাড়টা গুজড়াইয়া বুকের উপর আসিয়া পড়িয়াছে।

বর বেঁকে বসেছে, বর বেঁকে বসেছে।—বলিয়া একটা রব চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। বাড়ির ভিড় চাপ বাঁধিয়া উঠিল। জগবন্ধু আগন্তুকদের দেখাশুনায় বাহিরে ব্যস্ত ছিলেন। ভিড় ঠেলিয়া আসিয়া হাজির হইলেন। কড়া গলায় বলিলেন, ব্যাপার কি রে হরে? হাত বের কর। থার্ড ক্লাসে প'ড়ে স্বাধীনচেতা তরুণ হয়েছ, বটে?

পুরোহিত উঠিয়া তাঁহার পিঠে আস্তে আস্তে চাপড় দিয়া বলিলেন, আপনি একটু ঠাণ্ডা হন, রাগবার সময় নয়। ব্যাপার আমি বুঝেছি, সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি।

বরের নিকট আসিয়া কানের কাছে মুখ আনিয়া প্রশ্ন করিলেন, কি চাই তোমার বাবা, বল দিকিন আমায়?

কোন উত্তর হইল না। আর একটু অপেক্ষা করিয়া বলিলেন, বল, শ্বশুরের কাছে তো চাইবেই। আমরাও এক রকম পণ ক'রে বসেছিলাম, এতে লজ্জা কি? সাইকেল চাই? নগদ টাকা? হারমোনিয়া?

বর জড়িত কণ্ঠে কি একটা বলিল। বেশ ভাল রকম বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিতভাবে বলিলেন, স্পষ্ট ক'রে বল, কিচ্ছু লজ্জা নেই।

বাড়ির মধ্যে একটা খড়কে পড়িলে আওয়াজটা শুনা যায়। এই নিস্তব্ধতার মধ্যে পুরোহিত ঠাকুর এক রকম চীৎকার করিয়াই বলিয়া উঠিলেন, অ্যাঁ! কি বললে? শ্যামলী-বাছুর?

নিস্তব্ধতা সেই রকমই রহিল; কেহ যেন কথাটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। একটা মুহূর্ত্ত, তাহার পর জগবন্ধু অগ্রসর হইয়া নাক মুখ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, হারামজাদা! মানষের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দোব ব'লে নিয়ে এলাম, আর ভদ্দরলোক তোকে এখন নই-বাছুর সম্প্রদান করবেন? বের কর্‌ হাত, নয়তো তুই আছিস কি আমি আছি। করলি বের?

হরিহর আস্তে আস্তে হাতটা বাহির করিল, মুষ্টিবদ্ধ অবস্থাতেই রহিয়াছে, একটু একটু কাঁপিতেছে। সুধার বাপ ব্যাপারটার আকস্মিকতায়

এতক্ষণ বিমূঢ়ভাবে বসিয়া ছিলেন, এইবার একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বাম হাতটা হরিহরের পিঠে রাখিয়া সস্নেহে কহিলেন, ও তো ছোট্ট বাছুর বাবা, তোমায় আমি ভাল এক জোড়া বিলাতী গাই-বাছুর কিনে দোব এই হাটেই। নাও, হাত খোল, লক্ষ্মী আমার।

জগবন্ধু তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, না না, ও রকম আশকারা দেবেন না বেইমশাই, ওতে আমার বদনাম। ছেলে পণ ক'রে দুধ খাবার জন্যে গাই-বাছুর নিয়ে যাবে, লোকে বলবে—

বরপক্ষের একজন রসিক বৃদ্ধ কথাটা কাড়িয়া লইয়া বলিলেন, লোকে বলবে, বাপ-বেটায় মিলে শ্বশুরকে দুইছে।

যাহারা বুঝিল, তাহাদের মধ্যে হাসি পড়িয়া গেল। সুধার বাপ একটু লজ্জিত হইলেন। জগবন্ধুর মাথায় তাঁহার নিজস্ব পদ্ধতিতে তর্ক জাগিয়া উঠিতেছিল; বলিলেন, একটু থামুন পুরুতমশাই, এর গোড়া এইখানেই মেরে দিতে হবে। দিব্যি এক মতলব বের করেছে তো! আজ বিয়ে করতে ব'সে পণ, এর পর শ্বশুর-বাড়ি আহারে ব'সে পণ, তারপর বউমাকে বাড়ি নিয়ে আসবার সময় পণ, প্রত্যেক বারেই শ্বশুর-শাশুড়ীর মাথায় হাত বুলিয়ে এটা ওটা সেটা হাতানো! আমি কোথায় শর্দ্দা-আইন বাঁচাতে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতে গেলাম, ছেলে আমার ভাবছেন, বাঃ, এ তো খাসা এক রোজগারের পথ বের হ'ল! কোন্ মুখ্যু আর লেখাপড়া করে, এই ব্যবসাই চালানো যাক। বলি, তোকে কে হদিস বাতলে দিলে র‍্যা? তুই শ্যামলী-বাছুরের নামই বা জানলি কেমন ক'রে? বল্, তোর ব্যবসার গোড়াপত্তনেই আমি গণেশ ওলটাব।

বাপের মুঠার মধ্যে সুধার হাতখানিও কাঁপিয়া উঠিল। এই অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে কচি বরবধূর প্রতি দয়াপরবশ হইয়া সুধার বাপ বলিলেন, থাক্ বেইমশাই, ছেলেমানুষ একটা কথা ব'লে ফেলেছে—

জগবন্ধু কড়া-ধাতের লোক, নিরস্ত করা গেল না। অনেক বকাবকি জেদাজেদির পর হরিহর মাথা তুলিয়া একবার পুরোহিতের পানে আড়ে

চাহিল। তিনি উদ্দেশ্যটা বুঝিতে পারিয়া তাহার মুখের কাছে কান লইয়া গেলেন, তাহার পর বিস্ময়ের ঝোঁকে প্রায় হাতখানেক সরিয়া আসিয়া বলিয়া উঠিলেন, সেকি! কনে বলেছে? নিমাই কি করেছিল? চিঠি দিয়ে এসেছিল?

আরও ধমক-ধামক করার পর চিঠিটার সন্ধান পাওয়া গেল। তিনি যে ছেলেকে টিপিয়া এই পণ করান নাই—সর্ব্বসমক্ষে এটা নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণ করাইবার পর জগবন্ধু তখনই বাড়িতে লোক ছুটাইলেন। হরিহরের নির্দ্দেশমত সে তাহার ভূগোলের পাতার মধ্য হইতে দলিলখানি সংগ্রহ করিয়া আনিল। লেখা আছে—

"প্রণামাবহব নিবেদন মিদং কার্যঞ্চাগে।

তোমার সহিত আমার বিয়ে ঠিক হইয়াছে। আমি খুব ভাগ্যবান। কিন্তু শ্যামলবাণীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না। অতএব মহাশয় বিয়ের সময় শ্যামলী চাই বলিয়া বেঁকে বসবেন। না হইলে আমি আপিম খাইয়া মরিব। আপিম আমার শাড়ির আঁচলেই বন্ধিত থাকিবে, মোটা গেরো তুমি দেখিতে পাইবে। এতে দোষ হয় না। নেত্য-পিসিদেব বরও সেদিন একটা ঝাড় লালঠেম চাই বলে বেঁকে বসেছিল। নিয়ে ছাড়িল। মা বলেন জিদই পুরুষেব লক্ষণ। এ নিমাই। নিমাই আমায় প্রাণের চেয়েও ভালবাসে। সেই এ চিঠি লিখে দিয়েছে। আমি অবলা নারি লেখা পড়া জানি না শ্যামলী ছাড়া হইয়া থাকিতে হইত। নিমাই ভয়ঙ্কর বিদ্বান আর খুব ভাল ছেলে তোমাদের ইস্কুলে 6th classএ পড়ে। প্রণাম জানিহ। ইতি

অভাগিনী

Sudha

সুধাময়ি দাসী

ভয়ঙ্কর বিদ্বানটির হাজার খোঁজাখুঁজি করিয়াও সে রাত্রে বিয়ে-বাড়িতে কোন সন্ধানই মিলিল না। শাড়িতে একটি বড়গোছের গেরো পাওয়া গেল বটে, কিন্তু সুখের বিষয় তাহাতে একটি বড় মার্ব্বেল ভিন্ন অন্য কিছু 'বন্ধিত' ছিল না।

হৈমন্তী

অতি সামান্যই একটি দৃশ্য,—বহুদূরে খোলা মাঠের উপর দিয়া, চলিয়াছে একটি সাঁওতাল দম্পতি। পুরুষটির মাথায় এক বোঝা ধান, স্ত্রীলোকটির কোলে একটি শিশু। দ্রুত গতির সঙ্গে সঙ্গে গল্প হইতেছে, স্ত্রীলোকটি এক একবার মুখ তুলিয়া সঙ্গীর পানে চাহিতেছে।

জীবনে তো কতই দেখাশোনা হইল, কিন্তু আজ হেমন্ত-অপরাহ্ণে এই ফসল তোলার নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর দৃশ্যটুকু সুরেশ্বরকে কেমন অন্যমনস্ক করিয়া দিয়াছে; দুটিই কেমন যেন একসুরে বাঁধা—সময় আর এই ঘরমুখী গতি; চোখ ফেরানো যায় না। ডেক-চেয়ারের অলস অঙ্ক ছাড়িয়া আর উঠিতে ইচ্ছা করিতেছে না।

অথচ অমন অলসভাবে গা এলাইয়া পড়িয়া থাকিবার কথা নয়; মস্ত বড় রেলওয়ে সেতুর কনট্রাক্ট হাতে, অধীনস্থ ওভার্‌সিয়ার এইমাত্র আসিয়া খবর দিয়া গেল—যে স্তম্ভটা সবচেয়ে বেশি উঠিয়াছে তাহাতে কি একটা ত্রুটি দেখা দিয়াছে, গাঁথুনি আরও তুলিবার পূর্ব্বে সুরেশ্বরের নিজে একবার দেখা দরকার।

সাঁওতাল পুরুষটি মাথার বোঝা নামাইয়া রাখিয়া পথের ধারটিতে বসিয়াছে। কি একটু কথা হইল, দুইটি হাত প্রসারিত করিয়া ধরিল, স্ত্রীলোকটি শিশুটিকে তুলিয়া দিল।

অন্যমনস্কভাবে ওভার্‌সিয়ারের পানে চাহিয়া সুরেশ্বর বলিলেন, ও গাঁথুনিটা আজ বন্ধ থাক্।

ছোকরা নূতন পাস-করা, উৎসাহী, বলিল, অথরিটিরা একটু তাড়া দিচ্ছে, কাজটা বড় আর্জেণ্ট কিনা, ওভার্‌টাইম দিয়ে চালানো হচ্ছে। আজ আবার—

সুরেশ্বরের মুখে একটা অসহিষ্ণু হাসি ফুটিতে ছোকরা আর কথাটা

বাড়াইল না, 'তা হ'লে আজ বন্ধই রাখিগে' বলিয়া চলিয়া গেল। সুরেশ্বর পূর্ব্বের মতই ডেক-চেয়ারে গা এলাইয়া পড়িয়া রহিলেন।

অস্ত যাইবার অনেক আগেই সূর্য্য পাণ্ডুর হইয়া পড়িয়াছে। রোদটা যেখানেই আসিয়া পড়িয়াছে, একটা কাঁচা সোনার রঙ—তালগাছের মাথায় মাথায়, দূরের গ্রামখানিকে আড়াল করিয়া যে হরিৎপুঞ্জ তাহার গায়ে, যে কখানা বাড়ি একটু আধটু চোখে পড়ে তাহাদের দেয়ালে, খড়ের চালে,—সবখানেই যেন গলিত স্বর্ণের অবলেপ। শ্রেণীবদ্ধ তালগাছের মধ্য দিয়া বহুদূরে বাঁকা নদীর একটা ফালি দেখা যায়, তাহার পাশেও বিস্তৃত বালুচরের উপর কে যেন মুঠা মুঠা কাঁচা সোনার গুঁড়া ছিটাইয়া দিয়াছে।

একটু দূরে কোথায় কতকগুলা বুনো ফুল ফুটিয়াছে—ফুল দেখা যায় না, শুধু মনে হয়, খুব সাধারণ না হইলেও এ গন্ধ যেন চেনা চেনা। একটা অস্পষ্ট স্মৃতি মনটাকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে।

ইঞ্জিনিয়ার সুরেশ্বরের আটচল্লিশ বৎসরের জীবনে আজ এই হেমন্ত অপরাহ্ণটি হঠাৎ বড় অপরূপ বোধ হইতেছে, অপরূপ যে শুধু সুন্দরেরই অর্থে এমন নয়, অল্পে অল্পে মনের কোথায় একটি বেদনা জমিয়া উঠিতেছে। শীতের হাওয়ার দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে এই দিনটি যেন মৌন বিদায়ের দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে চাহিয়া আছে, সুরেশ্বরের মনে হইতেছে, এ শুধু আজিকার দিনটির বিদায় নয়—ঋতুচক্র পূর্ণ করিয়া একটি বর্ষ যেন বিদায় লইতেছে—বসন্তে যাহার ছিল আরম্ভ, তাহার সামনে এইবার আসিয়া পড়িল শীতের সমাধি। তাহার আগে এই কয়টা দিন লইয়া হেমন্ত—ফসল কাটার সময়—একটা জীবনের পরিক্রমায় যা পাওয়া গেল তা ঘরে তুলিয়া একটু সোনার হাসি হাসিয়া লওয়া।

সেই সাঁওতাল-দম্পতির দিকে আবার দৃষ্টি গেল,—পুরুষটি আবার মাথায় ধানের বোঝা তুলিয়া লইয়াছে, স্ত্রীলোকটির কোলে শিশু। গতি আরও চঞ্চল, ধানের শীষে দোল লাগিতেছে।…টুকরা টুকরা মেঘের গায়ে অস্তরাগ আরও গাঢ় হইয়া উঠিল।

মনে হইতেছে, কতকগুলা এলোমেলো চিন্তা যেন একটা স্পষ্ট রূপ ধরিয়া ফুটিয়া উঠিবে। অন্তরের অন্তস্তলে কে যেন জীবনের লাভ-

লোকসানের খতিয়ান লইয়া এক নূতন দৃষ্টিতে যাচাই করিতে বসিয়াছে। যেটিকে পরম সম্পদ বলিয়া একদিন বুকের সমস্ত উত্তাপ দিয়া জড়াইয়া ধরা গিয়াছিল, মনে হইতেছে, সেটা যেন নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর জ্ঞানে অবহেলার অঙ্গুলিক্ষেপণে পাশে ঠেলিয়া রাখা গিয়াছিল, সে এক অপূর্ব্ব মোহন রূপে একেবারে সামনেটিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কেমন একটা গোলমেলে কাণ্ড যেন—জীবনে কি সত্যই এত ভুল হইয়া গেল? না, এ জীবন-সন্ধ্যায় দৃষ্টিভ্রম? মধ্যাহ্নের স্পষ্ট আলোয় যার ছিল এক রূপ, সন্ধ্যায় তাহারই হইয়াছে রূপান্তর। বৎসরের সন্ধ্যা, এদিকে জীবনের আকাশও সন্ধ্যার বিদায়-রাগে রাঙা হইয়া উঠিয়াছে যে।

কাল পর্য্যন্ত—অথবা আরও ঠিকমত বলিতে গেলে আজই এই কিছুক্ষণ আগে পর্য্যন্ত জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য, জীবনের একমাত্র তপস্যা ছিল কাজ।...পরশু চীফ ইঞ্জিনিয়ার তদারকে আসিয়াছিল। বেশ একটু কৌতুকজনক ব্যাপার হইয়া গেল। লোকটা একেবারে নূতন, তাহার চেয়েও নূতন তাহার তদারকের পদ্ধতিটা। কালি-ঝুল-লাগা খাকি প্যাণ্ট আর হাফ্‌শার্ট পরা একজন সাহেব ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, অবিচ্ছিন্ন কাজের মধ্যে কয়েকবার নজরে পড়িল সুরেশ্বরের; কিন্তু পরিচয় লইবার না ছিল অবসর, না ছিল কৌতূহল। খুব বড় কন্‌স্ট্রাকশন্—পাশের জংসন স্টেশন হইতে প্রায় সাহেব-সুবোরা দেখিতে আসে কৌতূহলী দর্শক হিসাবে; এমন কি হাওড়া-লিলুয়া থেকেও ছুটি-ছাটায় অজ্ঞাতকুলশীল সাহেবদের আমদানি হয়; নিজের মনেই দেখে শোনে, ফিরিয়া যায়, কেহ-কেহ আসিয়া কিছু প্রশ্নাদিও করে। সন্ধ্যার একটু আগে একখানা আপ্‌ ট্রেনে সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার নামিল। জানা ছিল না, সুরেশ্বর স্টেশনে যান নাই; সেই ময়লা খাকি-পরা লোকটিকে লইয়া একেবারে অফিসে আসিয়া প্রবেশ করিল।...পরিচয় দিল।—রেলের চীফ ইঞ্জিনিয়ার, যিনি এই নূতন আসিয়াছেন। তাহাকে ডাকিয়া লওয়া হয় নাই বলিয়া সুরেশ্বর একটু অপ্রতিভভাবে দুঃখ প্রকাশ করিলেন। একটু থামিয়া প্রশ্ন করিলেন, But how did you find the work, Sir? (কাজটা কেমন দেখলেন?)

লোকটা সত্যই একটু আমুদে, রহস্যপ্রিয়; মুখে অতিরিক্ত বিস্ময়ের ভাব ফুটাইয়া দুইটা হাত চিতাইয়া বলিল, But I did not see the work! (কিন্তু আমি কাজ তো দেখি নি!)

বেশ একটু বিমূঢ় ভাবেই চাহিয়া থাকিতে হইল, কিছু বলিতে পারিবার পূর্ব্বেই সাহেব হঠাৎ আসিয়া করমর্দ্দনের জন্য হাতটা বাড়াইয়া বলিল, I was watching you at work, Mr. Gupta, and that was enough (আমি তোমায় কাজ করতে দেখছিলাম, মিস্টার গুপ্ত, তাতেই সব বুঝে নিয়েছি।)

সারা জীবন ধরিয়া ভালো কাজের জন্য মুখে, কাগজে বহুৎ প্রশংসা পাওয়া গিয়াছে, তবু নূতন ইঞ্জিনিয়ারের বলিবার ঢঙটুকু বেশ নূতন, আর শ্রুতিরোচক; শোনার পর থেকে কানে যেন লাগিয়া ছিল।—এই খানিকটা আগে পর্য্যন্ত, তাহার পরই সাক্ষাৎ হইল এই হেমন্ত গোধূলির সঙ্গে। অতবড় কথাটার কোন যেন অর্থই নাই আর।

শুধু অর্থই না-থাকা নয়, এই সব প্রশংসা জীবনে কি দিল সেই কথাই লইয়া পড়িয়াছে মনটা।

* * *

বালুতট আরও রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। পুরুষটি তাহার উপর ধানের বোঝা নামাইয়া রাখিল। হাঁটুভরও জল নয়, নদীতে দুইজনে নামিয়া মুখ-হাত ধুইতেছে। এলোখোঁপায় জলের হাত বুলাইয়া মেয়েটি আবার জবাফুল দুইটি গুঁজিয়া দিল। কোলের ছেলেটা ধানের বোঝা মাথায় লইবে,—প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে; দম্পতি গ্রীবা ঘুরাইয়া দাঁড়াইল, ছেলের আস্থা দেখিয়া কি মন্তব্য হইতেছে, মাঝে মাঝে হাসিতে শরীর দুইটি উঠিতেছে দুলিয়া।

* * *

মন হিসাব করিতেছে, এই সব প্রশংসা কি দিল জীবনে! শুধু কর্ম্মে উদ্যম?—কিন্তু কাজই কি জীবন? আর কোন পাওনা ছিল না এ জীবনে?…চারিদিকের এই ফসল তোলার দিনে, এই সোনালী

বৈকালে সুরেশ্বরের এমন কিছু একটা পাইবার ইচ্ছা হইতেছে যা জীবনের শীতের সম্বল হইয়া থাকে, তা যদি স্মৃতিমাত্রই হয় তো তাই হোক, সেও তো নিঃসম্বলের কিছু।···নহিলে, জীবন থেকে বিদায় লইবার বেলায় এই অনুতাপই থাকিয়া যাইবে যে শুধু বঞ্চিতই হইয়াছি।

বেশি দূরে হাতড়াইতে হইল না, সুরেশ্বরের হঠাৎ কালকের ঘটনাটি মনে পড়িয়া গেল। কালও সেটা একটু রেখাপাত করিয়াছিল মনে, কিন্তু আবার কাজের সংঘর্ষে মুছিয়া গিয়াছিল সে রেখাটুকু।

কাল একটা ইণ্টার্‌ভিউ ছিল। সুরেশ্বর বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন—একটি মেয়ে-স্টেনোগ্রাফার চাই। সুরেশ্বর কোনকালে দিবেন মেয়ে-স্টেনোর জন্য বিজ্ঞাপন, এটা আর সবার কাছে তো বটেই—সুরেশ্বরের নিকটও বড় অদ্ভুত ঠেকিয়াছিল প্রথমে। কিন্তু দিয়াছিলেন, কেন, অত ভাবিয়া দেখিবার অবসর হয় নাই, শুধু হাত লইয়াই কাজ হইল জীবনে, মন লইয়া তো নাড়াচাড়া করা হয় নাই।·· সাক্ষাৎকারের মধ্যে মন যেন অল্প অল্প করিয়া স্বচ্ছ হইয়া উঠিতেছিল। দরখাস্ত পড়িয়া তিনজনকে বাছিয়া লইলেন। দুইজন ফিরিঙ্গী-কন্যা, একটি বাঙালীর মেয়ে। বাঙালীর মেয়েটি আই. এ. পাস, নাম মিস্ অমিতা সেন।

সুরেশ্বর ফিরিঙ্গীদেরই ডাক দিলেন প্রথমে। বেশ স্মার্ট, ওরা যেমন হয়। যেটিকে পরে দেখিলেন সেইটিই বেশি ভাল মনে হইল। একটু বয়স হইয়াছে, কাজের অভিজ্ঞতা আছে। ওটিকেই রাখা মনে মনে ঠিক করিলেন। চিঠি দিয়া জানাইবেন বলিয়া দুইজনকেই বিদায় দিলেন।

এটা কিছু-বেশি মাসখানেক আগেকার কথা। বাঙালী মেয়েটিকে ডাকিবেন কি-না একটু স্থির করিতে মাসখানেক লাগিল।···আদৌ মেয়ে-স্টেনো রাখার মধ্যে যেটুকু মনোভাব স্পষ্ট ছিল তাহা এই—থাকুক না, অফিসটা একেবারে হালফ্যাশানের হয়, সাহেবসুবোরা আসে, ওরা সেই পুরোনো একঘেয়েমি একটু অপছন্দ করে। নিজে তিনি অবিবাহিত,—কিন্তু তা বলিয়া মেয়েদের অত ভয় করিবার কি আছে? বাঘও নয়, ভল্লুকও নয়।

এক মাস ভাবিয়া চিন্তিয়া বাঙালী মেয়েটীকেও একটা সুযোগ দেওয়া

ঠিক হইল।…বাঙালী মেয়েরাও তো অফিসে বাহির হইতেছে আজকাল—এমন কিছু নূতন আর দৃষ্টি-কটু হইবে না।

কাল সকালে মিস্ অমিতা সেন আসিয়াছিলেন দেখা করিতে, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই সুরেশ্বর মন স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। মন স্থির এই যে, মেয়ে-স্টেনোর পাট উঠাইয়া দিয়া এবারে ভাল অভিজ্ঞ পুরুষ-স্টেনোর জন্য নূতন করিয়া বিজ্ঞাপন দিবেন।

এ ভাবান্তরটা আরম্ভ হইল চীফ ইঞ্জিনিয়ারের প্রশংসাটুকুর পর। যে কর্ম্ম লইয়া সুরেশ্বরের জীবন, নূতন প্রশংসার অনুকূল বায়ুতে সেই কর্ম্মের প্রতি অনুরাগ যেন হঠাৎ আরও শতগুণ বাড়িয়া গেল। এ জীবনে কর্ম্মের যাহা অণুমাত্রও অন্তরায় তাহার উপর মনটা আবার বিরূপ হইয়া উঠিল। সুরেশ্বর নিজের মনের কাছে শেষ পর্য্যন্ত স্বীকার করিলেনই যে, মেয়ে-স্টেনো নিতান্তই অফিসটাকে শুধু অতি-আধুনিক করিয়া লওয়ার জন্যই নয়। এই নিঃসঙ্গ জীবনে একটা ক্লান্তি আসিয়াছে, শুধু পুরুষ-সান্নিধ্যে দিনগুলা হইয়া পড়িতেছে রুক্ষ;—ভাবিয়াছিলেন, থাকুক না কাজে এমন একজন কেউ, যে তাহার চলাফিরা দিয়াই এই কাগজ-কলম, লেজার-ফাইল, লোহা-ইস্পাত, কুলি-মজুর দিয়া ঘেরা দিনগুলাতে একটু পরিবর্ত্তন আনিতে পারে। দোষ কি?

প্রশংসা পাওয়ার পর মনে যে জোয়ারটা নামিল, তাহাতে তাহাকে এটাও মানাইয়া ছাড়িল যে, আছে দোষ। নারীর একটু সান্নিধ্যও একটা বিলাসিতা সযত্নে পরিহার করিতে হইবে। সমস্ত জীবন এটুকুকেও খুব সাবধানে এড়াইয়া আসিয়াছেন বলিয়াই আজ তিনি কর্ম্মজীবনে এতটা সাফল্যের অধিকারী। এ লঘুতাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলিবে না।

মনের এই রকম বজ্র-কঠোর অবস্থায় মিস্ অমিতা সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল।

মিস্ সেনের বয়স হইবে বছর তিরিশ-বত্রিশ, এক-আধ বৎসর বেশি হওয়াও অসম্ভব নয়। অনপচয়িত যৌবন বয়সের সীমানা পার হইয়াও লুপ্ত হইয়া যায় নাই একেবারে। তবে মুখে দৃষ্টিতে একটি যে ক্লান্তির ছায়া আছে তাহাতে অনুমান হয়, দেহ যেমনই থাক্ মনটা যেন প্রৌঢ়ত্বেরও

গণ্ডী ডিঙাইয়া একেবারে বার্দ্ধক্যের কাছাকাছি গিয়া পড়িয়াছে। একটা যেন বহুদিন অপেক্ষা করার শ্রান্তি।...সুরেশ্বরের মনে হইল এই রকমটা মনের ভ্রান্তিও হইতে পারে।

একটা কথা; মহিলাটিকে দেখা মাত্রই সুরেশ্বরের ভ্রূ দুইটি একটু কুঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল, স্মৃতিতে যেন একটু দোল লাগিল; তখনই সে ভাবটা সামলাইয়া লইলেন। একটু প্রশ্নোত্তর হইল (নেহাৎ শুরু করা হিসাবে)—

আপনারই নাম মিস্ অমিতা সেন?

আজ্ঞে হাঁ।

(অস্বস্তির সহিত একটু চুপ করিয়া থাকার পর)

অফিস সম্বন্ধে আপনার কোন অভিজ্ঞতা আছে?

বিশেষ নয়, স্টেনোর পোস্ট,—বাড়িতে শর্ট-হ্যাণ্ড আর টাইপ রাইটিংটা শিখেছি, তাই ভাবলাম—

(সহজে পরিত্রাণ পাওয়া যাইবে তাহা হইলে, একটি স্বস্তির নিশ্বাস পড়িল।)

হুঁ। এর আগে কোথায় কাজ করতেন?

স্কুলে,—মিস্ট্রেসের পোস্টে। আই-এ-র বিশেষ কোন প্রস্পেক্ট নেই, তাই মনে করলাম—

মেয়েছেলের মুখের উপর সহজভাবে দৃষ্টি ফেলায় অভ্যস্ত নয়, তবুও কথাবার্ত্তার মধ্যে যতটুকু চাহিতে পারিতেছেন বা চাহিতে হইতেছে তাহাতে স্মৃতিতে অল্প অল্প ঘা পড়িতেছে। কেমন যেন মনে হইতেছে, আর একটু বসুক, আরও দুইটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

অথচ মেয়ে-স্টেনো রাখা হইবে না এটা তো ঠিক হইয়া গেছে।

নিজের মনের প্রতি কঠোর হইতে গিয়া সুরেশ্বর নবাগতার উপরই হঠাৎ একটু রূঢ় হইয়া উঠিলেন; একভাবে রূঢ়তাই বই কি। একটু বেখাপ্পাভাবেই বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু সারি, আমার বড্ড ভুল হয়ে যাচ্ছে মিস্ সেন, আপনাকে বসিয়ে রেখে, মানে—ইয়ে—আজ ম্যাটার অব ফ্যাক্‌ট্ এই অ্যাপয়েণ্টমেণ্টটা আমায় আপাতত স্থগিত রাখতে হচ্ছে—

মানে, হঠাৎ এই রকম স্থির করতে হ'ল—আপনাকে একটা টেলিগ্রামও করবার—তা, আমি সেকেণ্ড ক্লাসের ফেয়ারটা দিয়ে দিচ্ছি—বোথ ওয়েজ—আর যদি ভবিষ্যতে কখনও—মানে, যদি ভবিষ্যতে—

কথাগুলা যেন গায়ে গায়ে জড়াইয়া মুখে মিলাইয়া গেল। সামনে দেখা যাইতেছে, মিস্ সেনের মুখটা দারুণ নিরাশায় একবার ছাইপানা হইয়াই সঙ্গে সঙ্গে লজ্জায় অপমানে রাঙা হইয়া উঠিল। উঠিয়া দাঁড়াইলেন, অতগুলা অবান্তর কথার জন্য একটাও কিছু না বলিয়া যুক্তকরে নমস্কার করিয়া বলিলেন, না, এতে ভাড়া দেওয়ার কি আছে? আমি আসি তবে।

একটা যেন কি হইয়া গেল! সমস্ত শরীরটা যেন ঘিন্‌ঘিন্ করিতে লাগিল খানিকক্ষণ,—এ কী একটা বিসদৃশ ব্যাপার!—নিতান্তই একটা লজ্জাকর কাণ্ড!

তাহার পর দিবাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কাজের স্রোত আসিয়া পড়িল, প্রবল উন্মাদনার মধ্যে সামান্য একটা ঘটনা লইয়া লঘু ঐ অনুতাপটুকু কোথায় ভাসিয়া গেল!

২

কিন্তু সত্যই কি গিয়াছিল ভাসিয়া?

এখন মনে হইতেছে মনের কোথায় সুপ্ত ছিল, এই সময়টুকুর অপেক্ষায়।

সব যেন বিস্বাদ ঠেকিতেছে। সুরেশ্বর অফিসের পোষাকেই বারান্দায় ডেক-চেয়ারটা টানিয়া শরীর এলাইয়া দিলেন—সামনে রহিল পাহাড়তলির সুবিস্তীর্ণ উচ্চাঙ্গ প্রান্তর, আর হেমন্তের অপরাহ্ন—আকাশের গায়ে একখানি যেন করুণ পূরবী রাগিণী। বেতালা সংগতের মত দূরে পুলের গায়ে মাঝে মাঝে লোহা পেটার শব্দ হইতেছে। ওভারটাইমে জরুরী কাজ চলিতেছে। আজ সমস্ত সংযম লঙ্ঘন করিয়া মনটা একটি বিষণ্ণ মুখের চারিদিকে যেন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।...চেনা মুখ কি?...যেন এক-একবার খুব কাছে আসিয়া আবার মিলাইয়া যাইতেছে। মনে পড়িতেছে জীবনটা চিরদিনই এই রকম ছিল না, একটা সময় ছিল যখন ভাল-

লাগিয়াছিল কতকগুলি মুখ—বিভিন্ন সময়ে, বা একসঙ্গেই—কম বেশি করিয়া, তুলনার যাচাই-করা দৃষ্টিতে। সেই স্বপ্ন-বিলাসের যুগে বোধ হয় এই রকম একখানি মুখ পড়িয়াছিল চোখে। যতই নিবারণ করা যায়, মনটা ততই যেন সুদূরের সেই দিনগুলির পাতা উলটাইয়া উলটাইয়া কি একটা খুঁজিয়া বাহির করিতে চায়! অন্তরাগ যত গাঢ় হইয়া উঠিতে লাগিল, সংগ্রহের পথে সাঁওতাল দম্পতি যতই হইয়া পড়িতে লাগিল সুদূর, মনটা ততই যেন অধিকারের বাহিরে চলিয়া যাইতে লাগিল।··· শুধুই খোঁজা, শুধুই হাতড়ানো—এ কে ছিল? কাহাকে আজ এমন রূঢ় বিদায় দেওয়া গেল?

এমন সময় দূর ইতিহাসের পাতা ওলটানো বন্ধ হইল, পাওয়া গেছে; জীবনের কয়েকটি ঘটনা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। এক-খানি মুখ রেখায় রেখায় উঠিল বিকশিত হইয়া—সে এই মুখই, ঠিক এই মুখই তো—এইরকম শান্ত, নির্ভরশীল দৃষ্টি, আরও কচি বলিয়া আরও যেন নির্ভরশীল—

হ্যাঁ, এই সুরেশ্বরের জীবনেও একবার রোম্যান্সের রেখাপাত হইয়া-ছিল,—সে আজ প্রায় কুড়ি-বাইশ বৎসরের কথা।

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে পাস দিয়া সুরেশ্বর নূতন জীবনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আর কিছু করিবার পূর্ব্বে তিনি ধর্ম্মতলার একটি ভাল দোকানে গিয়া নিজের ফোটোটা তুলাইয়া লইলেন, বোধ হয় মনে হইল জীবনের এই সন্ধিক্ষণটিকে এই করিয়া একটু বিশিষ্ট করিয়া রাখা যাক, আজকের সুরেশ্বরও অন্যদিনের সুরেশ্বর হইতে একটু আলাদা হইয়া থাকুক।

চেহারা লইয়া সুরেশ্বরের বরাবর একটা সুখ্যাতি আছে। সে সময় ভরা যৌবন, তাহার উপর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাপ দেওয়া অটুট স্বাস্থ্য। ফোটোটা যে দিন আনিতে গেলেন, ফোটোগ্রাফার মিস্টার ব্যানার্জি বলিলেন, আপনার একখানি ফোটো মাউণ্টে বাঁধিয়ে আমার শো-কেসে রেখে দিলাম, নিশ্চয় আপত্তি করবেন না। ফোটোটি উঠেছে খুব ভাল, তা ভিন্ন—

'এমন চেহারাও সচরাচর চোখে পড়ে না'—এ কথাটা তো মুখ ফুটিয়া বলা যায় না। মৃদু হাস্যের সঙ্গে ওটুকু উহ্যই রাখিয়া দিলেন। সুরেশ্বরও একটু লজ্জিতভাবে হাসিয়া কহিলেন, না, আপত্তি আর কি, আমি নিজে তো শো-কেসে বন্ধ হচ্ছি না?

আসুন দেখবেন।

একটি খুব নূতন ডিজাইনের নিকেলের-মাউণ্টে হেলাইয়া দাঁড় করানো রহিয়াছে ফোটোটা, বেশ ভাল লাগিল সুরেশ্বরের।—নিজের সৌন্দর্য্য মর্য্যাদা পাইলে লাগে না ভাল? কিন্তু এর চেয়েও ভাল লাগিয়াছিল অন্য একটা ফোটো। বোধ হয় সাধারণ শিষ্টাচার বশেই ফোটোগ্রাফার সুরেশ্বরের ফোটোর ঠিক বাঁ পাশেই একটি কিশোরের ফোটো হেলাইয়া রাখিয়াছে, তাহার পাশেই একটি তরুণীর। মুখসাদৃশ্য দেখিয়া মনে হয় দুজনে ভাই বোন।

সমস্ত দিন এবং সমস্ত রাত না হইলেও তাহার বেশ একটা মোটা অংশ দুইটি নরম চোখ সুরেশ্বরের চোখের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল। ব্যাপারটা কিছুই নয়, ফোটোর পাশে আর একটা ফোটো দাঁড় করানো আছে এই মাত্র, কিন্তু সে সময়ের যা মন, এই ঘটনাটুকুই সুরেশ্বরের নিকট অর্থে অর্থে যেন পূর্ণ হইয়া উঠিল। একটি অদ্ভুত আনন্দের সঙ্গে একটি অদ্ভুততর বেদনায় মনটি রহিল ভরিয়া। দুইটা দিন যে কি করিয়া কাটিল যেন বুঝিয়া ওঠা যায় না। তৃতীয় দিনে মনের সঙ্গে অনেক ধস্তাধস্তি করিয়া সুরেশ্বর শেষে হার মানিয়া ধর্ম্মতলার দিকে যাত্রা করিলেন এবং অনেক আগে ট্রাম থেকে নামিয়া পায়ে হাঁটিয়া গিয়া দোকানে উঠিলেন।

ফোটোগ্রাফার মিস্টার ব্যানার্জি নমস্কার করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন, আসুন।

চোখ দুইটা একটু অবাধ্য ভাবেই শো-কেসের উপর গিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গেই সঙ্কোচে আসিল ফিরিয়া, তবে সেই দুইটি চক্ষুর স্মৃতিকে ওরই মধ্যে একটু স্পষ্ট করিয়া লইয়া। সুরেশ্বর ঘরে প্রবেশ করিতে করিতে বলিলেন, এই দিক দিয়েই একবার সারকুলার রোডের দিকে যাচ্ছিলাম, মনে করলাম, একবার আপনার দোকানটাও হয়ে যাই—

বেশ করেছেন, বসুন। এদিকে এলেই আসবেন দয়া ক'রে।

একটু হইল এদিক ওদিক দুই-একটা কথা, তবে বেশ জমিল না। দোকানদারের কাছে কাজ না থাকিলে জমে না কথা, তাহার উপর মনে এই কথাটাও চাপিয়া রহিল যে, এ-যাত্রার সঙ্গে সারকুলার রোডের কোন সম্বন্ধই নাই। এই সময় জড়তা কাটাইয়া—আচ্ছা 'তবে আসি' বলিয়া সুরেশ্বর উঠিয়া পড়িলেন। সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময় আর একবার শো-কেসটার দিকে দৃষ্টিপাত করিবার বাসনা হইল, কিন্তু জড়তাটা অতদূর পর্য্যন্ত কাটানো গেল না।

আবার গোটা তিনেক দিন কাটিয়া গেল, ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল, এ ভাবে কাটানো চলিবে না, একটা কিছু ব্যবস্থা করিতেই হইবে। কিছু না হোক, মাঝে মাঝে একবার দেখাও চাই,—ঐ ফোটোটিই। আর কিছু কি পোড়া ভাগ্যে জুটিবে?

অনেকটা দূর—কোথায় বরানগর, কোথায় কলিকাতার একেবারে মাঝখানে ধর্ম্মতলা! অবশ্য বরাহনগরের লোকের যে কলিকাতার কাজ থাকিতে মানা আছে এমন নয়, তবে প্রত্যেকটি কাজ পথেই পড়িবে, এই দোকানটির সামনে হইয়া—এ কথা লোককে কি করিয়া বিশ্বাস করানো যায়!

এ দিকে ঐ এক কাজ ভিন্ন অন্য কোন কাজে মনও বসিতেছে না।

কিন্তু তর্ক লইয়াই মানুষ বাঁচিয়া নাই, চতুর্থ দিন বৈকালে সুরেশ্বর আবার দোকানে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

অপ্রত্যাশিত সুযোগ,—ফোটোগ্রাফার ভদ্রলোক দোকানে নাই। রহিয়াছে চাকর একটা। ছোকরা, দোকানপাট ঝাড়ে, এধার ওধার বাইরের কাজে যায়,—এই রকম গোছের।

জানাইল ব্যানার্জ্জিবাবু বাহিরে গিয়াছেন।

ফিরবেন কখন?

আর আধঘণ্টাটাক দেরি হবে বাবু—ফটো তুলতে গেছেন, খুব বেশি তো তিন কোয়াটার?

তিন কোয়াটার? তবেই তো!

মুখটা কুঞ্চিত করিল, যেন আসার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা না হওয়ায় কী ক্ষতিটাই যে হইয়া গেল!

তবুও শো-কেসটির দিকে যাইতে কেমন সঙ্কোচ হইতেছে, ছোঁড়াটার কাছেও। অথচ এত সুযোগ, ফিরিতে ফিরিতে মাত্র এক মুহূর্তের জন্য দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া চলিয়া যাইতে মন সরে না। ফোটোগ্রাফারের সঙ্গে সেদিন কথার অভাব ঘটিয়াছিল, ছোঁড়াটার সঙ্গে ততটা হইল না। সুরেশ্বর দুই-পা পায়চারি করিয়া যেন অন্যমনস্কভাবেই শো-কেস্‌টার পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন, কতকটা নিজের মনেই বলিলেন, তাই তো!—তিন কোয়াটার! ভাবছি, অপেক্ষাই ক'রে যাব কি না!...কি, একটু পরে ঘুরেই আবার আসব—

চাকরটা প্রশ্ন করিল, কি দরকার বাবু, তিনি যদি এর মধ্যে ফিরে আসেন কি বলব?

সে তুই গুছিয়ে বলতে পারবি না।...গেছেন কোথায় বল দিকিন?

ভবানীপুরে—মিস্টার সেনের বাড়ি।

তাহার পর বলিল, ওই যে শো-কেসে মিস্টার সেনের ভাই আর বুনের ফটো রয়েছে বাবু। তাঁর পরিবার এয়েচেন, আবার তাঁর ফটো নিতে গেচেন।

এ পরিচয় দিবার তাৎপর্য্যটা কি সুরেশ্বর বুঝিতে পারিলেন না, বোধ হয় এইজন্য যে, ছেলেমানুষেরা একটা কথা জানিলে প্রকাশ করিবার জন্য সদাই উৎসুক থাকে। তবে ওঁর একটু সুবিধা হইল। সিঁড়ির গোটা তিন ধাপ নীচে না নামিলে শো-কেসের ফোটোগুলা ঠিকমত দেখা যায় না, সুরেশ্বর নামিয়া আসিয়া প্রশ্ন করিলেন, কোন্ ফোটো?

ছেলেটা নামিয়া আসিয়াছে, তাঁহার ফোটোর পাশে সেই মেয়েটির ফোটো দেখাইয়া বলিল, ওই যে মিস্ সেনের ফটোগেরাফ।

সুরেশ্বরের বুকের ধুকধুকুনিটা হঠাৎ বাড়িয়া গেল।...মিস্ সেন!—সুরেশ্বরও বৈদ্য, পদবী গুপ্ত; একটা যেন দৈবনির্দ্দেশ রহিয়াছে। আর একটা কথা, মিস্ সেনের ফোটোটি এবারে সুরেশ্বরের ফোটোর পাশেই, ছেলের ফোটোটা তাহার পাশে।

অতি সুমিষ্ট একটা সঙ্কোচে সুরেশ্বরের সমস্ত শরীর মন যেন আচ্ছন্ন হইয়া গেল।...পরিবর্ত্তনের ইতিহাসটা ছোঁড়াটাই বলিল, আমিই আজ ঝাড়বার মোছবার সময় এ রকম ক'রে রেখে দিলুম, ভাল হ'ল না বাবু? ওনার ফটোর দুপাশে দুটো ভাল ভাল ফটো রইল।...হ'ল না ভাল?

নিষ্পাপ ছেলেমানুষের মন, সুরেশ্বর কি করিয়া বুঝায় ওকে যে, ভাল হইয়াও একদিক দিয়া একেবারেই ভাল হয় নাই?...কণ্ঠের জড়তা কাটাইয়া বলিল, তোর বাবু থাকতে দেবে না, আগেকার মতন ক'রে দে।

কেন? ঠিক থাকতে দেবে, দেখবেন আপনি এসে আপনারা তিনজন সুন্দর একসঙ্গে কেমন মানাচ্চে...কখনও পাল্টাবেন না বাবু—দেখে নেবেন আপনি...

নিজের সৌন্দর্য্যজ্ঞান সম্বন্ধে জিদ ধরিয়া বসিল,—ফোটাগ্রাফারের দোকানে কাজ করে—যে-সে নয় তো! সুরেশ্বরেরও কি মনে হইল, জিদটা ভাঙিবার জন্য খুব অতিরিক্ত চেষ্টা করিলেন না। ঘড়িতে দেখিলেন, আধ ঘণ্টা প্রায় হইয়া আসিয়াছে, সময় যেন পাঁচ-সাত মিনিটেই এতটা পথ সারিয়া লইল।

তবে পারি তো আসছি ফিরে।—বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন সুরেশ্বর।

৩

সৌভাগ্যই হোক বা দুর্ভাগ্যই হোক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রেরা রোম্যান্সের ছোঁয়াচ থেকে মুক্তই থাকে। না আছে শেলী, না আছে শেক্‌স্‌পিয়ার—নিশ্চিন্ত। সুরেশ্বরও ছিলেন, কিন্তু যখন লাগিল ছোঁয়াচ তখন যেন একেবারেই জীর্ণ করিয়া ফেলিল।

বিশ্বাস করা শক্ত—কিন্তু সত্যই উপরি উপরি দুই দিন সুরেশ্বর দোকানটিতে হানা দিতে চেষ্টা করিলেন। উলটা দিকের ফুটপাথে বেশ খানিকটা দূরে আর নিরাপদ অন্তরালে দাঁড়াইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা

অপেক্ষা করিয়া থাকেন,—ফোটোগ্রাফার মিস্টার ব্যানর্জি একবার বাহির হইয়া গেলেই—আবার গিয়া জরুরী কাজের কথা পাড়িয়া ছোঁড়াটার কাছে বিরক্তি আর নৈরাশ্য প্রকাশ করিবেন। কি রকম যোগাযোগ, মিস্টাব ব্যানার্জি পাদমপি নড়িলেন না।

তৃতীয় দিন সুরেশ্বর আবার কপাল ঠুকিয়া ঢুকিয়া পড়িলেন। দেখিলেন, কপালের জোর আছে। মিস্টার ব্যানার্জি সাগ্রহে অভ্যর্থনা করিলেন, আসুন, অনেকদিন আসেন নি এদিকে।

ছোঁড়াটা তাহা হইলে সেদিন আসার কথাটা বলিতে ভুলিয়া গেছে।

আসা কি সহজ?—হাসিয়া কথাটা একরকম শেষ করিবার পূর্ব্বেই ছোঁড়াটা একটা পালকের ঝাড়ন হাতে করিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইল, বলিল, উনি তো এসেছিলেন সেদিন, পরশু, না, তরশু···কবে যে এসেছিলেন বাবু?

সুরেশ্বর সামলাইয়া লইযা একটু হাসিযা বলিলেন, না, তরশুই। সেই কথাই তো বলছিলাম—আসা তো সোজা নয় সেই বরানগর থেকে, তবু তো এসেছিলাম তরশু একবার।

কোন বিশেষ কাজ ছিল নাকি? এ ব্যাটা তো বলে নি আমায়!

কাজ—মানে—কাজ—এক রকম বলতে গেলে—

কপালের জোর ছিল, এই সময় একটি ছোট মোটর, দোকানের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল এবং মিস্টার ব্যানার্জ্জি হঠাৎ ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

এক মিনিট।—বলিয়া সুরেশ্বরের নিকট ছুটি লইয়া তাড়াতাড়ি গিয়া ফুটপাথে নামিয়া দাঁড়াইলেন এবং একবার যুক্তকরে নমস্কার করিয়া লইয়া মোটরের দরজাটা খুলিয়া ধরিলেন। দুইজন তরুণী এবং একটি বছর দশ-বারোর কিশোর মোটর থেকে নামিল।

জীবনের সেই কয়েকটি মুহূর্ত্ত আসিয়াছিল—সমস্ত ব্যাপারটি যেন চোখের সামনে জ্বলজ্বল করিয়া উঠিতেছে।···একজন তরুণী চেনা, ছেলেটিও—অবশ্য ফোটোগ্রাফে; ওদের ফোটা এখনও সুরেশ্বরের ফোটোর পাশে বসানো রহিয়াছে, আজও সিঁড়ি দিয়া উঠিবার সময় দেখিল।

আগ্রহে, উদ্বেগে, এক প্রকারের ভয়েও সুরেশ্বরের সমস্ত অন্তরাত্মা কণ্ঠে আসিয়া জড়ো হইয়াছে। এত বড় যোগাযোগও হয় জীবনে!... গল্প করিতে করিতে চারজনে দোকানে উঠিয়া আসিলেন। বেশ বোঝা গেল, সেন-পরিবারের সঙ্গে মিস্টার ব্যানার্জির বেশ পরিচয় এবং হৃদ্যতা আছে, হয়তো ফোটোগ্রাফ লইয়াই, হয়তো আরও পূর্ব্বের জানাশোনা। ভিতরের ঘরে একটা ইজেলের উপর কাপড় ঢাকা একটা ব্রোমাইড এনলার্জমেণ্ট ছিল, রঙ ফলানো হইতেছে, চারিজনে সেইটার সামনে গিয়া দাঁড়াইলেন; মিস্টার সেনের মায়ের এনলার্জমেণ্ট—খানিকটা আলোচনা হইল। বাহিরে আসিয়া নিতান্ত নিরুদ্দেশ ভাবেই আরও দুই-একটা ফোটো দেখা-শোনার পর মিস্টার ব্যানার্জি ওঁদের পরিচয় করাইয়া দিলেন। নূতন মহিলাটি মিস্ সেনের ভ্রাতৃজায়া। সুরেশ্বর সেই প্রথম নমস্কার করিলেন মিস্ অমিতা সেনকে। কত মধুর! হৃদয়ের মধ্যে কি নূতন জগতের তোরণ খুলিয়া গেছে, নমস্কার নয় তো, করজোড়ে সেই স্মিতময়ীকে যেন সেই নূতন জগতে আমন্ত্রণ করিয়া লওয়া।

আজ, কুড়ি বৎসর পরে সেই মিস্ অমিতা সেনকে করা হইল শেষ নমস্কার—বিদায়।

*　　　*　　　*

সূর্য্য অস্ত গেছে, খণ্ড মেঘের গায়ে গায়ে শুধু রঙের প্রলেপ—যেন বুকের রক্ত ঢালিয়া গেল। শীতের হাওয়া আরও একটু তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল। সাঁওতাল দম্পতি নদী পার হইতেছে, গতি আরও মন্থর।

*　　　*　　　*

এত কথা,—জীবনের সঙ্গে যে সবের সম্বন্ধ এত নিবিড় বলিয়া আজ মনে হইতেছে, আরও একদিন হইয়াছিল মনে—কোথায় ছিল চাপা এতদিন এসব? লোহার তলে?

লোহার তলেই বটে, জীবনটাকেও নিষ্পেষিত করিয়া দিয়া গেল এই বোল্ট্, নাট্, জয়েস্ট্, অ্যাঙ্গল্, শীট্...

পরিচয়ে পরিচয়ে একটু সম্বন্ধও বাহির হইয়া পড়িল।...লক্ষ্ণৌয়ে সুরেশ্বরের কাকা থাকেন?—ডাক্তার হেম গুপ্ত?—ওমা, তিনি তো

মিসেস সেনের ভগ্নীর জেঠশ্বশুর হন, অবশ্য একটু দূরসম্পর্কের!···কি আশ্চর্য্য!

মিস্টার ব্যানার্জি হাসিয়া বলিলেন, আপনাদের বৈদ্যদের তো সম্বন্ধ না বেরুলেই আশ্চর্য্য—আমি তো এই জানি।

নূতন প্রীতিতে হাসি একটু বেশি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কথাবার্ত্তা আরও অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিল, নিমন্ত্রণ পর্য্যন্ত গিয়া উঠিল।

ছেলেটি কথা কহিতেছিল না, তবে অত্যন্ত কুতূহলী ছেলেমানুষী দৃষ্টিতে সুরেশ্বরের মুখের পানে থাকিয়া থাকিয়া তাকাইতেছিল; একবার দিদির কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া কি বলিল, দিদি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চাপা গলায় বলিল—আচ্ছা থাক্।

সুরটা একটু ধমকের।

গল্পের একটু বিরতি পাইয়া ছেলেটি এবার ভাজের কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া কি বলিল।

সত্যি নাকি? দেখি তো।—বলিয়া তিনি শো-কেসের দিকে পা বাড়াইলেন। একবার গ্রীবাটি ঘুরাইয়া বলিলেন, আসুন মিস্টার ব্যানার্জি, আপনার শো-কেসটা দেখি, সত্য বলছে, মিস্টার গুপ্তর ফোটোও নাকি ডিস্‌প্লে করেছেন।···মিস্টার গুপ্তও আসুন না; অমিতা, এস।

অমিতা গেল না; সিঁড়ি দিয়া উঠিবার সময়ই শো-কেসে তাহার নজর পড়িয়াছিল, দুই পা গিয়া রাঙিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। তাহারই পার্শ্ব দিয়া সুরেশ্বর চলিয়া গেল; সেও রাঙিল; কিন্তু না গিয়া উপায় ছিল না।

কত স্পষ্ট মনে পড়িতেছে আজ, কিন্তু কত অসময়ে!

একটু এদিক ওদিক আলোচনা হইল,—হ্যাঁ, ফোটোটি বেশ উঠিয়াছে।···মিসেস সেনের মুখে একটি চটুল, খুব সূক্ষ্ম হাসি লাগিয়া আছে, কি যেন একটা বলিলেন, শেষ পর্য্যন্ত বলিয়াও ফেলিলেন, বেশ জায়গাটিও পেয়েছেন মিস্টার গুপ্ত। কন্‌গ্র্যাচুলেট করছি।

দুই দিকেই ঠাট্টার সম্বন্ধে তো?—একদিকে না হয় একটু বেশি দূরের।

ভুলটা মিস্টার ব্যানার্জির এই এতদিনে চোখে পড়িল। খুব অপ্রতিভ হইয়া শো-কেসটা তাড়াতাড়ি খুলিয়া ফোটো দুইটি আলাদা করিয়া বসাইয়া দিলেন—বেশ খানিকটা আগে পিছে করিয়া। বলিলেন, সরি, চাকরটার কাজ···গর্দভ !

সুখে লজ্জায় চাপা কৌতুকে কী যে কয়েকটা মিনিট কাটিল !

চাপা দিতে গিয়া যে ব্যাপারটি প্রকাশ হইয়া পড়িল, সেটা সবাইকেই অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে—নানা ভাবে। অমিতার ভাই শুধু নিরীহ কণ্ঠে বলিল, কেন সরালেন ? বেশ তো ছিল।

৪

এই হইল সাতটি দিনের রোম্যান্স সুরেশ্বরের জীবনে—প্রথম এবং শেষ।

বাড়ি আসিয়া সুরেশ্বর একটা অফিস-খামে চিঠি পাইলেন। খামের গায়ে প্রেরকের ঠিকানা দেখিয়া কম্পিত হস্তে খামটা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন—নিয়োগপত্র।···দরখাস্ত একটা করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু এত বড় কণ্ট্রাক্টরের ফারমে যে কলেজ ছাড়িয়াই এতবড় দায়িত্বের কাজ আশা করেন নাই।···আর কী বিরাট একটা কাজ !

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে উৎকর্ষপ্রাপ্ত শিরাপেশীগুলা কর্ম্মের উন্মাদনায় সব একসঙ্গে যেন নাচিয়া উঠিল। কি একটা আনন্দ !—কী আনন্দ !—এক মুহূর্ত্তেই কোথায় ভাসিয়া গেল রোম্যান্স ! ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ফার্স্ট বয়—সে কি এই ফিন্‌ফিনে হালকা একটা রোম্যান্সের জন্য সৃষ্টি হইয়াছিল ? সুরেশ্বরের জীবনের রোম্যান্স তো কাজ—কাজ—শুধুই কাজ—

তাহার পর গিয়া একটানা কর্ম্মের জীবন—সাফল্যের পর সাফল্য, যশের পর যশ, উন্মাদনার গায়ে উন্মাদনা—ডাইনে বাঁয়ে দেখিবার অবসর হয় নাই। রোম্যান্স এমন গেল ধুইয়া মুছিয়া যে অতি ঘরোয়া যে রোম্যান্স বিবাহ, সেটাকেও কেমন যেন অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হইল—প্রায় হেয় একটা ব্যাপার।···রেলের প্রখ্যাত কণ্ট্রাক্টর সুরেশ্বর

শুধু যেন একটা এক্স্প্রেস ট্রেনেরই উদ্দাম গতিতে একেবারে জীবনের এইখানটিতে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

আজ হেমন্তের অপরাহ্ণে আসিয়া গতি হঠাৎ স্তব্ধ হইয়া গেল। কি আছে এই শীতেল হাওয়ায়, কি আছে এই উদাস করা সোনালী রঙে? হেমন্তের দিনশেষে যে ঝিঁঝিঁটি ডাকে, তারও একটানা সুরে কি শুধু একটানা কান্নাই ভরা?

কে ছিল অমিতা? সেই স্বচ্ছল অবস্থা কোথায় গেল? কেন গেল? অমিতাও বিবাহ করিল না কেন? আজ আসিয়াছিল কেন সে? জানিয়া শুনিয়াই কি? আর আশ্চর্য্য—একটি মাত্র বাঙালীর মেয়েকে বাছিলেন সুরেশ্বর—সেও অন্য কেহ নয়, সেই বিশ বৎসর আগেকার সেই অমিতা। এত আশ্চর্য্য ব্যাপারও ঘটে জীবনে! অমিতাকে যায় না আর ফিরাইয়া আনা?

সন্ধ্যা নামিয়া গেল। নিতান্ত মোহমায়ার মতই অল্প একটু রঙের আমেজ আকাশের একেবারে উচ্চস্তরে এক-আধটা মেঘখণ্ডে এখনও লাগিয়া আছে; সেই সাঁওতালী দম্পতিটি নদী পারাইয়া গেছে, তীরের ঢালুতে দুইটি কালো রেখার মত তাহাদের দেখা যায়—গতি মন্থর; তবু প্রাণবন্ত। পুরুষটির মাথায় ধানের ফসল সোহাগের দোল খাইতে খাইতে চলিয়াছে।

এরই পাশে কোথায় যেন সুরেশ্বর আরও দুইজনকে দেখিতে পাইতেছেন মাঝে মাঝে—দুজনেরই অনেক আগে-পিছে, নিঃসঙ্গ শ্রান্ত ব্যর্থ···কেহ কাহাকেও পাইবে না জীবনে। নীড় নাই, সোনার ফসলও নাই;—শ্রান্ত সন্ধ্যায় কোথায় গিয়া কি গুছাইয়া তুলিবে?

অস্তরাগের শেষতম আভাসটুকুও আকাশে মুছিয়া গেল।

কুইন অ্যান

জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট উড্‌বার্ন সাহেব কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বিলাত যাইতেছেন, আসবাবপত্র সব বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। দুইটা কুকুর সঙ্গে যাইবে, গোটা চারেক বিলি হইয়া গিয়াছে। বাকি আছে একটি ঘুড়ী। সাহেব ওটাকে প্রথম হইতেই ওয়েলার জাতীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া বড় ভুল করিয়া বসিয়া আছেন। প্রবল খিলাফৎ আন্দোলনের যুগ; যাহাদের কিনিবার ক্ষমতা আছে, বলিতেছে, আরেবিয়ান জাতের হইলে কেনা যাইত। দুই-একজন নন্‌-খিলাফতিষ্ট রাজি হইয়াছে, কিন্তু দর উঠিতেছে না। তাহা ছাড়া সাহেবের কানে উঠিয়াছে, ইহারা নিজেরা ব্যবহার করিবে না, তিনি যাত্রা করিলেই জাত ভাঁড়াইয়া ঘুড়ীটাকে প্রাচ্য করিয়া লইবে, তাহার পর চড়া দামে ছাড়িয়া দিবে।

এদিকে সময় আর মাত্র দিন পনরো-ষোল; মীমাংসা একটা হওয়া চাইই। অথচ সাহেবের ইচ্ছা নয় যে, ঘুড়ীটা যাহার তাহার হাতে পড়িয়া কষ্ট পায়, একাদিক্রমে দশটা বৎসর একসঙ্গে আদরযত্নে কাটাইল! কি যে করিবেন, ব্যাকুলভাবে চিন্তা করিতে করিতে একদিন হঠাৎ রায় সাহেবের কথা মনে পড়িয়া গেল। রায় সাহেব ননীগোপাল চক্রবর্ত্তী জমিদার অ্যাণ্ড অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট। তাঁহার হাতের দেওয়া খেতাব, লোকটা খাতির রাখিলেও রাখিতে পারে। সাহেব ভাবিলেন, দেখাই যাক না ভেজে কি না; ঘুড়ীটা তাহা হইলে সুখে থাকে।

রায় সাহেবকে সেলাম পাঠানো হইল। উপস্থিত হইলে অবান্তর নানা রকম কথার পর আসল কথাটা পাড়িলেন। দেখা গেল, ভিজিয়া থাকাটাই রায় সাহেবদের স্বাভাবিক অবস্থা, বেশি সিঞ্চিত করিতে

হইল না। সাহেব যে অন্যের হাতে প্রিয় ঘুড়ীটাকে বিশ্বাস করিয়া দিতে চান না, আর এতগুলা হোমরা-চোমরাদের মধ্যে তিনিই যে সাহেবের বিশ্বাসভাজন বলিয়া মনোনীত হইয়াছেন, ইহার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন। সাহেবের যখন সেই রকমই অভিরুচি, তখন তিনি উপহার হিসাবেই সেটিকে লইতে রাজি আছেন, গৌরবের সহিত রাজি আছেন। তবে দাম হিসাবে নয়, শুধু বিলাতে গিয়া তিনি যাহাতে ওই রকমই একটি ঘুড়ী অবিলম্বে কিনিয়া লন, সেজন্য অল্পস্বল্প করিয়া অন্ততপক্ষে হাজারখানেক টাকাও অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। রায়-সাহেবোচিত বিনয়ের সহিত একটু তর্কও করিতে ছাড়িলেন না, তা যদি না করেন সাহেব, তো হুজুরের দান দেখে অধীন না হয় সর্ব্বদা হুজুরকে স্মরণ করবে, কিন্তু অধীনকে মনে করার হুজুরের কাছে থাকবে কি? না, সে হবে না।

উঠিবার সময় রায় সাহেবও আসল কথাটা পাড়িলেন, বার্থ-ডে অনার্সের সময়টা আসছে, হুজুর যাচ্ছেন, আশেপাশেই ক-বছরের মধ্যে পাঁচ-ছটা রায় সাহেব হয়ে গেল, ছ্যাকড়া-গাড়ির মত বেড়ে যাচ্ছে, ওতে আর মান থাকে না। লোকে গালাগাল দেওয়ার জন্যে আজকাল কথাটা ব্যবহার করছে।

সাহেব কথা দিলেন, আগন্তুক ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট ফর্দ্দ দিবার সময় তাঁহার কথা বিশেষ করিয়া বলিয়া দিবেন। উঠিবার সময় করমর্দ্দন করিয়া বলিলেন, আমার মস্ত বড় একটা সান্ত্বনা রইল যে, ঘুড়ীটা একজন সমঝদার আর হুঁশিয়ার ঘোড়সওয়ারের হাতে পড়ল। শুনলাম, এ তল্লাটে নাকি এ বিষয়ে আপনার সমকক্ষ আর নেই কেউ।

রায় সাহেব নিজের প্রশংসায় লজ্জিত হইয়া বলিলেন, না, তেমন কিছু নয়, তবে ঘোড়া জিনিসটা ছেলেবেলা থেকে চড়ার অভ্যাস আছে, এই যা।

২

কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়, তবে পনরো আনা বাড়াইয়া বলা। বয়স যখন চৌদ্দ কি পনরো হইবে, রায় সাহেব ফোটো তুলিবার জন্ম সখ করিয়া একবার একটা টাট্টুতে চড়িয়াছিলেন, একটা মহারাষ্ট্রী ব্যবসাদার বিক্রয় করিতে আনিয়াছিল। চড়ার পরমুহূর্ত্ত হইতে ঘোড়াটা বনবন করিয়া অল্প পরিসরের মধ্যে এ রকম ঘুরিতে আরম্ভ করিয়া দেয় যে, প্রায় আধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ঘাড়ের চুল আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিতে হইয়াছিল; সবে নূতন পৈতা হইয়াছে, গায়ত্রীর উপর খুব বিশ্বাস, এক হাতে ভূর্ভুবঃ স্বঃ, আর এক হাতে ঘোড়ার ঘাড়ের রোমরাশি।

পরে জানা গেল, সেটি সার্কাসের ঘোড়া। সেই যে কেমন একটা আতঙ্ক ঢুকিয়া গেল রায় সাহেবের মনে, সেই হইতে ও জানোয়ারটি সম্বন্ধে চাণক্যের উপদেশ তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া আসিয়াছেন, সার্কাসের ঘোড়া বা বাহিরের ঘোড়া বাছেন না, ভাবেন, রেসের ঘোড়া হইলেই বিপদ কম হইত নাকি? সে বরং আরও বড় করিয়া চক্কর মারিত।

কিন্তু রায়-সাহেবির মোহ, উপায় কি?

তাহা ছাড়া আরও একটু কথা আছে। নিশ্চিন্ত জীবনের সবচেয়ে যাহা বড় চিন্তা, কিছুদিন হইতে তিনি তদ্দারা নির্ম্মমভাবে আক্রান্ত। পরিবর্দ্ধমান ভুঁড়ি তাঁহাকে হিমসিম খাওয়াইয়া ছাড়িতেছে। ডাক্তারেরা বলিয়াছিলেন, এর দাওয়াই—বেড়ানো; সেটা উত্তরোত্তর অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। এদিকে ওরা রব তুলিয়াছিল, তাহা হইলে ঘোড়ায় চড়ুন। বিশ্রী রকম গরম পড়িয়া কষ্ট বাড়িয়াছে। দোমনা হইয়া কয়েকদিন হইতে ভাবিতেছিলেন, মন্দ কি! একটা তেমন শান্তশিষ্ট, প্রভুভক্ত, বিশ্বাসপরায়ণ, বাধ্য, ভব্যসভ্য, নিরীহ, গোবেচারী গোছের ঘোড়া যদি পাওয়া যাইত!

এই সময়টায় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তলব করিলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব যে দিন চলিয়া গেলেন, সেই দিন বৈকালে সাহেবের সহিস আমির হোসেন ঘুড়াটাকে আনিয়া হাজির করিল। একটা জিনিস বটে! দীর্ঘ নিটোল শরীর, উন্নত বর্ত্তুল গ্রীবা, বিশাল চক্ষু দুইটি প্রাণের দীপ্তিতে ভরা, এক মুহূর্ত্তে সুস্থির নয়—চনমন চনমন করিতেছে, ক্ষুরের আওয়াজে আর সাজের মসমসানিতে জায়গাটা যেন জাগিয়া উঠিল। আমির হোসেন জানাইল, ঘুড়ীর নাম—কুইন অ্যান।

পারিষদেরা বলিল, হ্যাঁ, হুজুরের যুগ্যি ঘুড়ী বটে; গা নয় তো, কাচ—মাছি বসলে পিছলে পড়বে।

অতি মসৃণ গাটার দিকে চাহিয়া রায় সাহেব শুষ্ককণ্ঠে বলিলেন, হুঁ, তবে আমি তাড়াতাড়ি ওকে কিছু বলছি না। খাক-দাক জিরুক কদিন। ঘোড়ার নিয়ম হচ্ছে, মাঝে মাঝে বেশ দিনকতক বসিয়ে রাখা।

যাহারা ঘোড়ার সম্বন্ধে কিছু বুঝেন, তাঁহাদের বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না, ঘোড়ার নিয়ম ঠিক বিপরীত। অভিজ্ঞ আমির হোসেন রায় সাহেবের ভুলটা শুধরাইয়া দিতে যাইতেছিল, পারিষদদিগের একজনের চোখ-টিপুনিতে থামিয়া গেল।

রায় সাহেব বিচক্ষণের মত একটু চিন্তিতভাবে বলিলেন, আচ্ছা, ঘোড়া এত মোটা হওয়া কি ভাল—কোনখানে একটু টোল নেই, তোমরা কি বল হে?

দুই-একজন ব্যাপারটা বুঝিল, মাছি পিছলানোর কথাটা রায় সাহেবকে ভড়কাইয়া দিয়াছে। বলিল, আজ্ঞে, ঘোড়া একটু যদি রোগাশোগা না হ'ল তো কি হ'ল? যদি নিজের মাংস বইতেই হয়রান হ'ল তো সওয়ারী বইবে কখন?

একজন বলিল, আর তা হ'লে তো ঘোড়ায় না চ'ড়ে লোকে গোল বালিশেই চড়তে পারত হুজুর।

রায় সাহেব বলিলেন, দৌড়োয় কেমন আমির হোসেন? মানে, ইয়ে তো বেশ?

আমির হোসেন গর্ব্বের গাঢ়স্বরে বলিল, তীরের মত হুজুর, একটু রাশ আলগা দিয়ে একটুখানি ইশারা, বাস্, আর দেখতে হবে না।

রায় সাহেব বিবর্ণমুখে বলিলেন, আমিও তাই চাই। ভাল কথা, থামাবার ইশারাটা কি? ওর নাম কি, সব ঘোড়া আবার একই ইশারাতে থামে না কিনা; আমি ছেলেবেলায় যে ঘোড়াটায় চড়তাম—

থামানো এক হ্যাঙ্গাম হুজুর, এক-এক বার দেখেছি, রাশ টেনে প্রায় শুয়ে পড়তে হয়েছে সাহেবকে, তবে থেমেছে।

ঘুড়ীটা ছটফট করিতেছিল, পিঠে দুইটা সাবাসির চাপড় কষিয়া আমির হোসেন বলিল, তবে আর বলছি কি, হুজুরের যুগ্যি ঘুড়ী একেবারে। তবে একটা বড় দোষ আছে।

রায় সাহেব তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, কি, কি দোষ? আগ্রহটা চাপিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু বেশ বুঝা গেল, অশ্বিনীর গুণের তালিকায় ভিতরে ভিতরে উদ্বিগ্ন হইয়া দোষের আশায় অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

আমিন হোসেন বলিল, এক-এক সময় কি দোষ হয়, কোনমতেই চাল ধরে না তখন।

চাল ধরে না মানে কি? দৌড়ুতে চায় না?

দৌড়ুনো দূরের কথা, বিলকুল নড়তে চায় না। এ ঝোঁক এক-এক বার দু-তিন দিন পর্য্যন্ত থেকে যায়। সাহেব কত ডাক্তার দেখালেন, কত—

নড়তে চায় না মানে কি? অনেক ঘোড়া চলবে না, কিন্তু একই জায়গায় ঘুরপাক খাবে, অন্তত সেটুকুও নিশ্চয় চলে তো?

আজ্ঞে না, চারটি নাল পুঁতে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবে, হাজার মারুন, পিটুন, লোভ দেখান, কিছুতেই কিছু হয় না।

রায় সাহেবের মুখে এতক্ষণে হাসি দেখা দিল। অত্যন্ত কৌতুক বোধ করিতেছেন যেন, ভাবটা এই রকম করিয়া বলিলেন, আচ্ছা তো, পা পুঁতে দাঁড়িয়ে থাকবে, নড়বে না? বেশ, এমনই আপাতত তুমিই ফেরি দাওগে রোজ, তবে এই রকম একগুঁয়েমি ধরলে আমায় খবর দিও, শায়েস্তা ক'রে দোব।

আমির হোসেন সেলাম করিয়া চলিয়া যাইতেছিল, ডাকিয়া বলিলেন, হ্যাঁ, আর দেখ আমির হোসেন, ফেরি করবার সময় তুমি

আর ওকে দৌড় করিও না ; আপাতত দৌড়ের অভ্যাসটা যাক। আমি ওই পা পুঁতে দাঁড়ানো থেকে আস্তে আস্তে চলতে আরম্ভ করা, তারপরে একটু একটু কায়দামাফিক দৌড়ুনো, তারপর আরও জোরে, এই ক'রে একেবারে গোড়া থেকে তোয়ের করব। একটি বছরের বেশি লাগবে না।

আমির হোসেন বিস্ময়াভিভূত হইয়া কি বলিতে যাইতেছিল, একজন পারিষদের ইশারায় আর একটা সেলাম করিয়া 'যে আজ্ঞে হুজুর' বলিয়া চলিয়া গেল।

৩

ঘুড়ীটা নূতন আস্তাবলে প্রবেশ করিয়া তিন-চার দিন বেজায় মনমরা হইয়া রহিল। আমির হোসেন ঘুড়ী সহিত এত্তালা করিল, সাহেবকে দেখতে না পেয়ে কিছু খাচ্ছে-টাচ্ছে না হুজুর, তিন দিনেই যেন গ'লে গেছে।

রায় সাহেব বলিলেন, জোর ক'রে খাওয়ানোর দরকার নেই, ওদের সয় না।

একটু থামিয়া বলিলেন, মেহনৎ করাচ্ছ তো ?

আজ্ঞে, এত কাহিলের ওপরে—

পারিষদের একজনের চোখ-টিপুনিতে আমির হোসেন কথাটা আর শেষ করিল না ; একটু থামিয়া বলিল, আজ বিকেলে একবার বের করেছিলাম, দেখলাম, নড়তে নারাজ। ভাবলাম, যাক, দুদিন আর ফের দোব না, হুজুরেরও মানা আছে।

রায় সাহেব উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন ; বলিলেন, ওই তো আমির হোসেন, ঘোড়ার মেজাজ বুঝতে তোমার এখনও দেরি আছে। এই তো মেহনৎ নেবার সময় ; ঘোড়ার জেদ বাড়তে দিয়েছ কি বিগড়েছে, —ঘোড়ার আর রেয়তের। ও কাজের কথা নয়, সকালে একবার নিয়ে এস, বাছাধন বুঝুন কার পাল্লায় পড়েছেন। হ্যাঁ, ভাল কথা, তা ব'লে যেন খাওয়াতে জেদ ভাঙতে যেও না, পিঠে সইবে ব'লে যে পেটেও

সইবে, তা ভেবো না।—বলিয়া রসিকতায় আবার হাসিয়া উঠিলেন। সকলে যোগ দিল। ঘুড়ীটা মাথা নীচু করিয়া ডান ক্ষুর দিয়া রাস্তা চাঁছিতেছিল, ঘাড় ফিরাইয়া দেখিয়া নাক কাঁপাইয়া একটা আওয়াজ করিল।

কি ভাবিল, অথবা কিছু ভাবিল কি না, সেই জানে। রাত্রে দেখা গেল, তাহার অগ্নিমান্দ্যটা হঠাৎ তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। চার দিনের না হোক, দিন দুইয়ের আহার সে দিব্য পুষাইয়া লইল এবং বেশ স্ফূর্ত্তির সহিত অঙ্গচালনা করিতে লাগিল। মোটের উপর বেশ বুঝা গেল, ও স্থির করিয়া ফেলিয়াছে যে, যাওয়া-আসা, মিলন-বিরহ পৃথিবীতে চিরকালই চলিতেছে, উহার জন্য শোকে ঘাস-জল ছাড়িয়া দিলে শুধু আত্মনির্য্যাতনই সার হয়; এবং বোধ করি, এও ভাবিল যে, তাহাতে শুধু দুশমনের মুখেই হাসি ফুটে মাত্র।

পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত যত রকম ঘোড়ায় চড়িবার সাজগোজ শরীরকে ভারাক্রান্ত এবং জবরজঙ্গ করিবার জন্য সৃষ্টি হইয়াছে, সে সমস্তই কয়েকদিন পূর্ব্বে কেনা হইয়া গিয়াছে। সকালে উঠিয়া রায় সাহেব ড্রেসিং-টেবিলের সামনে দাঁড়াইয়া সযত্নে গোলমাল করিয়া সবগুলি পরিধান করিলেন। আজ অশ্বপৃষ্ঠে তাঁহার ফোটো লওয়া হইবে, বহুদিনের সাধ। সব ঠিক হইয়া গিয়াছে, একখানা টাঙানো থাকিবে বারান্দায়, একখানা বৈঠকখানায়, একখানা শোবার ঘরে। প্রত্যেক পারিষদ এক-একখানা করিয়া দস্তখত করা ছবি পাইবে। খান-পনরো আত্মীয়স্বজনের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে।

শহর হইতে ফোটোগ্রাফার আসিয়াছে, সাড়ম্বরে ক্যামেরা ঠিকঠাক করিতেছে। রায় সাহেবের মনটি খুব প্রসন্ন; ঘোড়ায় চড়াও হইবে, ফোটো লওয়াও হইবে, আর এদিকে ঘোড়া এক পা নড়িবেও না, চক্কর দেওয়া তো দূরের কথা।

পারিষদেরা সব হাজির; হাসি-ঠাট্টা, ঘোড়া দুরস্ত করার গল্প চলিতেছে। রায় সাহেব বারান্দায় বাহির হইয়া আসিয়া প্রকাণ্ড আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া মাথার পাগড়িটাতে সাধ্যমত রাজপুতী ঢং ফুটাইবার চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময় আরসিতে ঘুড়ীর ছায়া পড়িল।

রায় সাহেব ঘুরিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কার ঘোড়া আমির হোসেন ?

আমির হোসেন ঝুঁকিয়া একটি সেলাম করিয়া সহাস্য-বদনে কহিল, হুজুরেরই কুইন অ্যান, রাত থেকে খেয়ে-দেয়ে চাঙ্গা হয়ে উঠেছে, চেনা যাবে কমনে থেকে ? শুধু একবারটি কয়েছিলাম, দেখিস, মালিক প্রথম সওয়ারি হবেন, ইউ নোটি গেরেল !

শেষের ইংরেজীটুকু ঘুড়ীর উদ্দেশ্যে ; সে শরীর দুলাইয়া দুলাইয়া অতিরিক্ত নাচ লাগাইয়া দিয়াছিল এবং মাঝে মাঝে আমির হোসেনের হস্তধৃত লাগামে এক-একটা উৎকট ঝাঁকুনি দিয়া নিজের অসহিষ্ণুতা জ্ঞাপন করিতেছিল। দাবড়ানি খাইয়া রায় সাহেবের পোষাকের উপর চক্ষু দুইটা ন্যস্ত করিয়া একটা আনন্দধ্বনি সহকারে মুখটা ঘুরাইয়া লইল।

আমির হোসেন বাঁ হাতটা তাহার ঘাড়ের উপর বুলাইয়া বলিল, সবুর, মালিক আসছেন ; লেকিন সাচ্চা চাল দেখানো চাই, হাঁ।

রায় সাহেবের মুখটা শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গিয়াছে। কাষ্ঠ-হাসি হাসিয়া বলিলেন, বেশ বেশ, ভাল কথা ; অনন্ত, কাল বলছিলে, একবার চড়বে, না হয় ঘুরে এস না ; দোব ব্রিচেসটা খুলে ? মানে, কথা হচ্ছে, আমার পাল্লায় পড়লে এমন টিট ক'রে ছাড়ব যে, খানিকক্ষণ ওর আর পদার্থ থাকবে না, মিইয়ে যাবে ; তখন আর চ'ড়ে সুখ পাবে না।

অনন্ত নামক পারিষদ তাড়াতাড়ি একটু হাতজোড় করিয়া বলিল, আজ্ঞে না হুজুর। ওরে বাবা ! কালকে মিইয়ে ছিল ব'লেই বলেছিলাম চড়ব ; নেহাত পা পুঁতে দাঁড়িয়ে থাকছে বললে কিনা !

রায় সাহেব একবার অপর সকলের উপর চোখ দুইটা বুলাইয়া আনিলেন, কেহ চোখ নামাইয়া লইল, কেহ টুপ করিয়া দরজার আড়ালে সরিয়া গিয়া চোখে চোখ ফেলিতে দিল না। কে একজন একেবারে সামনা-সামনি ছিল, ভীতভাবে হাসিয়া বলিল, হুজুরকে বঞ্চিত ক'রে কেউ কি আগে চড়তে রাজি হবে ? হোক্ কলিযুগ, তবু—

উপায়ান্তর না দেখিয়া রায় সাহেব আরশির সামনে সরিয়া আসিয়া

পাগড়িটা খুলিয়া আবার সযত্নে এবং সবিলম্বে চাপিয়া চাপিয়া বাঁধিতে লাগিলেন। আশা, যদি ইতিমধ্যে কিছু একটা হইয়া গিয়া তিনি এ যাত্রা রক্ষা পান ;—ভূমিকম্প, কি অগ্নিকাণ্ড, কি অপঘাত, যা হয় একটা কিছু, মানটা কোন রকমে যাহাতে বাঁচিয়া যায়। কিন্তু পাগড়ি বাঁধা পর্য্যন্ত যথেষ্ট সময় থাকিতেও সে সব কিছুই হইল না ; যদিও ইহাতেও কোন সন্দেহ রহিল না যে, সাধের বিপদটি খুবই আসন্ন, তাঁহার ঘোড়ায় চড়ার জন্য অপেক্ষা করিতেছে মাত্র। দায়ে-পড়া বীরত্বের সহিত অগ্রসর হইলেন। নরম আলগা শরীরের মাংস পাতলা করিয়া মাখা ময়দার মত পোশাকের খাজে খাজে ভরিয়া যাইতে লাগিল।

প্রথম তো চড়াই একটা সমস্যা। যে পারিষদটি কলিযুগ হইলেও রায় সাহেবকে প্রথম অশ্বারোহণের আনন্দ ও গৌরব হইতে বঞ্চিত করিতে চায় নাই, সে সামনে আসিয়া বলিল, আপনি তা ব'লে যেন লাফিয়ে চড়তে যাবেন না হুজুর, এই সেদিন অমন বাতে ভুগলেন। তার চেয়ে, আমির হোসেন, তুমি এই বারান্দার পাশটায় এনে দাঁড় করাও, টুপ ক'রে উঠে পড়ুন।

রায় সাহেব সামান্য একটু ল্যাংচানোভাবে চলিতে চলিতে বলিলেন, তবে তাই আন ; হ্যাঁ, ব্যাথাটা যেন একটু আউরেছে বটে।

ঘুড়ীটাকে বারান্দার পাশে আনিয়া দাঁড় করানো হইল। সে পিঠটা একটু সঙ্কুচিত করিয়া সংশয়ান্বিত দৃষ্টিতে ঘাড় বাঁকাইয়া চাহিয়া রহিল।

৪

চড়িতে যা দেরি ; ঘুড়ীটা সঙ্গে সঙ্গে তরতর করিয়া প্রাণ লইয়া পালানো-গোছের করিয়া খানিকটা ছুটিয়া গেল ; আমির হোসেনের হাতেই লাগামটা ছিল, অতি কষ্টে রুখিয়া ফেলিল। গালে পিঠে হাত বুলাইয়া আশ্বস্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল ; বলিল, ঠাণ্ডা রহ বেটী, ভয় নেই।

রায় সাহেব উঠিয়াই দুই হাতে কুইন অ্যানের ঘাড় জড়াইয়া শুইয়া পড়িয়াছিলেন, সেই অবস্থাতেই প্রশ্ন করিলেন, ফোটো তোলা হচ্ছে না তো?

ফোটোগ্রাফার বলিল, তুলি নি এখনও; আপনি যেই একটু স্টেডি হয়ে বসবেন, আমি সঙ্গে সঙ্গে এক্স্‌পোজার দোব; সেইজন্যে অপেক্ষা ক'রে আছি।

রায় সাহেব মাথাটা তুলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু কুইন অ্যান হঠাৎ সামনের পা দুইটা মুড়িয়া পিছনের পায়ে দাঁড়াইয়া উঠিতে আবার মাথাটা গুঁজড়াইয়া পড়িলেন এবং ওরই মধ্যে নির্ভুল হিসাব করিয়া বলিলেন, আপনি তা হ'লে কাল আসবেন, খবর দোব। আমির হোসেন কাছে আছে তো?

এই যে রয়েছি হুজুর, লাগামটা দোব?

না না, ধ'রে থাক, লাগাম চাইছি না, জিজ্ঞাসা করছিলাম—ওই আবার উঠল; টেনে নামাও, টেনে নামাও আমির হোসেন; ব'সে পড় ভুঁয়ে, শিবু বেয়ারাকে ডেকে নাও, ভারী আছে।

আমির হোসেন টানিয়া ঝুঁকিয়া পড়িতেই কুইন অ্যান সামনের পায়ে ভর দিয়া পিছনে লাফাইয়া উঠিল।

রায় সাহেব ঘাড়ের দিকে খানিকটা পিছলাইয়া গিয়া আর্ত্তস্বরে বলিলেন, তোমরা কেউ ল্যাজ চেপে ধর, কিছু বলবে না, খুব ঠাণ্ডা ঘো—

আমির হোসেন তাড়াতাড়ি সাবধান করিয়া দিল, না না, ল্যাজে হাত দিলে আজ ও বরদাস্ত করবে না, একে মন ভাল নেই, মোটে এই একটু ফুর্ত্তি জ'মে আসছে—

রায় সাহেব শুষ্ককণ্ঠে বলিলেন, তা হ'লে? এ যে একবার সামনে উঠছে, একবার পেছনে উঠছে, এ কোন্ দেশী ফুর্ত্তি আমির হোসেন? বাপ রে, যেন কাপড়-কাচা করছে!

সাহেব পিঠে হাত ঠুকে বলতেন, 'ডার্লিং, প্রিটি ডিয়ার!' তাই বলুন না হুজুর!

পারিষদদের মধ্যে একজন বলিল, ডার্লিং তো মেমকে বলে সাহেবরা,—সে কথা উনি ঘুড়ীকে কেমন ক'রে—

আওয়াজ পাইয়া রায় সাহেব ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, তোমরা বুঝি সব তামাশা দেখছ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে? মেমসাহেবকে বলে—কেন, একে বললে কি অন্যায়টা হয়? ডার্লিং, ডার্লিং, ডার্লিং—তুমি সঙ্গে সঙ্গে এই দিকে হাতটা ঘুরিয়ে ঠুকতে থাক আমির হোসেন, যেন মনে করে, আমি ঠুকছি, মানে সায়েব ঠুকছে। আর কি বলতেন সায়েব?

'প্রিটি ডিয়ার' বলুন হুজুর।

প্রিটি ডিয়ার—ওই রে! লাগাম ক'ষে ধ'রে থেকো। প্রিটি ডিয়ার!

বলুন, নোটি গেরেল।

দেখো দেখো, অন্যমনস্ক হ'য়ো না। না, ওঁটা আর বলে কাজ নেই, বড্ড যেন বোঝে। গুড গার্ল বলতেন কি সায়েব? বললে বুঝতে পারবে? যাদুমণি সোনামণি এই রকম কতকগুলা বাংলা শেখাও এবার আমির হোসেন, যেমন শুনতে মিষ্টি, তেমনই—ধর ধর, ধর আমির হোসেন; আমি ভাবছি, নেমে আবার ভাল ক'রে উঠব; বেদখল ক'রে ফেলেছে, বারান্দার কাছে আর একবার নিয়ে যেতে পার?

যাচ্ছি হুজুর, তবে সায়েব বারান্দার ওপর পা তুলে রুটি খেতে শিখিয়েছিলেন, তাই ভাবছি—যদি হঠাৎ মনে প'ড়ে যায়, আপনি এখন পিঠে রয়েছেন।

না না, তবে কাজ নেই; আর একটু দূরে সরিয়ে নাও বরং। বারান্দা থেকে কতটা দূরে আছে আমির হোসেন? দূরে গিয়েই বরং ভাল ক'রে দাঁড় করাও, নেমে পড়ি।

আমির হোসেন আর একটা সামনে উঠিবার ঝোঁক সামলাইতে সামলাইতে বলিল, নামতে গেলেই বাগড়া দেবে; মনটা ভাল আছে কিনা, একটু নাচতে কুঁদতে চায়; খালি জিন পছন্দ করবে না এখন। ভাল ওয়েলার হুজুর, ওদের রেওয়াজই এই।

রায় সাহেব নিরাশভাবে বলিলেন, সর্ব্বনাশ! তা হ'লে? নামতেও

বাগড়া দেবে, পিঠে রেখেই বা কি ভাল ব্যবহারটা করছে? একি ফ্যাসাদে পড়া গেল!

কুইন অ্যান আরও দুই-একবার সামনে এবং পিছনে পা তুলিয়া নিজের শরীরটা নানাভাবে দুলাইয়া দুলাইয়া যেন আমির হোসেনের কথাটার সমর্থন করিল, তাহার পর চিঁ-হিঁ-হিঁ করিয়া একটা সুদীর্ঘ হ্রেষাধ্বনি করিয়া উঠিল।

গলাটা বেশ ভাল করিয়া ধরিয়া রায় সাহেব প্রশ্ন করিলেন, ডাকলে কেন ওরকম ক'রে আমির হোসেন? বারান্দায় টেবিলের ওপর আমার প্লেটে পাঁউরুটি প'ড়ে আছে, শিগগির সরিয়ে নিতে বল তো।

না হুজুর, ডাকার পরে কুইন ঠাণ্ডা হয়ে যায়, ও ওর একটা লুটিস হচ্ছে।

রায় সাহেব তদবস্থ হইয়াই একটু পড়িয়া রহিলেন। পরে অতি সাবধানে মাথাটা সামান্য একটু তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ঠিক বলছ তো? দেখো।

হ্যাঁ হুজুর, প্রায়ই তো এই রকম—

তাড়াতাড়ি আবার শুইয়া পড়িয়া রায় সাহেব প্রশ্ন করিলেন, প্রায়ই মানে?

না, আর ভয় নেই হুজুর, বসুন সিধে হয়ে।

ভয় কথাটা বোধ হয় পৌরুষে বড় বেশি ঘা দিল; তাহা ছাড়া ঘুড়ীটাও সত্যই আর নড়াচড়া করিতেছে না। রায় সাহেব সতর্কভাবে এবং আমির হোসেনকে খুব সতর্ক করিতে করিতে সিধা হইয়া বসিলেন। আমির হোসেন লাগামটা দিতে যাইতেছিল, তাড়াতাড়ি বলিলেন, না না, আগে তুমি এক হাতে ওর ঘাড়ের চুলটা ধর ক'ষে। আর দেখ, ঘাড়ের চুল বেশি ছোট ক'রে ছেঁটে কাজ নেই, বড় চুলেই ঘুড়ীকে মানায় ভাল।

পারিষদরা আবার আগাইয়া আসিয়াছিল। অনন্ত বলিল, আজ্ঞে, তা তো মানাবেই, ঘুড়ী হ'ল মেয়ে-ঘোড়া কিনা।

রায় সাহেব ঘুড়ীর কানের মাঝখানে দৃষ্টি স্থির করিয়া বসিয়া ছিলেন। মুখ না ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কে, অনন্ত?

অনন্ত আরও আগাইয়া আসিয়া উত্তর করিল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

যেন ঠাণ্ডা হয়েছে, না?

হতেই হবে হুজুর, কার পাল্লায়—

ফোটোগ্রাফার চ'লে গেছে?

দূরে বারান্দার এক কোণ হইতে উত্তর আসিল, না, এই তো রয়েছি।

অনন্ত বলিল, যান না, এই বেলা টুপ ক'রে ফোটোটা তুলে নিন না মশাই। হুজুর তো বেটীকে শায়েস্তা ক'রে এনেইছেন।

ফোটোগ্রাফার আস্তে আস্তে নামিয়া প্রায় বিশ হাত দূরে স্ট্যাণ্ডটা দাঁড় করাইয়া ক্যামেরাটা বসাইল। নিজে কালো পর্দ্দার ভিতর ছয়-সাত বার মাথা গলাইয়া, বাহির করিয়া প্রায় মিনিট পাঁচ-ছয় পরে ফোকাস ঠিক করিল। কুইন অ্যান স্থির, ল্যাজটি পর্য্যন্ত নড়ে না। ফোটোগ্রাফার চারিদিক একবার দেখিয়া লইয়া ক্যামেরার সামনে দাঁড়াইয়া বলিল, ঠিক হয়েছে, আর সেকেণ্ড কয়েক; দেখবেন, যেন—

লেন্সের মুখ হইতে ক্যাপটা খুলিয়া লইয়া কায়দা করিয়া হাত ঘুরাইয়া বলিতে লাগিল, ওয়ান, টু—

কুইন অ্যান এতক্ষণ পরে একবার ঘাড় বাঁকাইয়া একটু আড়চোখে দেখিয়া লইল, এবং থ্রী বলার সঙ্গে সঙ্গে চিঁ হিঁ-হিঁ করিয়া শব্দ করিয়া উঠিল, এবং চক্ষের পলকে ঘুরিয়া গিয়া ক্যামেরার একেবারে সামনা-সামনি হইয়া দাঁড়াইল।

ফোটোগ্রাফার ক্যামেরা ছাড়িয়া 'বাপ রে বাপ' বলিয়া তিন লাফে গিয়া বারান্দায় উঠিয়া পড়িল। যাহারা বারান্দায় ছিল, তাহারা ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। রায় সাহেব লাগাম ছাড়িয়া গলা আঁকড়াইয়া শুইয়া একটা বিকট চীৎকার করিয়া উঠিলেন। আমির হোসেন তাড়াতাড়ি আসিয়া লাগামটা ধরিয়া ফেলিল।

একটু রুক্ষভাবেই বলিল, ওয়ান টু—ওসব বলবার কি দরকার ছিল ওনার? ওই ব'লে সায়েব এদানি ওকে হার্ড্‌ল ডিঙুতে শেখাচ্ছিল, ওনার ওই তিন-ঠ্যাঙে জিনিসটা দেখে ভাবলে বুঝি—

রায় সাহেব শুইয়া শুইয়াই তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, সরিয়ে নাও

ফোটোগ্রাফার, ওটা সরিয়ে নাও। হার্ড্‌ল রেস—সেই সাত বেড়া ডিঙিয়ে ছোটে তো? নিয়েছ সরিয়ে?

কুইন অ্যানের হার্ড্‌ল ডিঙাইবার ইচ্ছা ছিল কি না, বলা যায় না; কিন্তু সম্ভাবনার পূর্ব্বেই তিন-চারজন আসিয়া স্ট্যাণ্ড ও ঢাকনাসুদ্ধ ক্যামেরাটা বারান্দায় তুলিয়া ফেলিল। কুইন অ্যান সামনের ডান ক্ষুরটা দিয়া কাঁকরের রাস্তাটা চার-পাঁচ বার জোরে জোরে আঁচড়াইল, তারপর খুব আস্তে আস্তে শরীর আন্দোলিত করিয়া সামনে চলিতে আরম্ভ করিল। রায় সাহেব ঘাড়ের রোমরাশির ভিতর হইতে রুদ্ধ গলায় প্রশ্ন করিলেন, কোথায় চলল বল তো আমির হোসেন? ক্যামেরাটা বাবান্দায়, না ঘরে?

মন-মরা হয়ে যেন আস্তাবলে চলল ব'লে বোধ হচ্ছে। ওর ইচ্ছেটা ছিল একটু ঘুরে ফিরে আসা হুজুর, শেষ নাগাদ একটু ডিঙুবে ব'লে আশা করেছিল, তাও হ'ল না, ওর দিল ভেঙে গেছে, দেখছেন না?

রায় সাহেব মুখ না তুলিয়াই বলিলেন, হুঁ। যেন পাঁজরা ভেদ করিয়া তিনি ঘুড়ীর ভাঙা দিল প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

একটু পরে প্রশ্ন করিলেন, যাচ্ছে তো ঠিক আস্তাবলের দিকে আমির হোসেন? কোন্‌খানটায় এল? কতক্ষণ থাকে বল তো মন-মরা ভাবটা? আর মিনিট পাঁচ-ছয় থাকবে না?

পরদিন সকালে রায় সাহেব একটু খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে বাড়ি হইতে বাহির হইলেন। পারিষদেরা উপস্থিতই ছিল। অনন্তকে বলিলেন, তুমি ঠিক বলেছ অনন্ত, বাতটা একেবারে সেরে না গেলে ঘোড়ায় চড়াটা কাজের কথা নয়। দিব্যি পছন্দ হয়েছিল ঘুড়ীটা হে, যেমন দেখতে, তেমনই তেজী, কাল দেখলাম কিনা একটু নেড়ে-চেড়ে। ভেবেছিলাম, মনের মতনটি ক'রে গ'ড়ে নোব। কিন্তু না, তুমি দিয়ে দাও কাগজে একটা বিজ্ঞাপন। সামনের শীতটা যাক, তখন আবার একটা কিনে নিতেই বা কতক্ষণ?

পারিষদদের মধ্যে একটি নিশ্চিন্ততার দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

বর্ষায়

সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই বৃষ্টি নামিয়াছে, আড্ডা জমিল না। তিন জনে ছাড়া-ছাড়া ভাবে সময় কাটাইতেছিল—তারাপদ তাস ঘাঁটিতেছে, রাধানাথ সিনেমার বিজ্ঞাপন দেখিতেছে, শৈলেন হাত দুইটাকে বালিস করিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া গুনগুন করিতেছে।

তারাপদ বলিল, তোমার মাথার কাছের জানালা দিয়ে বৃষ্টির ছাট আসছে, শৈলেন।

শৈলেন বলিল, আসুক, বেশ লাগছে; সুবিধে-আরাম যখন সম্পূর্ণ-ভাবে নিজের আয়ত্তে, তখন ইচ্ছে ক'রেই একটু একটু অসুবিধে ভোগ করার বেশ একটা তৃপ্তি আছে,—রাজারাজড়ার শখ ক'রে হেঁটে চলার মত।

রাধানাথ একটি সংক্ষিপ্ত টিপ্পনী করিল, কবি।

তারাপদ বলিল, তা হ'লে আর একটু অসুবিধের তৃপ্তি ভোগ করতে করতে তুমি না হয় শুভেনকে ডেকে নিয়ে এস, চার জন হ'লে দিব্যি আরাম ক'রে তাসটা খেলা যায়!

রাধানাথ বলিল, আমি গিয়েছিলাম তার কাছে; সে আসবে না।

কেন?

তার দাদার শালী বেড়াতে আসবে।

আসুক না!

বললে—এ অবস্থায় আমার বাড়ি ছেড়ে যাওয়াটা নেহাৎ অভদ্রতা হবে না?

তারাপদ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, ও! অভদ্রতা!

আবার চুপচাপ; শৈলেন গুনগুনানিটুকুও থামাইয়া দিয়াছে। একটু পরে তারাপদই আবার মৌনতা ভঙ্গ করিল; প্রশ্ন করিল, তোমরা ভালবাসা জিনিষটায় বিশ্বাস কর?

রাধানাথ বলিল, যখন ভূতে করি, তখন ভালবাসা আর কি দোষ করেছে,—দুটোই যখন ঘাড়ে চাপবার জিনিস। তবে সব সময় করি না বিশ্বাস। ঘোর অন্ধকার রাত্রি, পোড়ো বাড়ি কিংবা একটানা মাঠের মাঝখানে একটা পুরনো গাছ, একলা প'ড়ে গেছি—এ অবস্থায় ভূতে বিশ্বাস করি। আর ভালবাসার কথা,—কবির ভাষায় এ-রকম 'অঝোর-ঝরা শাওন-রাতি'—তোমার চা-টি দিব্যি হয়েছিল, আর ওদিকে বাড়িতে খিচুড়ি আর মাংসের খবর পেয়ে এসেছি, ভবিষ্যতের একটা আশ্বাস রয়েছে, এ-রকম অবস্থায় মনে হচ্ছে যেন প্রেম ব'লে একটা জিনিস থাকা বিচিত্র নয়…এমন কি দাদার নেই-শালীর জন্যে একটা বিরহের ভাবও মনে জেগে উঠছে যেন।

তারাপদ প্রশ্ন করিল, কবি, কি বল ?

শৈলেন বলিল, আমি যে রয়েছি, আরও প্রমাণ দিয়ে স্পষ্ট ক'রে বলতে গেলে—এখন এ ঘরে হাতে মাথা দিয়ে শুয়ে আছি—এটা বিশ্বাস কর ?

করি বইকি—না ক'রে উপায় কি ? বিশেষ ক'রে বৃষ্টির ছাটের সঙ্গে সঙ্গে তোমার শৈলেনত্বের প্রমাণ যখন—

তা হ'লে ভালবাসাকেও বিশ্বাস করতে হবে তোমাদের, কেন না আমি আর ভালবাসা সম-স্থিত, ইংরেজীতে তোমরা যাকে বলবে—co-existent !

তারাপদ তাস ঠুকিতে ঠুকিতে বলিল, বটে! তা তোমার জীবনে যে একটা রহস্য আছে, সে সন্দেহ বরাবরই হয় বটে, তবে অ্যান্টি-শুকদেবের মত—আমি অ্যান্টি-ক্রাইস্টের নজীরে কথাটা ব্যবহার করলাম—অ্যান্টি-শুকদেবের মত তুমি যে রমণী-প্রেম নিয়েই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছ, এতটা জানা ছিল না। ব্যাপারটা ভেঙে বল একটু।

শৈলেন আরম্ভ করিল, বয়স যখন সাত-আটের মাঝামাঝি, সেই সময় আমার ভালবাসার সূত্রপাত ঠিক কোন্ লগ্নটিতে আরম্ভ হয়েছিল বলতে পারি না। অনভিজ্ঞেরা কাব্য-কাহিনীতে যা বলেন তা থেকে মনে হয়, ভালবাসা জীবনের একটা নির্দ্দিষ্ট রেখা থেকে আরম্ভ হয়, যেমন

মাঠের ওপর একটা চুনের রেখা কিংবা কোদালের দাগ থেকে আরম্ভ হয় বাজির দৌড়। ঐ যে শোন—প্রথম দর্শন থেকেই প্রেম, কিংবা হাতের লেখা দেখেই ভালবেসে ফেলা ওসব কথা নিতান্তই বাজে। প্রেমকে একটি ফুল বলা চলে—ওর আরম্ভটা পাঁজির এলাকাভুক্ত নয়। কবে যে কেন্দ্রগত মধুকণাটুকু জ'মে উঠেছে, আর কবে যে তাকে ঘিরে কচি দলগুলি কুঞ্চিত হয়ে উঠবে, তার হিসেব হয় না; আমরা যখন টের পাই, তখন যাত্রাপথে অনেক দূর এগিয়েছে—সেটা বিকশিত দলের ব্যাকুল গন্ধের যুগ—

একদিন ঠাকুরমার কাছে গল্প শুনতে শুনতে আমি ব্যাপারটুকুর সন্ধান পেলাম। সেদিনও বড় দুর্য্যোগ ছিল, ঝড়ঝাপটার ভাগটা আজকের চেয়েও বরং বেশি। রাজপুত্র অরূপকুমার কত দীর্ঘ পথ পেছনে রেখে, কত দীর্ঘতর পথ সামনে ক'রে চলেছেন। আহার নেই, নিদ্রা নেই, ভয় নেই, শঙ্কা নেই, শুধু বুকের মধ্যে একটি রূপের স্বপ্ন। যাত্রাপথের শেষে সাগরের অতল তলে মানিকের তোরণ পেরিয়ে তাঁর পক্ষিরাজ ঘোড়া পৌঁছল রাজকুমারী কঙ্কাবতীর প্রবাল-পুরীর দ্বারে।

—এতটা হ'ল সাধারণ কথা, যাত্রাপথের দৈনন্দিন ইতিহাস।

—সেই বিশেষ রাত্রে অরূপকুমার-আমি যখন সোনার কাঠি ছুঁইয়ে—

তারাপদ প্রশ্ন করিল, তুমি আবার কেমন ক'রে বয়স আর অবস্থা ডিঙিয়ে অরূপকুমার হয়ে পড়লে?

শৈলেন বলিল, সাত-আট বছর বয়সের একটা মস্ত বড় সুবিধে এই যে, সে সময় বয়স আর অবস্থা সম্বন্ধে কোন চৈতন্য থাকে না, সুতরাং যাকে মনে ধরে, নির্ব্বিবাদে তার মধ্যে রূপান্তরিত হয়ে পড়া চলে। এখন তুমি যে অমুক আর তোমার বয়স যে সাঁয়ত্রিশ—এই চেতনা তোমার চারপাশে গণ্ডি সৃষ্টি ক'রে তোমাকে একান্তপক্ষে 'তুমি' ক'রে রেখেছে,—একটু কাটিয়ে রাজপুত্র-কোটালপুত্র হয়ে নেওয়া তো দূরের কথা, মুহূর্ত্ত কয়েকের জন্যে যে নিজের ছেলেবেলা থেকেই ঘুরে আসবে, সেটাও দুষ্কর হয়ে ওঠে। এই তরলতার জন্যে জীবনের সাত-আট বছরের বয়সটা হ'ল রূপকথারই যুগ, যেমন সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ বছরের সময়টা তার

নির্ব্বিকারত্বের জন্যে সাহেব, বড়বাবু প্রভৃতির মধ্যে মুখ বুজে চাকরি করবার যুগ।...যাক, গল্পটাই শোন ; বর্ষা কেটে গেল। বায়ুমণ্ডলের এই ভিজে ভিজে আমেজের ভাবটি যখন কেটে যাবে, তখন আমি গল্পটা যে চালাতে পারব—এতে সন্দেহ আছে, কেন না তখন নিজে যা বলছি তা নিজেই বিশ্বাস করতে পারব কি না নিঃসংশয়ে বলতে পারি না।

—কি বলছিলাম ? হ্যাঁ, সে রাত্রে অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়ে দেখলাম, সোনার কাঠি ছোঁয়াতে রূপোর পালঙ্কে যে জেগে উঠল, সে রাজকুমারী কঙ্কাবতী নয়—সে হচ্ছে আমার সেজ বউদিদির সই নয়নতারা।

—কঙ্কাবতী নয়—হাসিতে যার মুক্তো ঝরে, অশ্রুতে যার হীরে গ'লে পড়ে, যে চাঁদের বরণ কন্যের মেঘের বরণ চুল, জেগে উঠতেই যার চোখের দীপ্তিতে সাত মহলে আলো ঠিকরে পড়ে, সাত সখীতে যাকে চামর দোলায়, যার জন্যে সপ্তবীণায় ওঠে সপ্তসুরেব মূর্চ্ছনা—

—সোনার কাঠির স্পর্শে তার জায়গায় আমার মুখের দিকে চোখ মেলে চাইলে নয়নতারা, যাকে বিনা উগ্র সাধনাতেই আমি প্রত্যহের কাজে অকাজে রোজই দেখছি। আমাদের বাড়ির কাছেই বোস-পাড়ায় রেলের ধারে তাদের বাড়ি। সামনে পানায়-ঢাকা ছোট একটা পুকুর, তাতে একটা বকুলগাছের ছায়ায় রাণাভাঙ্গা সিঁড়ি নেমে গেছে। ঘাটের সামনেই খানিকটা দূর্ব্বাঘাসে ঢাকা জমি। সেখানে শীতের শেষে বকুলে আর সজনে ফুলে কায়ায়-গন্ধে মাখামাখি হয়ে প'ড়ে থাকত। তার পরেই একটা রকের পেছনে নয়নতারাদের বাড়ি—খানিকটা কোঠা, খানিকটা গোলপাতার। মোট কথা, সাগরতলের প্রবাল-মহলের সঙ্গে তার কোনই মিল ছিল না।

—না ছিল স্বয়ং কঙ্কাবতীর সঙ্গে নয়নতারার কোন মিল। প্রথমত, নয়নতারা ছিল কালো—যা কোন রাজকন্যারই কখনও হবার কথা নয়। তবুও যে সে সে-রাত্রে আমার গল্পরাজ্যে বিপর্য্যয় ঘটালে কি ক'রে, তা ভাবতে গেলে আমার মনে প'ড়ে যায় তার দুটি চোখ। অমন চোখ আমি আজ পর্য্যন্ত দেখি নি। তোমরা বোধ হয় স্বীকার করবে ফরসা মেয়ের চেয়ে কালো মেয়ের চোখই বেশি বাহারে হয়—সবুজ আবেষ্টনীর

মধ্যে কালো জলের মত। পরে আমি ভাল চোখের লোভে অনেক কালো মেয়ের দিকে চেয়েছি, কিন্তু অমন দুটি চোখ আর দেখি নি। তার বিশেষত্ব ছিল তার অদ্ভুত দীপ্তি; উগ্র দীপ্তি নয়, তার সঙ্গে সর্ব্বদাই একটা হাসি-হাসি ভাব মিশে থেকে সেটাকে প্রসন্ন ক'রে রাখত। নয়নতারা বেজায় হাসত—বেহায়ার মত। যখন হাসত তখন তার কালো শরীর থেকে যেন আলো ছড়িয়ে পড়তে থাকত; যখন হাসত না, আমার মনে হ'ত, তখনও যেন খানিকটা আলো আর খানিকটা হাসির অবশেষ ওর চোখে লেগে রয়েছে। আমি সে দুটি চোখ বর্ণনা করতে পারলাম না, তা ভিন্ন শুধু চোখ নিয়ে প'ড়ে থাকলে আমার গল্প শেষ করাও হয়ে উঠবে না। আমি একবার শুধু সে চোখের তুলনা পেয়েছিলাম—কতকটা; মানুষের মধ্যে নয়, পৃথিবীর কোন জিনিসেও নয়—যদি কখনও শীতের প্রত্যুষে উঠে চক্রবালরেখার উপরে শুকতারা দেখ, তো নয়নতারার চোখের কথা মনে ক'রো; অর্থাৎ সে অপার্থিব চোখের তুলনা পৃথিবী থেকে অনেক দূরে—স্বর্গের কাছাকাছি।

—রেলের দিকে দেয়াল-দিয়ে-আড়াল-করা পানাপুকুরের ধারের জায়গাটিতে নয়নতারার সমবয়সী মেয়েদের আড্ডা জমত। পুরুষের মধ্যে প্রবেশাধিকার ছিল শুধু আমার, কারণ কয়েকটি কারণে আমি ঠিক সেই ধরনের ছেলে ছিলাম নবপরিণীতাদের যারা খুব কাজে লাগে। প্রথমত, বয়সটা খুব কম; দ্বিতীয়ত, আমি ছিলাম খুব অল্পভাষী, যার জন্যে বাইরে বাইরে আমায় খুব হাঁদা ব'লে বোধ হ'ত; আর তৃতীয়ত, আমার পুরুষ-অভিভাবক না থাকায় বাড়িতে আমার অবসর ছিল সুপ্রচুর এবং ইচ্ছেমত পাঠশালার বরাদ্দ থেকেও সময় কেটে অবসর বৃদ্ধি করবার মধ্যেও কোন বাধা ছিল না। ফলে, ওরা যে আমায় শুধু দয়া ক'রে কাজে লাগাত এমন নয়, আমি না হ'লে ওদের কাজ অচল হয়ে যেত। সবচেয়ে বেশি এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল চিঠি নিয়ে; এক কথায় আমি এই সংসদটির ডাক-বিভাগের পূর্ণ চার্জে ছিলাম বলা চলে। খাম-টিকিট নিয়ে আসা, চিঠি ফেলে আসা, এমন কি প্রয়োজন-বিশেষে পোস্ট-আপিসে গিয়ে পিয়নের কাছ থেকে আগেভাগে চিঠি চেয়ে নিয়ে আসাও

আমার কাজের সামিল ছিল; আর পাঁচ-সাত জন নবোঢ়ার খাম, টিকিট, চিঠির সংখ্যার আন্দাজ ক'রে নিতে তোমাদের কোন কষ্ট হবে না নিশ্চয়ই। এ ছাড়া বাজার থেকে এটা-ওটা-সেটা এনে দেওয়াও ছিল,—চিঠির কাগজ, কালির বড়ি, মাথার কাঁটা, ফিতে, চিরুনি··· আড়ালে ডেকে বলত, 'পতি পরমগুরু' লেখা দেখে চিরুনিটা নিবি শৈল, লক্ষ্মী ভাই···আর এদের সামনে যখন বকব—'ও চিরুনি কেন মরতে নিয়ে এলি?'—ব'লে, তখন চুপ ক'রে থাকবি—থাকবি তো?···দুটো পয়সা নিয়ে ডালপুরী আলুর দম কিনে খেও, যাও···ভাগ্যিস শৈল ছিল আমাদের!

—এ ছাড়া সময়ের কাঁচা ফল, এবং সেগুলিকে তরুণীদের কাঁচা রসনার উপযোগী করবার নানা রকম মশলা আহরণ করাও আমার একটা বড় কাজ ছিল।···রাধানাথ, ও রকম নিশ্বাস ফেললে যে? হিংসে হচ্ছে?

রাধানাথ বলিল, নাঃ, হিংসে কিসের? এই আমিও তো আজ তিন ঘণ্টা ধ'রে গিন্নীর ফর্দ্দ মিলিয়ে মিলিয়ে মাসকাবারি কিনে নিয়ে এলাম—মসলা, তেল, ওযুধ, বার্লি···নাও, গল্প চালাও।

—সেদিন ঠাকুরমার গল্পে নয়নতারা কঙ্কাবতীর জায়গা দখল ক'রে মিলন-বিরহ, হাসি-কান্না, মান-অভিমানে সমস্ত গল্পটির মধ্যে একটা অপরূপ অভিনবত্ব ফুটিয়ে তুললে। রূপকথা আর সত্যের সে অদ্ভুত মিশ্রণ আমার আজ পর্য্যন্ত বেশ মনে আছে। সেদিন অরূপকুমারকে বিদায় দিতে কঙ্কাবতীর চোখে যখন মুক্তো ঝরল, তখন আমার সমস্ত অন্তরাত্মা রেলের ধারের সেই বকুলতলাটিতে এসে অসহ্য বেদনা-ব্যাকুলতা নিয়ে ভোরের জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগল।

—কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা—অবশ্য, এখন আর সেটাকে মোটেই আশ্চর্য্য ব'লে ধরি না—তার পরদিন সকাল গেল, দুপুর গেল, বিকেল গেল, সন্ধ্যে গেল, নয়নতারাদের বাড়ির দিকে কোনমতেই পা তুলতে পারলাম না। কেমন যেন মনে হতে লাগল, কালকের রাত্রের রূপকথাটা আমার চারি দিকে ছড়ানো রয়েছে—ওদের সামনে গেলেই সব জানাজানি হয়ে যাবে।

এখন লক্ষণ মিলিয়ে বুঝতে পারছি সেটা আর কিছু নয়; নতুন ভালবাসার প্রথম সংকোচ।

—সেজ বউদি বললেন, হ্যাঁ শৈলঠাকুরপো, আজ সমস্ত দিন তুমি ও-মুখো হও নি যে? নয়ন তোমায় খুঁজছিল।

—রাত্রি ছিল, আমি লজ্জাটা ঢাকলাম, কিন্তু কথাটা চাপতে পারলাম না, বললাম, যাও, খুঁজছিল না আরও কিছু!

—সেজ বউদি বললেন, ওমা! খুঁজছিল না? আমি মিছে বললাম? তিন-চার বার খোঁজ করেছিল, কাল সকালে যেও একবার।

—বললাম, আমার ব'য়ে গেছে।

—ব'য়ে গেছে তো যেও না, আমায় বলতে বলেছিল, বললাম।—ব'লে বউদি চ'লে গেলেন।

—সেদিন ঠাকুরমার ছিল একাদশী, গল্প হ'ল না,—অর্থাৎ তার আগের রাতে যে আগুনটুকু জ্বলেছিল, তাতে আর ইন্ধন জোগাল না। পরের দিন অনেকটা সহজভাবে নয়নতারাদের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হলাম।

—ডেকেছিলে নাকি কাল?

—নয়নতারা মুখ তুলে বাঁ গালটা কুঞ্চিত ক'রে বললে, যা যাঃ, দায় প'ড়ে গেছে ডাকতে, উনি না হ'লে যেন দিন যাবে না। দু'টা চিঠির কাগজ এনে উপকার করবেন, তা—

—ওদের চড়টা-আসটাও মাঝে মাঝে হজম করতে হয়েছে, কিন্তু সেদিন এই কথা দুটোতেই এমন রূঢ় আঘাত দিলে যে, মনের দারুণ অভিমানে বই-স্লেট নিয়ে সেদিন পাঠশালায় চ'লে গেলাম,—মনে বৈরাগ্য উদয় হ'ল আর কি—জানই তো পাঠশালাটা হচ্ছে ছেলেবেলার শ্বাপদ-সংকুল বাণপ্রস্থভূমি।...গুরুমশাই বাঘ, শির-পোড়ো ভাল্লুক ইত্যাদি। সেখানে আগের দিন-চারেক অনুপস্থিত থাকবার জন্যে এবং সেদিনও দেরি হবার জন্যে বেশ একচোট উত্তম-মধ্যম হ'ল।

—এর ফলে বাল্য-মোহের কচি শিখাটি প্রায় নির্ব্বাপিত হয়েই এসেছিল, কিন্তু পাঠশালা থেকে ফেরবার পথে যখন রেল পেরিয়েছি, পুকুরের এপারে রাঙচিতের বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে নয়নতারা

আমি প্রথমটা গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম, তার পর নয়নতারা আর একবার ডাকতেই আগেকার দু দিনের কথা, সকালের কথা এবং পাঠশালার কথা একসঙ্গে সব মনে হুড়োহুড়ি ক'রে এসে, কি ক'রে জানি না, আমার চোখ দুটো জলে ভরিয়ে দিলে। নয়নতারা বেরিয়ে এসে আমার হাত দুটো ধ'রে আশ্চর্য্য হয়ে বললে, ওমা, তুই কাঁদছিস শৈল? কেন রে, আয়, চল্।

—বাড়ি নিয়ে গিয়ে খুব আদর-যত্ন করলে সেদিন। দুটো নারকেল-নাড়ু আঁচলের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে এসে বললে, তোর জন্যে চুরি ক'রে রেখেছিলাম শৈল, খা। তোকে সত্যি বড় ভালবাসি শৈল, তুই বিশ্বাস করবি নি। তোকে রাগের মাথায় তাড়িয়ে দিয়ে মনটা এমন হুহু করছিল! · মুখে আগুন নন্তের, অত খোসামোদ করিয়ে, একটা নাটাইয়ের দাম আদায় ক'রে যদিবা কালকে চিঠির কাগজ দিলে এনে, আজ কোন মতেই চিঠিটা ফেলে দিলে না রে! গ'লে যাক অমন দুশমন গতর—বেইমানের।

—এদিক-ওদিক একটু চেয়ে শেমিজের মধ্যে থেকে একটা গোলাপী খাম বের ক'রে মিনতির সুরে বললে, সত্যি তোকে বড্ড ভালবাসি শৈল—বললে না পেত্যয় যাবি।··এই চিঠিটা ভাই, বইয়ের মধ্যে লুকিয়ে নে। আর একটু ঘুরে পোস্ট-আপিসে ফেলে দিয়ে বাড়ি যেও; রোদটা একটু কড়া, কষ্ট হবে? হ্যাঁ, শৈলর আবার এ কষ্ট কষ্ট! নন্তে কিনা! এগারোটা বেজে গেছে; বারোটার সময় ডাক বেরিয়ে যাবে শৈল, লক্ষ্মীটি···

—আমি এখনও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—পুকুরধারে, শানের বেঞ্চের পেছনে, বকুলগাছের আড়ালে আমার কাঁধে বাঁ হাতটা দিয়ে নয়নতারা দাঁড়িয়ে আছে, আমার মুখের ওপর ডাগর ভাসা-ভাসা চোখ দুটি নীচু ক'রে, তাতে চিঠির গোপনতার একটু লজ্জা, খোসামোদের ধূর্ত্তামি, বোধ হয় একটু অনুতপ্ত স্নেহ, আর একটা কি জিনিস—একটা অনির্ব্বচনীয় কি জিনিস, যা শুধু নবপরিণীতাদের চোখেই দেখেছি, আর যা এই রকম চিঠি লেখা, চিঠি-পাওয়ার সময় যেন আরও বেশি ক'রে ফুটে ওঠে।

—এইখানে আমার ভালবাসার ইতিহাসের প্রথম অধ্যায় শেষ হ'ল, এই ফিরে যেতে যেতে আবার ঘুরে আসায়। তোমাদের ওই বয়সের মেয়েদের মজলিসের কোন অভিজ্ঞতা আছে?

তারাপদ বলিল, না।

রাধানাথ বলিল, কি ক'রে থাকবে বল? গার্জেনের কণ্টকারণ্যে মানুষ হয়েছি। চক্ষু সর্ব্বদা বইয়ের অক্ষর-লগ্ন থাকত, অক্ষরের রূপে যে মুগ্ধ ছিলাম তা নয়,—বই থেকে চোখ তুললেই বাবা কিংবা পাঁচ কাকার কেউ-না-কেউ চোখে পড়তেন। ছুটিছাটায় যদি দু-এক জন বাইরে গেলেন তো সেই ছুটির সুযোগে মামা-পিসেমশাইদের দল এসে আমার ভবিষ্যতের জন্যে সতর্ক হয়ে উঠতেন। তাঁরা ছিলেন উভয় পক্ষ মিলিয়ে সাত জন। শেষে এই তেরো জনে মাথা একত্র ক'রে বিয়ে দিলেন এমন একটি নিষ্কণ্টক মেয়ের সঙ্গে, যার বাপের সম্পত্তিতে ভাগ বসাবার জন্যে না-ছিল বোন, না-ছিল একটা ভাই যে, একটি শালাজেরও সম্ভাবনা থাকবে।··· নাও, ব'লে যাও। আবার মজলিস! এত কড়াক্কড়ির মধ্যে যে একটি মেয়ে কোন রকমে ঢুকে পড়েছে এই ঢের।

তারাপদ বলিল, রাধানাথ চটেছে। তা চটবার কথা বইকি।

শৈলেন বলিল, নয়নতারাদের মজলিসের কথা বলতে যাচ্ছিলাম। আগে বোধ হয় এক জায়গায় বলেছি যে, এ মজলিসে আমি মুক্তগতি ছিলাম। ছাড়পত্র ছিল বটে, কিন্তু এর পূর্ব্বে আমি তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতাম না। তার কারণ ওদের কথা সব সময় ঠিকমত বুঝতামও না, আর বুঝলেও সব সময় রস পেতাম না। আমার নিজেরও বয়স-সুলভ নেশা ছিল—মাছ ধরা, ষ্টেশনের পাথার দিকে চেয়ে ট্রেনের প্রতীক্ষা করা, এবং ট্রেনের ধোঁয়া দেখা দিলে লাইনে পাথর সাজিয়ে রাখা, ঘুড়ি ওড়ানো—এই সব। কিন্তু এবার থেকে আমার মস্ত একটা পরিবর্ত্তন দেখা দিল,—মাছ, ঘুড়ি, ট্রেনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব গিয়ে সমস্ত মনটি নয়নতারাদের মজলিসে, নয়নতারার—বিশেষ ক'রে নয়নতারার আশ্চর্য্য চোখ দুটিতে কেন্দ্রীভূত হয়ে উঠল। সে যখন তাস খেলত, আমি তার সামনে কারুর পাশে একটু জায়গা ক'রে নিয়ে ব'সে থাকতাম।

নয়নতারা তাস দিচ্ছে, পিঠ ওঠাচ্ছে; তার চুড়িগুলি গড়িয়ে একবার মণিবন্ধের নীচে, একবার কনুইয়ের কাছে জড়াজড়ি ক'রে পড়ছে; কখনও সে তার আনত চোখের ওপর ভ্রূ ছুটি চেপে চিন্তিতভাবে মাথা দোলাচ্ছে, তার কপালের কাঁচপোকার ময়ূরকণ্ঠী রঙের টিপটি ঝিকঝিক ক'রে উঠছে, —আমি ঠায় ব'সে ব'সে দেখতাম। তখন ছিল কাঁচপোকার টিপের যুগ, এখন বেচারী আর সুন্দর কপালে ঠাঁই পায় না, তার নিজেরই কপাল ভেঙেছে। আমি প্রতীক্ষা করতাম—জিতলে কখন্ নয়নতারার পান-খাওয়া ঠোঁটে হাসি ফুটবে! হারলে সে যে আমার কাছের মেয়েটিকে চোখ রাঙিয়ে কটুমন্দ বলবে, সে দৃশ্যও আমার কাছে কম লোভনীয় ছিল না। একটা কথা আমি স্বীকার করছি,—আজ যে ভাবে বয়সের দূরত্ব থেকে নয়নতারাকে দেখছি, সেসব দিন যে ঠিক সেই ভাবেই দেখতাম তা নয়। তখন তার সমস্ত কথাবার্ত্তা চালচলন হাসি-রাগ আমার কাছে এক মস্তবড় বিস্ময়কর ব্যাপার ব'লে বোধ হ'ত,—যে বিস্ময়ে মনের ওপর একটা সম্মোহন বিস্তার ক'রে মনকে টানে। এ দিক দিয়ে দেখতে গেলে মনোবিজ্ঞানের নিক্তির তৌলমত আমার মনোভাবটাকে 'ভালবাসা' না ব'লে 'ভাল-লাগা' বলাই উচিত ছিল। আমি ভালবাসা ব'লে যে শুরু করেছি, তার কারণ এর মধ্যে আমার ওই মনস্তত্ত্বেরই পরখ-মত কিছু কিছু জটিলতা ছিল, সে কথা পরে যথাস্থানে বলব।

—সেদিন তাসের মজলিস ছিল না, একটা বই পড়া হচ্ছিল। বইটা যে 'ভাগবত' কিংবা 'মনুসংহিতা' নয়—এ কথা বোধ হয় তোমাদের ব'লে দিতে হবে না। আমি যে বসেছিলাম, এটা ওরা গ্রাহ্যের মধ্যে আনে নি; তার প্রধান কারণ, ওরা নিজেদের খেয়ালে সেদিন খুব বেশি-রকম মশগুল ছিল; আর দ্বিতীয় কারণ—আগে বোধ হয় বলেছি—ওরা সাধারণত আমায় এসব বিষয়ে জড়পদার্থের সামিল ব'লেই ধ'রে নিত। সেদিন আবার আমি একেবারেই জড়পদার্থ হয়ে গিয়েছিলাম, কেন না, নয়নতারাকে সেদিন যেন আরও অপরূপ দেখাচ্ছিল। আমি বোধ হয় বইটাও শুনছিলাম না সেই জন্যে, তার বটতলা-মার্কা চেহারা মিলিয়ে মোটামুটি তোমাদের কাছে তার কুলশীলতা জানাতে পারলাম, তার নামধামটা দিতে পারলাম না।

—এর মধ্যে একটি মেয়ে—নামটা বোধ হয় তার সুধা, কি এই রকম কিছু, ঠিক মনে পড়ছে না—আমার দিকে চেয়ে বললে, শৈল, ভাই, যা না, আমার সেই কাজটা—দেরি হয়ে যাচ্ছে—

—অপর একজন জিজ্ঞাসা করলে, কি কাজ রে ?

—সুধা বললে, কিচ্ছু না।

—সেই মেয়েটা ঠোঁট উল্টে ভ্রূ নাচিয়ে বললে, ওরে ব্বাবা! শুধু আমি জানি আর আমার মন জানে! জিজ্ঞেস ক'রে অপরাধ হয়েছে, মাফ চাইছি।

—তার রাগটা পড়ল আমার ওপর। নাকটা কুঞ্চিত ক'রে বললে, তা তুই এখানে কচ্ছিস কি রে ? আরে গেল! তুই কি বুঝিস এসব ?

—অন্য একজন বললে, তোর পাঠশালা নেই ?

—কে উত্তর দিলে, পাঠশালে তো গুরুমশাই এসব কথা বলবে না। বলে তো দু বেলা ছেড়ে তিন বেলা গিয়ে সেখানে ধন্না দেয়। ও মিন-মিনেকে চিনিস না তোরা।

—কথাটার জন্যেও এবং আমার মুখের ভ্যাবাচ্যাকা ভাবটার জন্যেও ওদের মধ্যে একটা হাসি প'ড়ে গেল।

—একজন বললে, ওর আর দোষ কি ? ওদের জাতটাই হ্যাংলা, কি রকম ক'রে চেয়ে রয়েছে দেখ না। যেন পায় তো সবগুলোকে এক এক গেরাসে গিলে খায়।

—আবার একচোট হাসি। তারই মধ্যে একজন বললে, কাকে আগে ধরবি রে ?

—আবার হাসি, আরও জোরে; সব দুলে দুলে গড়িয়ে পড়তে লাগল, ঝড়ে ঘনসন্নিবিষ্ট গাছগুলো যেমন এলোমেলোভাবে পরস্পরের গায়ে লুটোপুটি খায়।

—হাসিতে যোগ দিলে না শুধু খনু। সে গম্ভীরভাবে বললে, আগে ধরবে নয়নকে; সেই থেকে ঠায় ওর মুখের দিকে কি ভাবে যে চেয়ে আছে! কি বয়াটে ছেলে গো মা! নয়ন আবার দেখেও দেখে না!

—এখন বুঝতে পারছি, তাকে ফেলে নয়নতারাকে দেখবার জন্যেই

তার এত আক্রোশ। খনুর আসল নাম ছিল ক্ষণপ্রভা। সে ছিল খুব ফরসা, সুতরাং সুন্দরী। এই রঙে-নামে তার চরিত্রের মধ্যে ঈর্ষার ভাবটা প্রবল ক'রে তুলেছিল।

—নয়নতারা যেন একটু অপ্রতিভ হয়ে গেল; কিন্তু তখনই সে-ভাবটা সামলে নিয়ে বললে, দেখতে হয়তো তোকেই দেখবে, আমার মত কালো কুচ্ছিৎকে দেখতে যাবে কেন?

—খনু বললে, আমায় দেখলে ঠাস ঠাস ক'রে ছোঁড়ার দু গালে চার চড় কষিয়ে দিতাম—নগদ দক্ষিণে।

—নয়নতারা ততক্ষণে সপ্রতিভ ভাবটা বেশ ফিরিয়ে এনেছে। চকিতে ভ্রূ নাচিয়ে বললে, পেট ভ'রে খাওয়ার পরেই দক্ষিণে হয়, আমায় দেখলে পেটও ভরবে না, দক্ষিণেও নেই।

—এটা প্রশংসা ছিল না, ঠাট্টা; কেন না, রঙেই সুন্দরী হয় না। হাজার গুমর থাকা সত্বেও খনুর যে এটা না-জানা ছিল এমন নয়। সে মুখটা ভার ক'রেই রইল।

—তুলনায় নয়নতারাই সবচেয়ে সুন্দরী ব'লে—বিশেষ ক'রে কালো হয়েও সুন্দরী ব'লে—খনুর দলেও কয়েকজন মেয়ে ছিল। তার মধ্যে সুধা এক জন। সে অবজ্ঞাভরে ঘাড়টা একটু বেঁকিয়ে বললে, ঠাট্টা কর্ নয়ন। কিন্তু খনুর মত হতে পারলে বর্ত্তে যেতিস—আমি হক্ কথা বলব।

নয়নতারা গাম্ভীর্য্য, মুখভার একেবারেই সহ্য করতে পারত না। গুমটটা কাটিয়ে মজলিসটায় হাসি ফোটাবার জন্যে মুখটা কপট-গম্ভীর ক'রে বললে, ওমা, সে আর যেতাম না! সঙ্গে সঙ্গে খনুর দিকে হেলে প'ড়ে বললে, আয় তো খনু, একটু গায়ে গা ঘ'ষে নি।

ফল কিন্তু উল্টো হ'ল। 'হয়েছে' ব'লে খনু হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে মজলিস ছেড়ে চ'লে গেল। খানিকটা চুপচাপ গেল, তার পর নয়নতারা হঠাৎ রেগে উঠে আমার দিকে চেয়ে বললে, ফের যদি তুই কাল থেকে এখানে এসেছিল তো তোর আর কিছু বাকি রাখব না। তুই মেয়েদের মুখের দিকে হাঁ ক'রে কি দেখিস রে?···গলা টিপলে দুধ বেরোয়···

—সবার হাসিঠাট্টা ধমকানির মধ্যে আমার অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠেছিল, কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললাম, আমি কথ্‌খনও দেখি না।

—নয়নতারা বললে, দেখিস, নিশ্চয় দেখিস ; তোর কোন গুণে ঘাট নেই। না যদি দেখিস তো এই যে খনী এক ডাঁই মিথ্যে ব'লে গেল, বোবার মত চুপ ক'রে রইলি কেন ?

—সুধা শরীর দুলিয়ে দুলিয়ে উঠে প'ড়ে বললে, খনু মিথ্যে বলে নি ; দেখে ও ড্যাব্‌ডেবে চোখ বার ক'রে। পাঁচ বছরেরই হোক আর পঞ্চাশ বছরেরই হোক—বেটাছেলেই তো ! আমাদের চোখে কেমন লাগে তাই বলি ; থাকলেই বলতে হয়, তার চেয়ে না থাকাই ভাল বাবা !

—সেদিন আড্ডা আর জমল না। কয়েকজন খনুর সঙ্গে মতৈক্যের জন্যে গেল ; বাকি কয়েকজন কথাটা নিয়ে খানিকটা নাড়াচাড়া করলে, তারপর আকাশে মেঘের অবস্থা দেখে একে একে উঠে যেতে লাগল। আমার অবস্থা হয়ে পড়েছিল ন যযৌ ন তস্থৌ'; আমাদের পাড়ার ননী উঠতে আমি কোন রকমে দাঁড়িয়ে উঠলাম।

—ননী মেয়েটি ছিল অত্যন্ত চাপা। সে যে কোন্ দিন কোন্ দলে, টপ্‌ ক'রে বোঝবার উপায় ছিল না। বোঝা যেত একেবারে শেষের দিকে, যখন সে নিজের নির্ব্বিকারত্ব পরিহার ক'রে তার অভীপ্সিত দলের একেবারে শেষ এবং মোক্ষম কথাটি ব'লে উঠে যেত। আমি উঠতেই বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলে, তুইও যাচ্ছিস নাকি ?

—বললাম, হুঁ।

—তা হ'লে দয়া ক'রে এগিয়ে যাও ; ভাব ক'রে সঙ্গে গিয়ে কাজ নেই—আমি তোমার ভাবের লোক নই।...না হয়, তুই পরেই আসিস 'খন, দিব্যি দু চোখ ভ'রে দেখ্‌ না ব'সে, আর তো কেউ বলবার রইল না। ব'লে চাবির থোলো-বাঁধা আঁচলটা ঝনাৎ ক'রে পিঠে ফেলে হনহন ক'রে চ'লে গেল।

—আমি খানিকটা জড়ভরতের মত দাঁড়িয়ে রইলাম। ননী বেশ খানিকটা চ'লে গেলে শচী বললে, মুখে আগুন, গোমড়ামুখী !

—শচীও চ'লে গেল। বৃষ্টি তখন এল ব'লে। আমি পা বাড়াচ্ছি, নয়নতারা বললে, ভিজে যাবি শৈল, একটু ব'সে যা; চল্, বাড়ির ভেতর।

—সে দিনটি আমার স্পষ্ট মনে আছে, আশা করি কখনও অস্পষ্ট হবে না। তখনও ভাল ক'রে বিকেল হয় নি, কিন্তু আকাশে গাঢ় মেঘের জন্যে মনে হচ্ছিল যেন সন্ধ্যের আর দেরি নেই। মজলিস যখন ভাঙল, সে সময় রেলের ওপারে বনের আড়াল থেকে একটা আরও কালো মেঘের ঢেউ যেন মেঘলা আকাশটায় ভেঙে পড়ল, মনে হ'ল দিনটাকে অতি শীঘ্র রাত ক'রে তোলবার জন্যে কোথায় যেন মস্ত বড় তাড়াহুড়ো প'ড়ে গেছে। একটু পরেই ঠাণ্ডা হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি নামল।

—রেলের দিকে নয়নতারাদের দুটো ঘর—একটা বড়, একটা অপেক্ষাকৃত ছোট। নয়নতারা একটু এদিক-ওদিক ক'রে এসে ছোট ঘরে রেলের দিকের জানলাটির চৌকাঠের পাশে বসল। আমায় বললে, তুই এইখানটায় ব'স্ শৈল, ভাগ্যিস যাস নি, না?

—বললাম, হাঁ, ভিজে যেতাম।

—জানলাটা দিয়ে অল্প অল্প বৃষ্টির ছাট আসছিল, নয়নতারা হঠাৎ গুটিসুটি মেরে একটু হেসে বললে, একটু একটু বৃষ্টি এসে গায়ে লাগলে কিন্তু বেশ লাগে, তোর ভাল লাগে না শৈল?

—বললাম, না, ভিজে যেতে হয়।

রাধানাথ বলিল, তখন তা হ'লে তোমার মাথায় একটু সুবুদ্ধি ছিল বলতে হবে, এখন দেখছি—

শৈলেন বলিল, ভুল বলছ, তখন বৃষ্টিতে ভেজা বরং একটা রীতিমত উৎসব ছিল আমার পক্ষে, কিন্তু সে সময় যা বললাম তা শুধু নয়নতারার কথা ভেবে,—তার ভেজা দেখে আমার কষ্ট হচ্ছিল।

তারাপদ বলিল, এত দূর!

শৈলেন বলিয়া চলিল, নয়নতারা ব'সে ব'সে অনেকক্ষণ ধ'রে বৃষ্টি দেখতে লাগল।...তার মুখের আধখানা দেখতে পাচ্ছি,—কি রকম অন্যমনস্ক হয়ে মুখটা একটু উঁচু ক'রে ব'সে আছে, মুখটাতে একটা ছায়া

পড়েছে, বৃষ্টির ছাটের ছোট ছোট গুঁড়ি মুখের এখানে-সেখানে, চোখের কোঁকড়ানো পাতার ডগায়, কপালের চুলে চিকচিক করছে। হঠাৎ কি ভেবে বললে, চার দিক মেঘে ঢেকে গেলে মনে হয় সব্বাই—যে যেখানে আছে—সব যেন এক জায়গায় রয়েছি, না রে শৈল ?

—এখন মানে বুঝি, তখন একেবারেই বুঝি নি; তবুও এত তন্ময় আর অন্যমনস্ক ছিলাম যে, কিছু না ভেবেই ব'লে দিলাম, হ্যাঁ।

—নয়নতারা বোধ হয় নিজের ঘোরে বলেছিল কথাটা, কোন উত্তরের অপেক্ষায় বা আশায় নয়। আমার দিকে একটু চেয়ে রইল। আরও খানিকক্ষণ চুপচাপের পর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে, মেঘ তোর কেমন লাগে শৈল ?

—সামান্য যেন একটু কুণ্ঠা, তার পরেই বললে, মেঘ কালো কিনা, তাই জিজ্ঞেস করছি, বিদ্যুৎ বরং ঢের সুন্দর···

—আমি উত্তর দিলাম, বেশ লাগে মেঘ।

—ঠিক মনে পড়ছে না, তবুও যেন বোধ হ'ল নয়নতারার চোখের তারা একটুখানির জন্যে কি রকম হয়ে গেল। হতে পারে এটা আমার আজকের সজাগ মনের ভুল বা অপসৃষ্টি, কিন্তু এই রকম বর্ষা পড়লেই সেদিনকার সেই ছবিটি যখন ফুটে ওঠে, দেখি নয়নতারার চোখ দুটি যেন একটু নরম হয়ে উঠল।

—একটু পরে আবার বললে, ক্ষণপ্রভা মানে বিদ্যুৎ—ঐ যে খেলে গেল—খনীর নাম—

আমি সরস্বতী দেবীর অতটা বিরাগভাজন হ'লেও কি ক'রে জানি না, এই অসাধারণ কথাটার মানে অবগত ছিলাম। সেইটিই পরম উৎসাহে বলতে যাব, এমন সময় নয়নতারা হঠাৎ জানলা থেকে নেমে এসে আমার সামনে ব'সে পড়ল এবং আমার মুখের পানে কি এক রকম ভাবে চেয়ে ব'লে উঠল, তুই আমায় অত ক'রে দেখিস কেন রে শৈল ? আমি কালো ···

—এখন আমিও বুঝেছি, তোমরাও বুঝছ আসল ব্যাপারটা কি—অর্থাৎ নয়নতারাকে সেদিন বর্ষায় পেয়েছিল, নবোঢ়ার মন পাড়ি দিয়েছিল

তার দয়িতের কাছে ;—আকাশে ওদিকে বর্ষা, সে এদিকে মনে মনে শৃঙ্গার করেছে, তার পরে আমার চোখের মুকুরে নিজের রূপটি দেখে নিয়ে সে যাবে···সে কালো, তাই তার অপূর্ণতার ব্যথা, বন্ধুর সঙ্গে তুলনা।

—সেদিন আমি এ কথাটা বুঝি নি, বোঝবার সম্ভাবনাও ছিল না। সেদিন এই বুঝলাম যে, আমার জন্যেই নয়নতারা এ প্রশ্নটা করছে, সে বলছে—তোমার যদি ভাল লাগে তা হ'লেই আমার রূপের আর জীবনের সার্থকতা, আমার সমস্ত জীবন-মরণ নির্ভব করছে তোমার একটি ছোট উত্তরের ওপর—

—আমি তখন যা ভেবেছিলাম তা গুছিযে বলতে গেলে এই দাঁড়ায় যে, সেদিন নয়নতারা আমায আমাব বযসের গণ্ডি থেকে তুলে নিযে আমায পৌরুষের জযটীকা পরিয়ে দিলে, আমার হ'ল প্রেমের অভিষেক।

—প্রবল কুণ্ঠায এবং কেমন একটা সশঙ্ক আনন্দে আমি মুখটা নামিযে নিলাম, উত্তর দিতে পারলাম না। উত্তর দিলে কথাটা তখনই পরিষ্কার হয়ে যেত, কেন না, নয়নতাবা সেদিনকার নিভৃতে যেমন নিঃসংকোচে আরম্ভ করেছিল তাতে সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তার বরের বথা এনে ফেলতই। যদি বলতাম, তবুও—অর্থাৎ কালো হ'লেও তুমি খুব সুন্দর, সে হয়তো বলত, তোর কথার সঙ্গে 'ওর' কথা মিলে গেছে শৈল,—মেলে কি না তাই দেখবার জন্যে জিজ্ঞেস করছিলাম। কিংবা এই বকম কিছু, কেন না, এই ধরনেরই একটা কথা তাব মনে ঠেলে উঠছিল।

—ফলে, সত্যের আলোয যে ধারণাটা তখনই নিরর্থক হয়ে যেতে পারত, মিথ্যার অর্থাৎ ভ্রান্তির অন্ধকারে সেটা আমার জীবনে একটা অপূর্ব্ব সার্থকতা লাভ করলে। আমার ভালবাসার তন্তু এতদিন শূন্যে দুলছিল, আশ্রয়-শাখা এগিয়ে এসে তাকে স্পর্শ করলে। বোধ হয়, এত দিন আমার শুধু ভাল লাগছিল মাত্র, সেদিন থেকে আমি নিঃসন্দেহ ভালবাসলাম, আমার ভালবাসার ইতিহাসে দ্বিতীয় স্তর আরম্ভ হ'ল।

তারাপদ বলিল, তোমার গল্পটা মন্দ লাগছে না, তবে জিনিসটাকে ভালবাসা বলায় স্পর্দ্ধার গন্ধ আছে, যদিও এ ভ্রান্তির জন্য আমরা তোমায় ক্ষমা করতে রাজি আছি, কেন না, ভ্রান্তিই কবির ধর্ম্ম।

রাধানাথ বলিল, কেন না, কবি বিধাতার ভ্রান্তিই।

শৈলেন বলিল, না, সেটা ভালবাসাই, কেন না, এবার থেকে যা লক্ষণ সব প্রকাশ পেতে লাগল, তা ভালবাসার একেবারে নিজস্ব জিনিস— ট্রেডমার্কা দেওয়া।...একটি গুরুতর লক্ষণ দাঁড়াল—ঈর্ষা।

—হ্যাঁ, তার আগে সেদিনকার কথাটা শেষ ক'রে দিই। উত্তর না পেয়ে নয়নতারা আমার মুখটা দুটো আঙুল দিয়ে তুলে ধ'রে বললে, তোর বুঝি আবার লজ্জা হ'ল!

—বোধ হয় তার প্রশ্নের জটিলতাটা উপলব্ধি করলে এতক্ষণে। একটু কি ভাবলে, তার পর আমার হাতটা ধ'রে একটু গলা নামিয়ে বললে, আমি তোকে ও-কথাটা জিজ্ঞেস করেছি, কাউকে বলিস নি যেন শৈল, বলবি না তো? ব'স্, আমি আসছি।—ব'লে চ'লে গেল; অবশ্য আর এল না সেদিন।

শৈলেন একটু চুপ করিল। রাধানাথ বলিল, বৃষ্টি তোমার কবিত্বের গোড়ায় জল জোগাচ্ছে বটে শৈলেন, কিন্তু ওদিকে তারাপদ কার্পেটটা ভিজিয়ে তার সমূহ অপকার করছে, আতিথেয়তার ত্রুটি হয় ব'লে বোধ হয় ও-বেচারা—

তারাপদ তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিল, শৈলেন বলিল, দাও বন্ধ ক'রে।

বন্ধ জানলার উপর ধারাপাতের জন্য মনে মনে হইল, বৃষ্টিটা যেন হঠাৎ বাড়িয়া গেল। শৈলেন চোখ বুজিল, যেন কোথায় তলাইয়া গিয়াছে। তারাপদ আর রাধানাথ বুঝিল, সেদিন নয়নতারাকে যেমন বর্ষায় পাইয়াছিল আজ ঠিক সেই ভাবে পাইয়াছে শৈলেনকে। শৈলেনের গল্প আর বাহিরের বর্ষা বোধ হয় তাহাদের ভিতরের গদ্যাংশও কিছু কিছু তরল করিয়া আনিয়াছিল, তাহারা শৈলেনের মৌনতায় আর বাধা দিল না।

একটু পরে যেন একটা অতল তরলতা হইতে ভাসিয়া উঠিয়া শৈলেন

বলিল, হ্যাঁ, কি বলছিলাম? ঠিক, ঈর্ষার কথা। যখন আমার ভাল-লাগার খাদ ম'রে গিয়ে সেটা ভালবাসায় দাঁড়াল, সেই বরাবর থেকে একটি নির্দ্দোষ নিরীহ লোক আমার শত্রু হয়ে দাঁড়াল,—সাক্ষাৎ ভাবে আমার কাছে কোন অপরাধ না ক'রেও। এই লোকটি নয়নতারার স্বামী অক্ষয়।

—অক্ষয়ের পরোক্ষ অপরাধ এই যে, সে নয়নতারাকে বিবাহ করেছে। ঘটনাটি প্রায় এক বৎসরের পুরনো, কিন্তু এতদিন এতে ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না, কেন না অক্ষয় এতদিন একটি নির্ব্বিঘ্ন নেপথ্যে অবস্থান করছিল। বর্ষায় সে দিন নয়নতাবার যে নূতনতর আলো ফুটে উঠল, সেই আলোতে হঠাৎ অক্ষয় দুর্নিরীক্ষ্য ভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অনেক কথা, যা কখনও ভাবিও নি, তা শুধু ভাবনাব নয়—একেবারে দুর্ভাবনার বিষয় হযে উঠল। নয়নতারা আমায় খুবই ভালবাসে—আমার জন্যে নারকেল নাড়ু চুরি ক'রে রাখে, ছেঁড়া কাপড়ের রুমাল তৈরি ক'রে তাতে রেশমের ফুল তুলে দেয়, ঘুডির ডালপুরিব পয়সা জোগায়, গুরুমশাইযের বেতেব দাগ পড়লে আমাব পিঠে হাত বুলিয়ে রুচিকর ভাষায় গুরুমশাইযের আগুশ্রাদ্ধেব ব্যবস্থা কবে—জীবনেব অমূল্য সম্পদ এসব; কিন্তু তার সামান্য একটি চিঠি পাবার কি পাঠাবার আগ্রহ আজ হঠাৎ এসবকে যেন নিষ্প্রভ অকিঞ্চিৎকর ক'রে দিলে। সে আগ্রহটা আমাব প্রতি তাব সাক্ষাৎ আচরণের কাছে সামান্যই একটা ব্যাপার—কে পৃথিবীর কোন্ এক কোণে প'ডে আছে, তার সঙ্গে দুটো অক্ষরের সম্বন্ধ, কিন্তু এটাও আমার অসহ্য হয়ে উঠতে লাগল। ষোল আনার মধ্যে সাড়ে পনরো আনা আমিই পাচ্ছি, কিন্তু ওদিকে যে ওই দুটো পয়সা যাচ্ছে, ওটুকু বরদাস্ত করা—যতই দিন যেতে লাগল, ততই আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠতে লাগল।

—ঠিক এই সময় একটা ব্যাপার ঘটল, যা অবস্থাটিকে ঘনীভূত ক'রে তুললে।

—একদিন সুধার একটা খুব জরুরি চিঠি ডাকে দিতে যাচ্ছি। স্টেশনটা ছাড়িয়েছি, এমন সময় স্টেশনের গেট দিয়ে অক্ষয় বেরিয়ে

এল। সেই ট্রেন থেকে নেমেছে। চুল উস্কখুস্ক, মুখ শুকনো। আমায় দেখেই থমকে দাঁড়িয়ে বললে, এই যে শৈলেনভায়া! মানে—ইয়ে—এরা সব কেমন আছে বলতে পার?

—তখন 'এরা'-র মানে আমি বুঝি, না বোঝাই অস্বাভাবিক, বললাম, ভাল আছে।

—অক্ষয়ের মুখটা যেন অনেকটা পরিষ্কার হ'ল। আমার হাতটা ধ'রে জিজ্ঞেসা করলে, পথ্যি পেয়েছে? কবে পেলে, অ্যাঁ?

—আমি বিস্মিত হয়ে চুপ ক'রে রইলাম, তারপর বললাম, কই, তার তো অসুখই করে নি।

—অসুখ করে নি! তবে?—ব'লে অক্ষয়ও খানিকটা আশ্চর্য্য হয়ে আমার মুখের দিকে চাইলে, আস্তে আস্তে চোখ ঘুরিয়ে কি ভাবলে, তার পর মুখটা হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললে, দেখ, কাণ্ড! আচ্ছা তো!···তুমি বুঝি চিঠি ফেলতে যাচ্ছ?—কোন্ দময়ন্তীর?

—নয়নতারাকে লেখা পত্রে অক্ষয় আমার সম্বন্ধে প্রায়ই উল্লেখ করত 'হংসদূত' ব'লে, তা নিয়ে চিঠি পড়বার সময় চর্চ্চা হ'ত। সুতরাং দময়ন্তী কথাটার অর্থ বুঝতে আমার অসুবিধে হ'ল না। বললাম, সুধাদিদির।

—ওই তো লেটার-বক্স,—যাও, ফেলে দিয়ে এস। এক সঙ্গে যাওয়া যাবে 'খন।

—ভালবাসা যখন জ'মে আসছে, তার মধ্যে অক্ষয়ের এসে পড়াটা আমার মোটেই প্রীতিকর হয় নি, কিন্তু ফিরে আসতে আসতে যখন শুনলাম নয়নতারার এই মিথ্যাচরণের জন্যে তাকে কি নাকালটা ভোগ ক'রেই চ'লে আসতে হয়েছে, তখন আমার মনটা খুবই খুশি হয়ে উঠল। বেচারা আফিস থেকে বাড়িও যেতে পারে নি; যখন স্টেশনে, তখন ফার্স্ট বেল হয়ে গেছে, ছুটতে ছুটতে শান-বাঁধানো প্ল্যাটফর্মে পিছলে প'ড়ে গিয়ে হাঁটুটা গেছে কেটে, হাতটা গেছে ছ'ড়ে; কাপড়ে রক্তের দাগ দেখিয়ে বললে, এই দেখ কাণ্ডটা!

—এটার আকস্মিকতাটা আমি আর ধরলাম না; আমার মনে হ'ল,

দারুণ দুর্ভাবনায় ফেলা থেকে নিয়ে প্ল্যাটফর্মে আছাড়-খাওয়ানো পর্য্যন্ত সমস্তই নয়নতারার কীর্ত্তি,—সৎকীর্ত্তি। আমার মনটা নয়নতারার ওপর প্রসন্নতায় ভ'রে উঠল এবং অক্ষয়কে চিঠি লেখবার জন্যে, আর তার চিঠির প্রতীক্ষা করবার জন্য যে মনে মনে একটা অভিমান এবং আক্রোশের ভাব ঠেলে উঠছিল সেটা একেবারে কেটে গেল। বুঝলাম, এত যে চিঠি তার মধ্যে এই নিতান্ত অবাঞ্ছনীয় জীবটিকে প্ল্যাটফর্মে আছাড় খাওয়াবার একটা গূঢ় অভিসন্ধি জ'মে উঠেছিল। অক্ষয়ের প্রতি আমার মনের ভাবের সঙ্গে বেশ একটা নিবিড়তর ঘনিষ্ঠতা উপলব্ধি করলাম।

—তার পরদিন দুপুরের মজলিস বেশ জমাট রকম হ'ল—প্রায় ফুল হাউস। কিন্তু কথাবার্ত্তা প্রশ্নোত্তর বেশির ভাগই চাপা গলায় হওয়ায় এবং বিতর্কের ভাগটা কম থাকায় গোলমাল বেশি হ'ল না। আমাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি পুকুরেব ওপারে কামিনীতলায় ব'সে মাঝে মাঝে হাসির হব্‌রা শুনছিলাম আর অক্ষযকে আমার এই নির্ব্বাসনের জন্যে দায়ী করে মনের নির্ব্বাণপ্রায রাগের শিখাটিকে আবার পুষ্ট ক'বে তুলছিলাম।

—প্রথম পর্ব্ব শেষ হ'লে তাস পড়ল। নয়নতারা আমায় বাড়ি থেকে কি একটা আনতে বললে। এনে দিয়ে আমি দলের পাশে আমার জায়গাটিতে বসলাম। সুধা একবার আমার দিকে চেয়ে হেসে বললে, ছেলেটা কি গো? তাড়ালে যায় না!

—কে বললে, জাত-ই ওই রকম। এর পরে একবাব 'তু' করলে হাঁটু ছেঁচে, রক্ত-মাখামাখি হয়ে ছুটে যাবে। আহা—

—তাসের দান দেওয়ার মধ্যে হাসির হর্‌রা ছুটল। খানিকক্ষণ কাটল।

—নয়নতারার চোখের আর একটা বিশেষত্ব এই ছিল যে, নীচের দিকে চাইলে চোখের সুপুষ্ট মসৃণ পাতা দুটি এমন নিরবশেষভাবে চোখ দুটিকে ঢেকে ফেলত যে, মনে হ'ত, যেন সে চোখ বুজে আছে। পরে পদ্যলেখা উপলক্ষে আমি এই জিনিসটিকে কিশলয়ে-ঢাকা কুঁড়ির সঙ্গে তুলনা করেছি। বেশিক্ষণ এই ভাবে চিন্তা করলে মনে হ'ত যেন সে ঘুমুচ্ছে;

কিন্তু তার চোখের গড়নই অপরের চোখে এই দৃষ্টিবিভ্রম ঘটাত ব'লে কেউ বড়-একটা টুকত না। সেদিন কিন্তু হাতের তাসের দিকে নজর রেখে প্রায় মিনিট দু-তিন ওরকম ভাবে থাকবার পর নয়নতারার মাথাটা হঠাৎ সামনে ঢুলে পড়ল। খন্নু বললে, ওমা নয়ন, তুই যে সত্যিই ঘুমুচ্ছিস লা! আমরা ভাবছি—

—নয়নতারা একেবারে হকচকিয়ে উঠল, প্রথমটা অপ্রতিভ ভাবে বললে, ধ্যাৎ, কই, যাঃ। সঙ্গে সঙ্গে মুখটা বিরক্তিতে কুঞ্চিত ক'রে বললে, না ভাই, সারারাত জাগিয়ে রাখা ভাল লাগে না। কবে যে যাবে—আপদ!

—এইটুকুই যথেষ্ট ছিল; আমার মধ্যেকার নাইট্—যে বীরকে তোমরা কঙ্কাবতীর সন্ধানে পাতালপুরীতে দেখে থাকবে—প্রতিহিংসায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। আমি আপদ বিদায়ে একেবারে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠলাম।

—সেদিন সন্ধ্যের সময় জামার মধ্যে হাত গলাতে গিয়ে দুটি লুকোনো বিছুটি-ডগার সংস্পর্শে যন্ত্রণা, আর শ্বশুর-বাড়িতে সে-যন্ত্রণা রাখবার ভদ্রতার মাঝে প'ড়ে অক্ষয় অস্থির হয়ে পায়চারি করলে খানিকটা। তারপরে বোধ হয় ডাক ছেড়ে কাঁদবার সুবিধের জন্যে বেড়াতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে যেই জুতোয় পা ঢোকাবে—'উ' ক'রে এক রকম চীৎকার ক'রেই পা-টা বের ক'রে নিলে—এক মুঠো শেয়াল-কাঁটায় পা-টা সজারুর মত হয়ে উঠেছে।

—বাড়িতে একটা হৈ-হৈ প'ড়ে গিয়ে সকলে সাবধান হয়ে পড়ায় আর তখন কিছু নতুন উপদ্রব হ'ল না, কিন্তু অক্ষয় সন্ধ্যের পর বেরিয়ে যেই বাড়িতে ঢুকবে, অন্ধকারে একটা ঢিল বোঁ ক'রে তার কানের কাছ দিয়ে বেরিয়ে গেল এবং চীৎকার ক'রে রাঙচিতের বেড়া টপকাবার আগেই আর একটা সজোরে এসে তার মাথায় লাগল।

—সে সময় হাজার তল্লাস ক'রেও আততায়ীর সন্ধান পাওয়া গেল না বটে, কিন্তু তোমাদের বোধ হয় বুঝতে বাকি নেই যে, সে মহাপুরুষটি কে!

—তোমাদের যদি নিজের নিজের গায়ে হাত দিয়ে বলতে বলা হয় তো নিশ্চয়ই স্বীকার করবে যে, আজন্ম-কলিকাতাবাসীরা পৃথিবীর মধ্যে

সবচেয়ে দুটি জিনিসকে বেশি ভয় করে,—সাপ আর ভূত; আর তাদের বিশ্বাস, ওদিকে লিলুয়া আর এদিকে দমদমার পরে সমস্ত ভূভাগ এই দুই উপদ্রবে ঠাসা। অক্ষয় যখন নিঃসন্দেহ হ'ল যে, এটা বাড়ির কারুর ঠাট্টা নয়, তখন তার এ সন্দেহ রইল না যে, সমস্ত ব্যাপারটা একেবারে ভৌতিক। সে রাতটা নিরুপায়ভাবে কোন রকমে কাটালে এবং তার পরদিন দুপুরে—অর্থাৎ রাত্রি হবার এবং তার সঙ্গে সেই উৎকট রকম ঠাট্টাপ্রিয় অশরীরীর আবির্ভাব হওয়ার ঝাড়া পাঁচ-ছ ঘণ্টা পূর্ব্বে সে বেচারী হাওড়া-মুখো গাড়িতে গিয়ে বসল।

—সেদিন আমি ওদিকে যেতে পারি নি—শেতলাতলায় যাত্রার আসরের জন্যে কাগজের শেকল তৈরি করতে ধ'রে নিয়ে গেল।

—তার পরের দিন কিছু সকালেই আমি বিজয়ী বীরের মত গিয়ে নয়নতারাদের বাড়িতে উপস্থিত হলাম। সে নিশ্চয়ই সমস্ত রাত নিরুপদ্রবে ঘুমিয়ে এতক্ষণ উঠেছে। এইবার গিয়ে তার ত্রাণকর্ত্তা যে কে, সেটা জানিয়ে বিস্ময়ে আহ্লাদে কৃতজ্ঞতায় তাকে অভিভূত ক'রে ফেলতে হবে।

—গিয়ে যা দেখলাম, তাতে আমার নিজেরই বিস্ময়ের সীমা রইল না। পুকুরঘাটের শেষ রাণাটিতে, মুখ ধোওয়ার জন্যে বাঁ হাতে খানিকটা ছাই নিয়ে নয়নতারা নিঝুম হয়ে বসে আছে। চুল উস্কখুস্ক, মুখটা খুব শুকনো, চোখ দুটো ফুলোফুলো আর রাঙা।

—আমি গিয়ে বসতে একবার ফিরে দেখলে, তার পর চিবুকটা হাঁটুর ওপর রেখে চোখ নীচু ক'রে ব'সে রইল।

—প্রথমটা মনে হ'ল, অক্ষয় সব আক্রোশ নয়নতারার ওপর মিটিয়ে গেছে। কি ভাবে যে একটা কথা জিজ্ঞেস করব ঠিক ক'রে উঠতে পারছিলাম না। চেয়ে আছি, হঠাৎ দেখি তার দু চোখ বেয়ে ঝরঝর ক'রে জল নামল। আশ্চর্য্যের ভাবটা চাপতে না পেরে ব'লে উঠলাম, কাঁদছ যে তুমি? কাঁদছ কেন?

যাঃ, কাঁদছি কোথায়?—ব'লে নয়নতারা আঁচল তুলে চোখ দুটো মুছে ফেললে। একবার, দুবার, তার পর বাঁধ-ভাঙা বন্যার মত এত

জোরে অশ্রু নামল যে, আর আঁচল সরাতে পারলে না, চোখ দুটো চেপে ধ'রে ব'সে রইল। একটু পরেই ফোঁপানির আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীরটা দুলে দুলে উঠতে লাগল।

—খানিকক্ষণ এইভাবে গেলে বেগটা যখন ক'মে এল, আঁচলের মধ্যে থেকেই কান্নার ভাঙা ভাঙা স্বরে বললে, অত কাকুতিমিনতি ক'রে মিথ্যে অসুখের কথা লিখে নিয়ে এলাম শৈল, মার খেয়ে গেল! কে মারলে বল্ দিকিনি? কার কি করেছিল সে? নিরীহ, নির্দ্দোষ মানুষ—

—আর বলতে পারলে না, ভেঙে পড়ল।

—ঠিক সেই সময়টিতে নয়নতারার কান্নার মধ্যে বিনিয়ে-বিনিয়ে কথাগুলো শুনে এবং কতকটা নিজের অপরাধের জ্ঞানের জন্যেও আমিও কান্নাটা থামাতে পারলাম না বটে, কিন্তু সেই দিনই কোন একটা সময় থেকে নয়নতারার এই রকম পক্ষপাতিত্বের জন্যে অক্ষয়ের উপর বিদ্বেষ আর হিংসার ভাবটা একেবারে উৎকট হয়ে উঠল।

—ছেলেবেলার চিন্তাগুলো ঠিক গুছিয়ে মনে আসে না, অন্তত যা মনে আসত, তা এত দিনের ব্যবধান থেকে গুছিয়ে বলা যায় না। শুধু মনে পড়ছে এই পক্ষপাতিত্বের জন্যে—যেটা নিছক নয়নতারারই দোষ—আমি নয়নতারার ওপর না চ'টে চটলাম অক্ষয়ের ওপর। লোকটাকে যে নয়নতারা আসার জন্যে সত্যিই কাকুতিমিনতি ক'রে লিখেছিল— প্ল্যাটফর্ম্মে আছাড় খাওয়াবার অভিপ্রায়ে যে ডাকে নি, তাকে যে নয়ন-তারা নির্দ্দোষ বলে—এই সব হ'ল অক্ষয়ের অমার্জ্জনীয় অপরাধ; আর সবচেয়ে বড় অপরাধ হ'ল তার বিবাহ করাটা, যার জন্যে নয়ন তাকে কাকুতিমিনতি ক'রে ডেকেছে, আর আমি অত কষ্ট ক'রে তার মাথা ফাটালে তাকে নির্দ্দোষ বলেছে, তার জন্যে চোখের জল ফেলেছে।

শৈলেন চুপ করিল। তারাপদ প্রশ্ন করিল, তোমার গল্প শেষ হ'ল নাকি? উপসংহার কোথায়?

শৈলেন বলিল, ভালবাসা তো গল্প নয় যে, উপসংহার থাকবে, বইয়ের দুটি মলাটের মধ্যে তার আদি-অন্ত মুড়ে রাখা যাবে! তবুও যদি ভালবাসাকে গল্প-উপন্যাসের সঙ্গেই তুলনা কর তো বলা যায় তার

উপসংহার নেই, মাত্র অধ্যায় আছে ; সে কোন এক অনির্দ্দিষ্ট সময়ে একবার আরম্ভ হয়, তারপর অধ্যায়ের পর অধ্যায় সৃষ্টি ক'রে তার অফুরন্ত গতি—

সে সময়ের অধ্যায়টিই না হয় শেষ কর।

সেটার শেষ ছিল একটা সামান্য চিঠি। একদিন নয়নতারা আমায় অক্ষয়ের নামে একটা চিঠি ডাকে ফেলে আসতে দিয়ে হঠাৎ থমকে মুখের দিকে চেয়ে বললে, হ্যাঁ রে, তুই চিঠি খুলে পড়িস নে তো ? খবরদার ! আর এই ৭৪৷৷ দেওয়া রইল, পড়লে বুকে ব্যথা হবে।

—আমার যে বুকে একটা ব্যথা ছিলই, নয়নতারা সে খবর রাখত না।

—এর আগে কখনও কারুর চিঠি খুলি নি, কিন্তু সেদিন আমি পোস্ট-আপিসের রাস্তাটা একটু ঘুরে বাড়ি এলাম এবং একটা নির্জ্জন জায়গা বেছে নিয়ে চিঠিটা খুললাম।

৭৪৷৷-এর দিব্যিটা আমার হাতে হাতে ফলল। সে যে কী বিনিয়ে-বিনিয়ে লেখা চিঠি—কত ব্যাকুলতা, কত আদর, কত আশ্বাস, ফিরে আসবার জন্যে কত মাথার দিব্যি ! এবার নয়নতারা তাকে বুকে ক'রে রাখবে, যে শত্রুতা করেছে তার সমস্ত অত্যাচার নিজের সর্ব্বাঙ্গে মেখে নেবে ; অক্ষয় ফিরে আসুক, নয়নতারার চোখে ঘুম নেই—কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়েছে, এসে একবার দেখুক অক্ষয়, একবার দেখুক এসে তার অত আদরের নয়ন কি হয়ে গেছে—

—এত চায় সে অক্ষয়কে ? ক্ষোভে, ঈর্ষায়, অসহায়তায় আমার বুকের মধ্যে একটা অসহ্য যন্ত্রণা ঠেলে উঠতে লাগল। সেদিন ঢিল কুড়োবার সময় কি ক'রে একটা পুরনো ভাঙা শাবল হাতে উঠেছিল। কি ভেবে সেইটেরই সদ্ব্যবহার করি নি। সেই আপসোসে ছটফট করতে লাগলাম।

—বোধ হয় সেদিন ঢিল ছোঁড়বার কথা মনে হওয়ার জন্যেই মনে প'ড়ে গেল যে, অক্ষয় সমস্ত কাণ্ডটা ভৌতিক ভেবেই তাড়াতাড়ি পালিয়েছিল। আমার মাথায় একটা সুবুদ্ধি এসে জুটল।

—আমি আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে কালি-কলম নিয়ে এলাম এবং আমার লেখার খাতা থেকে খানিকটা কাগজ ছিঁড়ে খুব জোরে ঢিল ছুঁড়তে পারে এই রকম জবরদস্ত ভূতের হাতের উপযোগী মোটা মোটা অক্ষরে, চন্দ্রবিন্দু সংযুক্ত ভূতোচিত শুদ্ধ ভাষায় লিখলাম, খঁবরদার, এঁবার এঁলে এঁকেবারে ঘাঁড় মঁটকে তোঁর রঁক্ত খাঁব—এবং আমি যে ভূত, এটা প্রমাণ দিয়ে ভাল ক'রে বিশ্বাস করাবার জন্যে জুড়ে দিলাম, আঁমি খাঁমের মঁধ্যে ঢুঁকে সঁব পঁড়েছি। আঁমার সঁঙ্গে চাঁলাকি?

—তোমরা হাসছ? কিন্তু এর পরেই আমার অবস্থা অতিশয় করুণ হয়ে উঠল, কেন-না, এ ভূতের নামধাম পরিচয় বের করতে খুব বেশি রকম বিচক্ষণ রোজার দরকার হ'ল না। তার ভূতপূর্ব্ব কীর্ত্তিও সব ধরা পড়ে গেল—ভূতপূর্ব্বই বল কিংবা অদ্ভুতপূর্ব্বই বল।...বৃষ্টিটা কি থেমে আসছে?

শৈলেন আবার খানিকটা চুপ করিল। তারপর বলিল, এর কয়েক দিন পরে এসে বাবা আমায় বিদেশে তাঁর কর্ম্মস্থানে নিয়ে গেলেন। তার পর আর নয়নতারার সঙ্গে দেখা নেই।

তারাপদ বলিল, কিন্তু কি যেন অফুরন্ত অধ্যায়ের কথা বলছিলে?

শৈলেন বাহিরের ম্রিয়মাণ বর্ষার বিলম্বিত মৃদঙ্গ কান পাতিয়া শুনিতেছিল, আত্মসমাহিত ভাবে বলিল, হ্যাঁ, তবে একটু ভুল হয়েছিল, —অধ্যায় নয়, সর্গ,—জীবনের পাতা একটির পর একটি পূর্ণ ক'রে ভালবাসার করুণ গাথা সর্গের পর সর্গ সৃষ্টি ক'রে চলেছে..."

রাধানাথ বলিল, তুমি কবি, হিসেবের গণ্ডীকে নিশ্চয় এড়িয়ে চল; তাই মনে করিয়ে দিচ্ছি, তোমার আট বৎসরের সময় নয়নতারার বয়স যদি পনরো বৎসর ছিল তো তোমার এখন পঁয়ত্রিশ বৎসরে সে বিয়াল্লিশ বৎসর অতিক্রম ক'রে...

শৈলেন উঠিয়া বসিল, বলিল, ভুল বলছ তুমি,—নয়নতারার বয়স হয় না। আমার প্রেম তার স্ফুটনোন্মুখ যৌবনকে অমরত্ব দিয়েছে। তার পরের নয়নতারা—সে তো আমার জীবনে নেই। আমার নয়নতারা —এখনও সেই পুকুরঘাটটিতে সখীপরিবৃতা হয়ে বসে; রূপে রসে পূর্ণতায়

উজ্জ্বল। তার কত দিনের কত কথা, ভঙ্গি, তার আশ্চর্য্য চোখের পরমাশ্চর্য্য চাউনির খণ্ড খণ্ড স্মৃতি আমার জীবনে এক-একটি অখণ্ড কাব্যের মধ্যে রূপ ধ'রে উঠেছে। যখন আমি থাকি প্রফুল্ল—ত্রিশ বৎসরের দীর্ঘ ব্যবধানের ওপারে দেখি নয়নতারা হাসিতে, কপট গাম্ভীর্য্যে কিংবা অকপট কৌতুকপ্রিয়তায় ঝলমল করছে; তার চিক্কণ চুলের নীচে, ঘোরালো গালের প্রান্তে পারসী মাকড়িটা চঞ্চল হয়ে উঠেছে; আমি যখন থাকি মৌন বিমর্ষ, তখন বিকেলে নয়নতারার আকাশ ঘিরে বর্ষা নামে—রেলের ধারের ঘরটিতে মেঘের ওপর চোখ তুলে নয়নতারা নির্ব্বাক হয়ে চেয়ে থাকে, মেঘবিলুপ্ত সান্ধ্য সূর্য্যের মত কানের পারসী মাকড়ি কেশের মধ্যে ঢাকা, আমার দিকে ফেরানো গালটিতে একটা অশ্রুবিন্দু টলমল করছে…

—আমি জীবনে আর কাউকেই চাই নি, আমার জীবনের চিত্রপটে নয়নতারাকে অবলুপ্ত ক'রে আর কারুর ছবিই ফুটতে পায় নি। পনরো বৎসরের অটুট যৌবনশ্রীতে প্রতিষ্ঠিত ক'রে তারই ওপর নিবদ্ধ-দৃষ্টি আমি তাকে অতিক্রম ক'রে আমার পঁয়ত্রিশ বৎসরে এসে পড়েছি—সূর্য্য যেমন যৌবনশ্যামলা পৃথিবীকে অতিক্রম ক'রে অপরাহ্ণে হেলে পড়ে। আজকের এই বর্ষায় কি তোমরা কথাটা অবিশ্বাস করতে পারবে?

তারাপদ বলিল, আমরা স্বয়ং তোমার বিশ্বাসের জন্যে ভাবিত হয়ে উঠেছি—কেন-না, বর্ষাটা গেছে থেমে।

পাতু

ভগবানের সম্বন্ধে আপনাদের কোন রকম স্পষ্ট ধারণা আছে ?—বোধ হয়, নাই। না-থাকিবারই কথা ; কেন-না, সম্ভবত আপনারা সকলে সেই পন্থাই ধরিয়াছেন, যাহা অবলম্বন করিয়া আমায় হার মানিতে হইয়াছে। ওসব আগম-নিগম বেদপুরাণে কোনই ফল হয় না। অরণ্যে ঘুরিয়া বেড়ানো, শুধু সংশয়ের ঘন অন্ধকার—যেটাকে একটু পথ বলিয়া মনে হয়, দেখা যায়, সেটা আরও নিবিড়তর অরণ্যে লইয়া আসিয়াছে মাত্র।

তাই ব'লতেছিলাম, বেশ একটা বিশদ ধারণা না থাকিবারই কথা। আমারও ছিল না ; তবে সম্প্রতি লাভ করিয়াছি এবং আপনাদের মত যাঁহারা অজ্ঞ, তাঁহাদের কাছে প্রকাশ না-করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। জানেনই তো—থাকিতে পারা যায় না, জিনিসটা এই রকমই।

অতএব আমি যাহা জানিয়াছি শুনুন—ভগবান আকাশের চেয়েও বড়, ইচ্ছা করিলে হাতীর চেয়েও বেশি খাইতে পারেন, আর প্রয়োজন হইলে রেলগাড়ির চেয়েও জোরে দৌড়াইতে পারেন।

এ ঈশতত্ত্ব অপৌরুষেয় কি না বলিতে পারিলাম না। আমার পাওয়া আমার ভাইঝি ছবির কাছে। তত্ত্বটি অপূর্ণ হইতে পারে, কেন-না, ভগবানের ষড়ৈশ্বর্য্যের মধ্যে তিনটি মাত্র পাওয়া যাইতেছে ; কিন্তু এই তিনটিতেই ধারণা এত স্পষ্ট করিয়া দিতেছে যে, অপর তিনটির জন্য মাথা ঘামাইবার দরকারই হয় না। নয় কি ?

আমার দীক্ষা ছবির কাছে। ছবির গুরু পীতু। ধানবাদের পীতু—আপনারা নিশ্চয় জানিতে পারেন। জানেন না ?—আপনারা যে অবাক্ করিলেন। অবশ্য আমিও জানিতাম না। কিন্তু ছবির কাছে যে-রকম পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, এবং তাহাতে ধানবাদের দিকের পৃথিবীটা সে একাই যে-রকম ভরাট করিয়া আছে বলিয়া মনে হইতেছে, তাহাতে

তাহার সম্বন্ধে লোকে অজ্ঞ থাকিতে পারে—বিশ্বাসই করিতে পারা যায় না; আমি নিজেও কি করিয়া ছিলাম, আশ্চর্য্য হইতেছি।

যতটা আন্দাজ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে মনে হয় পীতুর বয়স চার হইতে সাতের মধ্যে। আমাকে ছবির বয়সের তুলনায় আন্দাজটা করিতে হইতেছে। ছবির নিজের যাইতেছে পাঁচ বৎসর। নূতন কোন সঙ্গীর নিকট পরিচয় দেওয়ার সময় বলে, আমার নাম ছবি—ছ, বয়ে হ্রস্বই, ছবি—অর্থাৎ প্রথম ভাগ ধরিয়াছে। অনেকটা, যেমন সঙ্গতি থাকিলে আপনারা নাম লিখিয়া 'এম এ, ডি-লিট্' অথবা 'বিদ্যাবিনোদ' প্রভৃতি জুড়িয়া দেন আর কি!

পীতুর বয়স চার হইতে সাতের মধ্যে ধরার কারণ এই যে, এই ছবির চেয়ে ছোট কি বড় ঠিক করিয়া উঠিতে পারি নাই।

যখন পীতু-কথিত কোন তথ্যে সংশয় প্রকাশ করি, ছবি তাহাকে যতটা সম্ভব বাড়াইয়া তোলে। ধরুন, যেন বৃষ্টির কথা উঠিল। আপনারা যে মনে করেন বাষ্পে শৈত্যস্পর্শ হইয়া বৃষ্টি সংঘটিত হয়, আসলে তাহা নহে। ওটা কতকগুলি হাতীর কীর্ত্তি; তাহারা ভগবানের আকাশের-মত-বড় পুকুর থেকে কলসী কলসী জল আনিয়া স্বর্গের রাস্তায় ছিটায়, তাহাতেই বর্ষা হয়। স্বর্গের পথ যে পিচ্ছিল—এ কথা আপনারাও স্বীকার করিবেন। জল পড়িবার পূর্ব্বে হাতীরা নিজেরা যে পড়িয়া যায় না, তাহার কারণ তাহাদের পাখা আছে। যদি বলি, হাতীর তো পাখা হয় না ছবি? ছবি উত্তর দেয়, পীতু বলেছে, সগ্‌গের হাতীদের হয়, তুমি পীতুর চেয়ে বেশি জান? পীতু আমার চেয়েও বড় মশাই, অনে—ক জানে।

এক এক সময় আবার পীতু ছোটও হইয়া যায়।

আমি বলি, পড়াশুনো করছ না ছবি, খালি রোদে রোদে দুষ্টুমি ক'রে বেড়াচ্ছ, এবার যখন ধানবাদে যাবে, দেখবে, পীতু আকাশের মত প'ড়ে ফেলেছে, তোমাদের সঙ্গে কথাও কইবে না।

ছবি তাচ্ছিল্যের সহিত বলে, ইস্, পীতুর সাধ্যি! পীতু তো আমার চেয়ে ছোট।

নিজে সোজা হইয়া দাঁড়ায়, বলে, আমি তো এত্তো বড়। তাহার

পর ডান হাতটা নামাইয়া বুকের কাছাকাছি আনিয়া মাথাটা নীচু করিয়া বলে, আর পীতু তো এত্তোটুকু। যখন ঈর্ষা প্রবলতর হয়, হাতটা আরও নামাইয়া একেবারে হাঁটুর কাছে লইয়া আসিতেও বাধে না। পীতুর বিদ্যার্জ্জনের দিক দিয়া সে যে অন্য হিসাবেও নিশ্চিন্ত, তাহাও এক এক সময় জানাইয়া দেয়; বলে, ওর মা বলে,—তোর কিচ্ছু বিদ্যে হবে না পীতু···মার কথা মিথ্যে হয় না মশাই, পীতু নিজে বলেছে।

মোট কথা, পীতুর ছোট হওয়া কি বড় হওয়া একেবারেই ছবির তৎকালীন মেজাজের উপর নির্ভর করে। তবে ছোটই হোক আর বড়ই হোক, বয়সটা চার থেকে সাত পর্য্যন্ত যাহাই হোক, পীতু যে অসামান্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

প্রথমত, পীতুর সব বিষয়ে নিজস্ব একটি মত আছে এবং সাধ্যমত সে সেটা দেশ-বিদেশে ছড়াইতে কসুর করে নাই। কোথায় ধানবাদ আর কোথায় সুদূর বিহারে আমাদের এই নগণ্য নগরী—এখানে ইতিমধ্যে তাহার থিয়োরিগুলি আসিয়া পড়িয়াছে এবং বেশ চারাইয়া গিয়াছে। যে-কোন পাড়ার যে-কোন শিশুমণ্ডলীর মধ্যে দাঁড়াইলেই পীতুর নাম এবং এক-আধটা অভিমত কানে আসিবে।

ষ্টির কথা বলাই হইয়াছে। আরও আছে। যেমন এঞ্জিনের মধ্যে যে-রাক্ষসটা বসিয়া থাকিয়া অত হাঁকডাক কারতে করিতে গাড়ি টানিয়া লইয়া যায়, তাহারই একটি ছোট্ট মেয়ে গ্রামোফোনের মধ্যে বসিয়া মিষ্ট মিষ্ট গান করে। মেয়েটি পলাতক—দুর্দ্দান্ত নিষ্ঠুর পিতার ভয়ে রেল-জগৎ ছাড়িয়া সে মানব-পরিবারে আসিয়া লুকাইয়া আছে। ধানবাদ কিংবা যে-কোন স্টেশনে গেলেই দেখা যাইবে, কতকগুলি ছোট-বড় নানা আকারের এঞ্জিন অবিশ্রান্তভাবে গর্জ্জন করিতে করিতে এদিক-ওদিক ছুটিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, এই মেয়েটিকে খুঁজিয়া বেড়ানো। তাই, কাছে অনেক লোক না-জুটিলে মেয়েটি কোন শব্দই করে না, গান গাওয়া তো দূরের কথা, আহা, রাক্ষস-বাপের লক্ষ্মী মেয়ে বেচারী! পীতু ওকে উদ্ধার করিয়া নিজের কাছে রাখিতে পারিত, কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে এঞ্জিনের দল বড় বড় আলোর চোখ

মেলিয়া খোঁজাখুঁজি করে, অনেক দূরের পাহাড়ের মাথা থেকে গাছের ডগায় ডগায়, বাড়ির জানালায় জানালায় তাহাদের দৃষ্টি আসিয়া পড়ে। বড় হইয়া পীতু একটা ব্যবস্থা করিবে। ইতিমধ্যে ঝাল মাংস খাইয়া গায়ে খুব জোর কায়রা লইতেছে। ছবি চোখ বড় বড় করিয়া বলে, খু—ব ঝালমাংস খেয়ে পীতু একটুও উস্-আস্ করে না, পার তুমি মেজকা?

কুকুর বিড়াল ছাগল ভেড়া সকলেই কথা কয়, এ তো দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে ;—মনে করেন বুঝি মাছেরা কথা কহিতে পারে না?—পারে। কয় না পেটে জল ঢুকিয়া যাইবার ভয়ে। পুকুরে ডুবিয়া একবার কথা কহিবার চেষ্টা করিয়া দেখুন না—পীতুর কথা সত্য কি না। পুকুরে যদি জল না-থাকিত তো মাছেরা খুব কথা কহিত। অবশ্য যে-পুকুরে মাছও নাই, জলও নাই, সে-সব মাছ আর সে-সব পুকুরের কথা হইতেছে না।

গোটাকতক নমুনা দেওয়া গেল, মোটের উপর সব জিনিস সম্বন্ধেই পীতুর এই রকম নিজের একটি স্বাধীন মতামত আছে। আপনাদের সঙ্গে মেলে না বলিয়াই যে সেগুলা অবহেলার যোগ্য, এমন মনে করি না। একটি সৃষ্টি—আপনারা দেখেন এক রকম চোখে, পীতু এবং পীতু-পন্থীরা দেখে অন্য রকম চোখে। কে ঠিক দেখে, কি করিয়া বলিব? এই যে মায়াবাদীরা বলে, আপনারাই ভুল দেখিতেছেন। পীতুও এক ধরনের মায়াবাদী।

আমার দৃষ্টিতে আসুক সেই মায়া যাহা পীতুর চক্ষে বুলানো আছে। আপনারা বলিবেন, ছবির শিষ্য বলিয়াই আমার এ ধরনের অভিরুচি; ছবি দিন দিন ওদের কল্পলোকের কাহিনী শুনাইয়া, দৃশ্য জগতের নিত্য-নূতন ব্যাখ্যা দিয়া আমাকে, আপনাদের চক্ষে যাহা সত্য, তাহা হইতে স্খলিত করিতেছে। সম্ভব।

কিন্তু এই সত্যচ্যুতিতে আমার কোন দুঃখ নাই। এ আমার পরম বিলাস; তাই প্রতিদিনের আপনাদের এই গতানুগতিক জীবনে যখন ক্লান্ত হইয়া পড়ি, বার-বার-পড়া একই কাহিনীর মত জীবন যখন ঠেকে নিতান্ত বিস্বাদ, অনুচ্চাবচ সমতলের মত বৈচিত্র্যহীন, ছবিকে কাছে ডাকিয়া লই, ধানবাদের পীতুর কথা পাড়ি। দেখিতে দেখিতে নীল

পাহাড়ের স্তবকে স্তবকে, অসমতল ভূমির তরঙ্গলীলায়, শিশু-শালের বনে, আর শরৎকালের স্বচ্ছ জলে ভরা সাহেব-বাঁধের দীঘিতে ধানবাদ জাগিয়া উঠে। ও-সবের মধ্যে যদি থাকেই কিছুর কঠোরতা তো এই তিন শত মাইলের দূরত্বে তাহা যায় গলিয়া মিলাইয়া। অনির্দ্দেশ-সঞ্চরমাণ দুইটি শিশু পাহাড়ে-ঘেরা এবং পাহাড়কেও অতিক্রম-করা সমস্ত জায়গাটিকে করিয়া তোলে একটি স্বপ্নপুরী।

ছবি প্রশ্ন করিয়া শুরু করে, ভারি তো জান—ভগবানের বাড়ি কোথায় বল তো মেজকাকা?

সরল প্রশ্ন। উত্তর দিই, স্বর্গে।

উত্তরটা নিশ্চয় নির্ভুল, কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে ছবি যাহা চায় তাহা নয়। মনের ভাবটা ঠিক করিয়া প্রকাশ করিবার জন্য ছবি একটু ভাবে, তাহার পর বলে, সে তো ভগবানের কলকাতার বাড়ি,—দেশের বাড়ি কোথায়?

প্রশ্নটা তার ততটা সরল থাকে না, আমি উত্তর খুঁজিতেছি, ছবি বলে, পীতুদের বাড়ির জানালা থেকে ধানবাদে যে পাহাড়টা দেখা যায় না—অনে—ক দূরে, দেখেছ তুমি?

পীতুদের বাড়ি সম্বন্ধে কোন ধারণা নাই, তাহার জানালা দিয়া কোন পাহাড় দেখা যায় কি করিয়া বলিব? বলি, না, দেখি নি তো!

ছবি গম্ভীর হইয়া বলে, কিচ্ছু দেখ নি তুমি, ধানবাদে গিয়ে তবে কি করতে? পীতুদের জানালা দিয়ে আকাশে—র মত মস্ত একটা পাহাড় দেখা যায়। ভগবানের বাড়ি তার পেছনে, মশায়।...হ্যাঁ!—হাসছ তুমি, ভারি তো জান; ভগবানের বাড়ি ঠিক তার পেছনে। সেখানে থেকে রোজ সক্কালবেলা—কোথাও যখন কেউ ওঠে না—ভগবান সূয্যি ঠাকুরকে পঠিযে দেন। আহা, অত ভোরে উঠতে কষ্ট হয় না মেজকাকা সূয্যিঠাকুরের? কি করবেন বল? ভগবানের গায়ে হাতী—র মত জোর, ভয় করে তো? দাদাকে বাবা ভোরবেলায় যখন পড়তে তুলে দেন, দেখ নি?—সেই রকম চোখ রগড়াতে রগড়াতে ওঠেন সূয্যিঠাকুব। রাঙা হয়ে যায় চোখ।

ছবি হাতটা সঞ্চারিত করিয়া বলে, তখন কোথাও কেউ ওঠে না, খালি পীতু ওঠে। পীতুর মাও ঘুমিয়ে থাকে। পীতুর মা খু—ব সুন্দর মেজকাকা, জান? যখন সুয্যিঠাকুর ওঠেন, পীতুর মার মুখ রাঙা হ'য়ে যায়; দুগ্‌গা ঠাকুরের যেমন ঝকঝকে মুখ নয়?—সেই রকম। এমন চমৎকার দেখায় মেজকা! পীতু বলেছে আমায় এক দিন দেখাবে। পীতু অনেকক্ষণ ধ'রে দেখে। চাঁদের মত মুখ পীতুর মার। এক-এক দিন জেগে উঠে জিগ্যেস করে, কি দেখছিস রে পীতু অমন ক'রে? মেজকাকা, চাঁদ কে বল তো?

বলি, সুয্যিঠাকুরের ছোট ভাই।

ছবি এমন হাততালি দিয়া হাসিয়া ওঠে যে, সত্যই নিজের মূঢ়তার জন্য অপ্রতিভ হইয়া পড়িতে হয়। ও বলে, কিছু জান না মেজকাকা তুমি, শুধু দোরের মত উঁচু হয়েছে,—চাঁদ সুয্যিঠাকুরই মশাই, রাত্তিরে চাঁদের মতন দেখায়—পীতু বলেছে।

আমি ওকে এক রকম হারাইবার জন্যই বলি, চাঁদ যে সুয্যিঠাকুর বলছ, তবে অত চকচক করে না কেন?

দুর্ব্বল প্রতিপক্ষকে হারাইবার উপযোগী অবজ্ঞার সহিত ছবি বলে, রাত্তিরে যে রোদ্দুর থাকে না মশাই, কি ক'রে করবে চকচক?...উনি পীতুর চেয়ে বেশি জানেন!...এবারে ধানবাদে গিয়ে পীতুকে বলব তোমার বুদ্ধির কথা, হেসে গড়িয়ে যাবে 'খন।

হঠাৎ হাঁ-টি ছোট এবং গোল করিয়া লইয়া চোখ দুইটা বড় করিয়া ছবি প্রশ্ন করে, মেজকাকা, তুমি ভগবানকে দেখেছ?

বলি, না, তাঁকে কি দেখা যায় ছবি?

নাঃ, দেখা যায় না! তবে পীতু কি ক'রে দেখলে মশাই?

পীতু দেখেছিল নাকি?

ছবি খুব টানিয়া জোরের সঙ্গে বলে, হ্যাঁ—! পীতুর পাঠশালের গুরুমশাই ম'রে গিছল কিনা, তার শ্রাদ্ধতে পীতুকে দই দিতে বলেছিল। আহা, কোথায় পাবে দই পীতু, মেজকাকা? গরিব মানুষ, গেরো-দেওয়া কাপড় পরে, চালের পিটুলিকে দুধ ব'লে ওর মা ওকে খাওয়ায়; কোথায়

দই পাবে মেজকাকা? পীতুর মা বললে, তোর মধুস্থদনদাদাকে ডাকিস, তিনি দেবেন দই। যে দিন শ্রাদ্ধ না মেজকাকা?—পীতু ওদের বাড়ির ওদিকটায়, একলা পলাশবনের ধারে গিয়ে—'কোথায় মধুস্থদন-দাদা, কোথায় মধুস্থদনদাদা, এস, দই দিয়ে যাও' ব'লে কাঁদতে লাগল। আহা, কাঁদবে না মেজকা?—দই না নিয়ে গেলে ওকে মারবে যে। কেঁদে কেঁদে ওর চোখের জলে একটা নদী ব'য়ে, পলাশবনের মধ্যে দিয়ে ছোট পাহাড়ের পাশ দিয়ে ভগবানের বাড়ির দিকে—যেদিক স্থয্যি ওঠে—কত দূর চ'লে গেল। অমনি একজন থুড়থুড়ে বুড়ো লাঠি ধ'রে ঠুক্‌ঠুক্ করতে করতে, হাতে ক'রে এক ভাঁড় দই নিয়ে এসে বললে, এই নাও দই, এর জন্যে কি এত কাঁদে?—এ বুড়ো কে বল তো মেজকা?

বুঝিতেই পারিতেছেন গল্পটি একটি প্রাচীন উপাখ্যান। কল্পনাপ্রবণ পীতু ওটিকে নিজের জীবনে আত্মসাৎ করিয়াছে,—গেরো-দেওয়া কাপড় আর চালের পিটুলির দুধ-সমেত সমস্ত গল্পটি তাহার তরুণ মনে বড় লাগিয়াছে। অবশ্য, আবশ্যক-মত একটু পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়াছে। মূল উপাখ্যানে বোধ হয় গুরুমহাশয়ের মা'য়ের শ্রাদ্ধ ছিল, নিজের গল্পে পীতু খোদ গুরুমহাশয়েরই অন্ত্যেষ্টি ঘটাইয়াছে। এটা পীতুর মরজি বলুন, সাধই বলুন বা স্থবিধাই বলুন।

আমি প্রশ্ন করি, বুড়ো—ভগবান বুঝি?

ছবি সপ্রশংস দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া বলে, ঠিক বলেছে রে! তুমি বুঝতে পার মেজকাকা, খুব বোকা নয় তো!

আমি বলি, কিন্তু এই তুমি বল—ভগবান্ আকাশের মত বড়, আর রেলগাড়ির চেয়েও দৌড়ুতে পারেন?

সে তো যখন রাক্ষসের সঙ্গে কুস্তি করেন মশাই। দই আনবার সময় অত জোর দিয়ে কি হবে? যদি দই না আনলে ওরা পীতুকে মারত তো দেখতে ভগবানের জোর!—খপ্ করিয়া আমার হাতের কড়ে-আঙুলটা ধরিয়া বলিল, ভগবানের এই আঙুল দিয়ে তাদের সব্বার গায়ে একটা পাহাড় ঠেলে দিতেন। হুঁ, চালাকি নয় মশাই!

ভীত হইয়া বলি, ভাগ্যিস তা হ'লে দই এনে দিয়েছিল বুড়ো, নইলে—

ছবি তাড়াতাড়ি উঠিয়া আমার মুখ চাপিয়া ধরে, শঙ্কিত কণ্ঠে নিম্নস্বরে কহে, জিব কামড়াও মেজকাকা, শীগ্‌গির, ভগবানকে বুড়ো বললে! এক্ষুণি এ-রকম শাপ দেবেন—

চাপা ঠোঁটে বলি, হাতটা সরাও, বের করি জিবটা কামড়াবার জন্যে। বড্ড রাগ করেন বুঝি বুড়ো বললে?

হ্যাঁ! পীতু কখ্‌খনও বুড়ো বলে না। তাই কত ভালবাসেন। বাড়ি গেলে কত আদর করেন, কত্তো খাবার দেন—

বলি, খেতে দেন? তা হ'লে তো একবার গেলে হ'ত ছবু! পীতু জানে পথটা?

ওমা, জানে না?—বলিয়া ছবি গুছাইয়া বসে। রাফেলের আঁকা শিশু-পরীর মত করতলে চিবুক রাখিয়া, আমার মুখের দিকে চোখ তুলিয়া গল্প আরম্ভ করিয়া দেয়। চোখ কোন্ এক অজানা লোকের আলোকে ঝলমল করিতে থাকে।···

পীতু জানে বইকি, ছবিও জানে। পীতুতে ছবিতে মিলিয়া কতবার গিয়াছে। পীতু একবার একলা গিয়াছিল। ওর মার কাছে যেদিন ধ্রুবের গল্প শুনিয়াছিল না?—সেই দিন, রাত্রিবেলা। সেদিন সকাল-বেলা ঠিক যেখান দিয়া সূর্য্য উঠে, রাত্রে ঠিক সেইখান দিয়া সূর্য্যটা চাঁদ হইয়া বাহির হইল। শোবার সময় পীতুর মার মুখে অন্ধকার ছিল, গল্প বলিতে বলিতে খোলা জানালা দিয়া আলো ফুটিয়া উঠিল। কপালে কাচপোকার টিপ আকাশে—র মত নীল হইয়া উঠিল। চাঁদের চেয়েও পীতুর মার মুখ সুন্দর, মশাই! চাঁদের কপালে মায়ের মত রাঙা পাড় আর সিঁদুর নাই, পান খাইয়া চাঁদের ঠোঁট মায়ের মত রাঙা হয় না।··· পীতু মাকে বড় ভালবাসে—ভগবানের চেয়েও। গল্প শুনিতে শুনিতে সেদিন পীতু কাঁদিয়াছিল। আহা, ধ্রুবের মায়ের মতন পীতুর মায়ের যদি মোটে একখানি কাপড় হয়, আর ওর বাবা যদি ঝড়ে বৃষ্টিতে বনে বনে ঘুরিয়া হঠাৎ রাত্রে আসিয়া পড়ে! তাহা হইলে তোমাকে তাই থেকে আধখানা ছিঁড়িয়া দিতে হইবে! তাই গল্প শুনিতে শুনিতে পীতু খুব

কাঁদিয়াছিল। ওর মাকে জানিতে দেয় নাই—আস্তে আস্তে চোখের জল গড়াইয়া বালিস ভিজিয়া গিয়াছিল। পীতু খুব সেয়ানা ছেলে মশাই! পীতুর বাবা বকিলে ওর মা যেমন চুপ করিয়া কাঁদিতে পারে না?—পীতুও সেই রকম ভাবে কাঁদিতে পারে।…ছবি বলিল, খু—ব আস্তে আস্তে, খালি ভগবান সে-রকম কান্না শুনতে পারেন। মেজকা, পার তুমি কাঁদতে সে-রকম ক'রে?

পীতু গল্প শুনিতে শুনিতে এবং কাঁদিতে কাঁদিতে ঠিক করিল, মা ঘুমাইলে সে ধ্রুবের মত ঘুমন্ত মায়ের পাশ হইতে আস্তে আস্তে উঠিয়া ভগবানের কাছে চলিয়া যাইবে এবং গিয়া বলিবে—মায়ের যেন কখনও মোটে একখানি কাপড় না হয়, আর বনে বনে ঘুরিয়া যদি রাত্রে হঠাৎ আসিয়া পড়ে, ভগবান যেন দুয়ারের পাশটিতে চুপি চুপি খাবার রাখিয়া যান। কাহারও কাছে চাহিতে গেলে মার বড্ড লজ্জা করে, চোখে জল আসে; সে-সময় মাকে দেখিলে বড় কষ্ট হয়। ভগবান তো পীতুর মাকে জানেন না, পীতু গিয়া সব বলিবে।

সেদিন রাত্রে মা যখন গল্প বলিতে বলিতে ঘুমাইয়া পড়িল, ভগবান আসিয়া পীতুর চোখে তাঁহার ঘুমের মত ঠাণ্ডা আর নরম হাত বুলাইয়া দিলেন। তাহার পর পীতু উঠিল। ধ্রুবের মায়ের মত পীতুর মা পীতুকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, সেই গেরোটা জাঁতি দিয়া কাটিল, তাহার পর ভগবানের বাড়ির দিকে চলিল। তাহার আগের দিন মধুসূদন-দাদাকে ডাকিয়া ডাকিয়া চোখের জলের যে নদী হইয়া গিয়াছিল—না? পীতু তাহার ধারে দাঁড়াইয়া খুব কাঁদিয়া কাঁদিয়া মধুসূদনদাদাকে আবার ডাকিতে লাগিল। তাহার চোখের জলের নদী বাড়িতে বাড়িতে আকাশে-র মত বড় হইয়া গেল এবং একটা 'সোনার নৌকা আসিয়া ধারে দাঁড়াইল। ছবি মামার বাড়িতে যে নৌকা চড়িয়া গিয়াছিল, তাহার চেয়ে অনে—ক ভাল নৌকা, অনে—ক বড় নদী, অনে—ক বেশি হাওয়া; নৌকার সোনার পাল হাওয়ায় ফুলিয়া গিয়াছে।

যাইতে যাইতে কত দূর চলিয়া গেল পীতু। আমার সঙ্গে কিংবা একলা চুরি করিয়া যতদূর বেড়াইতে যায়, তাহার চেয়ে আরও অনেক দূর।

অত আলো ছিল যে? ভগবানের বাড়ির যত কাছে যাইতে লাগিল, আলো ততই আরও বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। ধানবাদ ইষ্টিশানের চেয়ে ঢের বেশি আলো। পীতুর এক-একবার ভয় করিতেছিল। পীতুর একটুও ভয় করে না, মশাই! ঝাল মাংস খাইয়া ওর গায়ে খুব জোর হইয়াছে। ওর মা যদি কাছে থাকে, আর রাক্ষস যদি দুঃখিনী সীতার মতন ওর মাকে ধরিতে আসে তো এ—ক চাপড়ে রাক্ষসকে মারিয়া ফেলিতে পারে। কিন্তু ওর মা তো কাছে ছিল না, তাই পীতুর ভয় করিতেছিল না···পীতুর একটুও ভয় করে না···মায়ের জন্য শুধু মন কেমন করিতেছিল। তখন ভগবান ওর নৌকা দুলাইয়া দুলাইয়া ওকে ঘুম পাড়াইয়া দিলেন। যখন ঘুম ভাঙিল না?—পীতু দেখিল পাহাড়ের ওদিকে, ভগবানের আরও আলোর দেশে পীতু পৌঁছিয়া গিয়াছে। কত বড় দেশ! কত বড সোনার বাডি! আকাশে—র মত উঁচু। ঝরিয়ার রাজার বাড়িতে যেমন ঝাড়-লালঠেম টাঙানো আছে না?—ছবি দেখে নাই, কিন্তু পীতু একবার পূজার সময় দেখিয়াছিল—তাহার চেয়েও অনেক ভাল ভাল অনে—ক লালঠেম টাঙানো···

পীতুর অভিজ্ঞতায় গরবিনী ছবি আমায় পরীক্ষার ভঙ্গিতে প্রশ্ন করিল, কিসের আলো বল তো মেজকাকা?

বোধ হয় আমা হেন অনভিজ্ঞের পক্ষে উত্তরটা নিতান্তই অসম্ভব ভাবিয়া সঙ্গে সঙ্গে নিজেই বলিল, তারার ঝাড়-লালঠেম!···হ্যাঁ মশাই, তুমি তো ভারি জান! পীতুর মা বলেছে ভগবানের বাড়িতে খালি তারার ঝাড-লালঠেম টাঙানো আছে!—তারার লালঠেম না হ'লে পীতুর নৌকায় অত আলো করেছিল কি ক'রে?—বল না এবার মশাই!

এমন অকাট্য প্রমাণের সামনে আমি আর কিছু বলিতে পারিলাম না।

ছবির বর্ণনা চলিল—

ভগবান জানিতেন পীতু আসিবে। তাহা না হইলে নৌকা কে পাঠাইয়া দিয়াছিল? নৌকা ঘাটে লাগিলে ভগবান নামিয়া আসিয়া পীতুকে কোলে করিয়া লইলেন। চুমা খাইলেন। কি সুন্দর যে দেখাইতেছিল

ভগবানকে!·· ভগবান যখন ভালবাসেন তখন আর প্রকাণ্ড থাকেন না, তাঁহাকে দেখিলে ভয় হয় না। তখন তিনি খুব সুন্দর হইয়া যান। তখন, মা পূজার সময় যে-মালা পরান, ভগবানের গলায় সেই মালা দুলিতে থাকে। মায়ের দেওয়া মালাসুদ্ধ তাঁকে খুব আপনার লোক বলিয়া মনে হয়। একটুও ভয় করে না। পীতুর কিন্তু লজ্জা করিতেছিল। বিকালের গাড়িতে পীতুর বাবা এক-এক দিন আসিয়া পীতুকে কোলে লইয়া যখন চুমা খায় তখন যেমন লজ্জা করে, সেই রকম লজ্জা।

পীতু তো বড় হইয়াছে? ওদের ছোটখুকীর মত তো ছোট নয়,—লজ্জা করিবে না?

ছবি আবার প্রশ্ন করিল, ভগবান পীতুকে কেন কোলে ক'রে নিলেন বল তো মেজকাকা?

বলিলাম, ভালবাসতেন ব'লে।

নির্ব্বুদ্ধির ক্রমাগত ভুল উত্তরে লোকে যেমন জ্বালাতন হইয়া যায়, সেইভাবে ছবি ঈষৎ ঝংকার করিয়া উঠিল, আর কাদা লেগে যাবে না বুঝি পীতুর পায়ে? কিছু যদি জান তুমি!

আমি প্রতিপ্রশ্ন করিলাম, আর ভগবানের পায়ে কাদা লেগে গেল না? তিনি বুঝি বুট জুতো প'রে ছিলেন?

ছবির হিউমারের দৃষ্টিটা বেশ প্রখর, হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার পর আবার গম্ভীর হইয়া, বিচক্ষণের মত মাথা দোলাইয়া একটু ব্যঙ্গহাস্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, ভগবানের পায়ে বুঝি কাদা লাগে? কি বুদ্ধি তোমার মেজকাকা!

বলিলাম, লাগে না বুঝি?

ছবি মাথা নাড়িয়া বলিল, না, না,—একটুও না।

একটু চিন্তা করিল, তাহার পর বলিল, ভগবানের পায়ে কাদাও লাগে না, হাতে কালি লাগে না, সাবান মাখলে চোখ জ্বালা করে না, বিষ্টিতে ভিজলে সর্দ্দি করে না, ওরা সব যে ভগবানের চাকর, মশাই; পীতুর মা বলেছে! আর জান মেজকা?

প্রশ্ন করিলাম, কি?

ওল খেলে ভগবানের মুখ কুট্‌কুট করে না, একটুও তেঁতুল খেতে হয় না।

ভগবানের এই গূঢ় শক্তির আবিষ্ক্রিয়াটা নিশ্চয় ছবির নিজের, কেন-না, আজ সকালেই ওল খাইয়া তাহার নিজের নির্য্যাতন গিয়াছে। আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম, তাই নাকি? খুব সুবিধে তো ভগবানের। আচ্ছা, তারপর ভগবান কি করলেন বল।

ভগবানের বাড়িতে অনেক চাকরানী আছে। বুঝি মনে করিয়াছেন, তাহারা আমাদের বাড়ির 'বিদেশিয়া-কে-মা'-এর মত লম্বা, কালো এবং ময়লা কাপড় পরা? না, তাহারা সব খুব সুন্দর; পীতুর মায়ের মুখে চাঁদের আলো পড়িলে যেমন সুন্দর দেখায়, সেই রকম। তাহাদের সাদা পায়রার মত বড় বড় ডানা আছে; পীতুদের ঘরে টাঙানো মেমসাহেবদের ছবিতে যেমন আছে না, সেই রকম। এক-এক দিন সকালবেলা পাহাড়ের ওদিকে ভগবানের বাড়ির উপর যখন ছোট ছোট রাঙা রাঙা মেঘ করে, এরা মেঘের সিঁড়ি দিয়া, আলোর রাস্তা ধরিয়া, গান করিতে করিতে আকাশে উড়িয়া যায়। পীতু ভোরবেলা উঠিয়া যখন জানালা দিয়া মেঘের দিকে চাহিয়া থাকে, ঘুমন্ত মায়ের আর খুকীর মুখে, আর ডানাওয়ালা মেমসাহেবদের ছবিতে আলো আসিয়া পড়ে, তখন অনেকবার ইহাদের দেখিয়াছে। পীতুর মা বলেন, এদের পরী বলা হয়, পীতুদের খুকী মায়ের কোলে আসিবার আগে পরী ছিল।...পরীরা নরম ডানার মধ্যে করিয়া পীতুকে লইয়া গেল...বেশ লাগে, মনে হয় ঠিক যেন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া হইতেছে-আর মা আঁচলে করিয়া পীতুকে ঘিরিয়া আছে। পীতুর মাও নিশ্চয় আগে পরী ছিল, পীতুকে এমনি করিয়া ডানায় ঢাকিত, এখন যেমন রাঙা পাড়ের আঁচলে করিয়া ঢাকে।

তাহার পর সোনার জলের ঝরণায় নাওয়া। পীতুর মা যে বলে সেখানকার জলে স্নান করিলে সমস্ত পাপ ধুইয়া গিয়া আলোর শরীর হয়, তাহা একটুও মিথ্যা নয়। দেখিতে দেখিতে পীতুও পরীদের মত হইয়া গেল। মেমদের ছবিতে ডানা-বসানো খোকা সব হাতজোড় করিয়া আছে না?—সেই রকম। তখন কিন্তু তাহার মায়ের জন্য বড়

মন কেমন করিয়া উঠিল,—মা যদি চিনিতে না পারে! যদি মনে করে, পীতু আসলে সত্যই তাহাদের ঘরের মেমসাহেবদের ছবির সাদা-পাখাওয়ালা ছোট ছেলে; মিছামিছি পীতু হইয়া নামিয়া আসিয়াছে! তাহা হইলে কি হইবে?

না, পীতুর এসব ভাল লাগে না; ছেঁড়া কাপড় পরা ধ্রুবের মত সে মায়ের কছেই থাকিবে। ভগবানের চেয়ে মা অনেক ভাল। আর পীতু না থাকিলে ভগবান তো বাঁচিয়া থাকেন, মা কিন্তু কোন মতেই বাঁচিবে না যে!

ভগবান সবার মনের কথা বুঝিতে পারেন, মশাই। পীতুকে কোলে লইয়া চুমা খাইয়া তাহার মনের ভয় সরাইয়া দিলেন। পীতু মার কথা ভুলিয়া গেল। কত খাবার দিলেন। গোবিন্ হালুয়াইয়ের দোকানের চেয়ে আরও অনেক মিষ্টি খাবার। তাহার পর আরও কত কি দিলেন;—পীতুর বাবা, পূজার সময় টাকা ছিল না বলিয়া যে বড় জাপানী ডলটা কিনিয়া দিতে পারেন নাই, সেইটা; নেমন্তন্নর দিন ওদের বাড়ির অজু যেমন জরি-বসানো জামা পরিয়াছিল, সেই রকম জামা; ইষ্টিশানের সাহেবদের বাগানের পোষা হাঁস;—পীতুর মনের কথা নিজে নিজেই জানিয়া সমস্ত দিলেন পীতুকে। আরও কত কি দিলেন, কত জায়গায় লইয়া গেলেন—কত রাঙা রাস্তার ওপর দিয়া—লতার ফুলে ঢাকা কত বাড়ির কাছ দিয়া—কত পাহাড়ের গা বাহিয়া, সাঁওতালরা যেমন করিয়া যায়—কত রাঙা হলুদে বেগুনে মেঘে পা ফেলিয়া—সাতরঙা রামধনুর নীচে দিয়া কত জায়গায় লইয়া গেলেন। ভগবানের গায়ের আলোয় পরীদের গায়ের রঙ কত সুন্দর হইয়া উঠিল···

বর্ণনায় হারিয়া ছবি বলিল, সে তুমি বুঝবে না মেজকাকা, কখনও দেখ নি কিনা। পীতুর মা বলে, বড়রা সে পায় না দেখতে। পীতুদের বাড়ির জানলা দিয়ে যে পাহাড় দেখা যায় তার ওধারে আছে সব। সেখানে যখন পাহাড়ের মাথায় রামধনু ওঠে, কি মেঘের মধ্যে মধ্যে চাঁদের রূপোর নৌকো ঢেউ ভেঙে ভেঙে চলে, সে সময় পীতু দেখতে পায় ভগবানকে, পরীদের,—কত বাজনা-বাদ্যি ক'রে আগে-পিছে

ভগবানের লোকেরা যাচ্ছে। পাতু সব দেখে; আমায়ও কতবার দেখিয়েছে মশাই, ওর মাকেও দেখিয়েছে। কিন্তু পীতুর মা দেখতে পায় না; পীতুর মা বলে—কেউ বড়রা দেখতে পায় না; ভগবান বড়দের ওপর রাগ করেন।

ঐ সব রাস্তা দিয়া ভগবানের স্বর্গের বাড়িতে যাওয়া যায়। যাইতে যাইতে পীতুরা কত দূরে গেল,—মেঘের রাজ্য অতিক্রম করিয়া, রামধনুর ফটক পার হইয়া, কত উঁচুতে—রাত্রে যেখানে তারার জানালা খুলিয়া দিয়া আকাশের ওদিক থেকে দেববধূরা দলে দলে পৃথিবীর দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকে—সেইখানে। সে-জায়গাটায় একটু ভয়-ভয় করে, কেন-না, সেটা রাত্রির অন্ধকারের দেশ। এদিককার আলো কমিয়া কমিয়া সেইখানটায় শেষ হইয়াছে, আর উপর থেকে স্বর্গের আলোও পৌছায় নাই। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় পৃথিবীর হাজার হাজার দুষ্টু ছেলে যখন খেলাধূলা শেষ করিয়া আসিয়া মায়েদের, দিদিদের ঘাড়ে পিঠে চড়িয়া দুরন্তপনা করে, সেই দেশ থেকে তখন অন্ধকার আস্তে আস্তে ভগবানের দেশের উপরও কালো ডানার ছায়া ফেলিয়া নামিয়া আসে।...সেখানে পৌছিয়া পীতুর মায়ের জন্য বড্ড মন কেমন করিয়া উঠিল। চোখ নামাইয়া পীতু দেখিতে পাইল, নীচে অনেক—অনেক অনে—ক দূরে, তাহাদের ধানবাদের ছোট্ট ঘরটিতে পীতুর মা খুকীকে সঙ্গে লইয়া ঘুমাইয়া আছে; ঘুমাইয়া থাকিলে মায়ের মুখে যে-হাসিটি লাগিয়া থাকে সেই হাসিটি এখান থেকে দেখা যায়। মায়ের শাড়ির রাঙা পাড়, মায়ের পায়ের রাঙা আলতার উপর দিয়া, গায়ের উপর দিয়া মায়ের চুড়ি-পরা হাতের সঙ্গে খুকীকে জড়াইয়া, বুকের উপর দিয়া, কালো চুলের সঙ্গে মিশিয়া গেছে; ভোরের মেঘে যেন সোনার পাড় বসানো থাকে না? —ঠিক সেই রকম। ঘরের এদিকটায় চাঁদের আলো, কিন্তু ও-পাশটায় —পীতু যেখানটায় নাই, সেইখানটায় চাঁদের আলো নাই। পীতু সমস্ত রাত মায়ের হাতটি বুকে লইয়া শোয়, যেখানে তাহার বুক ছিল হাতটি এখনও সেইখানে পড়িয়া আছে। পীতুর মা না-জানিয়া মনে করিতেছে তাহার হাত এখনও পাতুর গায়েই আছে, মনে করিতেছে ওটা বালিস

নয়, পীতুর নরম বুক। তাই তাহার মুখে হাসি। পীতুকে বড্ড ভাল-বাসিত কিনা,—ভগবানের চেয়েও।

পীতুর ভয়ানক মন কেমন করিয়া উঠিল। অন্ধকারের দেশ পার হইয়া আবার যদি ফিরিয়া আসিতে না পারে! যদি ভগবানের স্বর্গের বাড়ি এত সুন্দর হয় যে, মায়ের কথা একেবারেই মনে না পড়ে!—ক·কাতায় একবার রতনদিদির বাড়িতে গিয়া যেমন একেবারে মনে পড়ে নাই!···মায়ের ঘুমন্ত মুখে এখনও হাসি দেখা যাইতেছে, মা মনে করিতেছে পীতুর বুকে হাতটি রহিয়াছে, তাই। ঘুম ভাঙ্গিলেই মা যখন দেখিবে পীতু নাই, যখন বুঝিবে পীতু তাহার অত করিয়া বাঁধা আঁচলের গেরো কাটিয়া, তাহার চোখের জলের নদী দিয়া, ভগবানের পাহাড়-ঘেরা বাড়ি পার হইয়া অন্ধকারের দেশ পার হইয়া ভগবানের স্বর্গের বাড়ি চলিয়া গিয়াছে—তখন!

ভয়ানক মন কেমন করিয়া উঠিল পীতুর। ভগবান তো মনের কথা টের পান? টের পাইয়া আগেকার মত ভুলাইয়া দেওয়ার অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পীতু আর কিছুতেই ভুলিল না,—পীতুর বাবা একবার বাড়ি হইতে যাইবার সময় পীতুকে যেমন কোন মতেই ভুলাইতে পারে নাই, সেই রকম। পরীরা কত বুঝাইল, আদর করিল, বলিল, অন্ধকারের ওপারে গিয়া তাহাকে ঝরিয়ার রাজার মত বাড়ি দিবে, গাড়ি দিবে, অজুর চেয়েও ভাল ভাল জামা দিবে; পীতুর কিন্তু সব জিনিসের চেয়ে মাকে ভাল লাগিতেছিল। তখন ভগবান আরও চেষ্টা করিলেন, আরও লোভ দেখাইলেন; বলিলেন—ধ্রুবকে যেমন ধ্রুবলোক করিয়া দিয়াছিলেন—আকাশের অনেক দূরে এখনও দেখা যায়—পীতুকেও সেই রকম আকাশের চেয়েও আরও উঁচুতে ধ্রুবলোক করিয়া দিবেন। আরও কত কথা সব···

পীতুর একবার মনে হইল, যাই; মার যদি কষ্ট হয়?—খুকুকে কোলে লইয়া ভুলিবে। ভগবান এমন করিলেন যে, পীতু একটুখানি ভুলিয়া গেল মাকে, এ—কটুখানি,—ঘুমাইবার সময় একটুখানি যেমন ভুলিয়া যায় না লোকে?—সেই রকম। ঠিক সেই সময় হঠাৎ সে রাস্তার পাতলা অন্ধকার ভেদ করিয়া দেখিতে পাইল—অনেক নীচে, ধানবাদের

ঘরটিতে তাহার মা পাশ ফিরিতেই কাটা আঁচলটা কাপড়ের মধ্যে থেকে বাহির হইয়া পীতু যেখানটায় শুইয়া ছিল সেইখানটায় লুটাইয়া পড়িল। জাঁতি দিয়া কাটার দরুন পাড় হইতে সুতা বাহির হইয়া যেন রক্তের মত দেখাইতেছে।...মা যদি এখনই উঠিয়া পড়ে!...মুখের হাসি এখনও মুখে লাগিয়া আছে।

পীতু ভগবানের বুকে ছট্‌ফট করিয়া উঠিল। না, সে যাইবে;—তাহার চাই না কিছু—চাই না ধ্রুবলোক। সে মায়ের কাছে ফিরিয়া যাইবে। ভগবান বড় দুষ্ট, ভগবানের চেয়ে মা ঢের ভাল। মা তো রোজ ভগবানকে পূজা করেন, সন্ধ্যার সময় তুলসী-তলায় প্রদীপ দেন, সকালবেলায় স্নান করিয়া মাটির ভগবান গড়িয়া ফুলচন্দন চড়ান। মায়েরই দেওয়া মালা তো এখনও ভগবানের গলায়; তবুও কেন পীতুকে মায়ের কাছে যাইতে দিতেছেন না? পীতু যাইবেই যাইবে। ভগবান যদি না ছাড়েন, ধ্রুব যেমন আগুনের মধ্য থেকে, বাঘেদের মধ্য থেকে ভগবানের তপস্যা করিয়াছিল, পীতুও ধ্রুবলোকে গিয়া মার জন্য সেই রকম তপস্যা করিয়া আবার সেখান থেকে মায়ের কাছে নামিয়া আসিবে। না, পীতুকে ভগবান জানেন না,—পীতু মাকে বড্ড ভালবাসে—ভগবানের চেয়েও—পরীদের চেয়েও—স্বর্গের চেয়েও—ধ্রুবলোকের চেয়েও...

বলিলাম, ভগবান চ'টে গেলেন না ছবি?

ছবি একটি স্বপ্নের মধ্যে ছিল যেন, মুখে একটি শান্ত করুণা ফুটিয়া উঠিয়াছে। একটু ভাবুকতার সঙ্গে, একটু ক্ষমার সঙ্গে, একটু আর একটা কি অনির্ব্বচনীয়তার সঙ্গে স্মিত হাস্যের সহিত ধীর কণ্ঠে বলিল, না মেজকাকা, ভগবান যে বড্ড ভাল। পীতুকেও যেমন ভালবাসেন, ওর মাকেও সেই রকম ভালবাসেন কিনা! আর ওপরে গেলেন না। আর অন্ধকারও রইল না। পীতুকে কত চুমু খেলেন, কত আদর ক'রে কত সব কথা বললেন, পরীরাও কত চুমু খেলে, কত গালে হাত বুলিয়ে বললে, তোমার মায়ের কাছেই এবার থেকে তোমার জন্যে ভগবান থাকবেন পীতু; সেইখানেই তোমার জন্যে ধ্রুবলোক গ'ড়ে দেবেন।... তারপর আবার কত আলোর মধ্যে দিয়ে, কত বাজনা-বাদ্যির মধ্যে দিয়ে

চাঁদের নৌকো ক'রে নদী বেয়ে পীতুকে নামিয়ে নিয়ে এলেন।...হ্যাঁ মশাই, নিয়ে এলেন নামিয়ে, না-হ'লে পীতু যখন উঠল, কি ক'রে দেখলে ঠিক যেমন ক'রে মায়ের হাত বুকে নিয়ে শুয়ে ছিল, সেই রকম ক'রেই রয়েছে ?...আর মেজকাকা, কি আশ্চর্য্য জান ?

প্রশ্ন করলাম, কি ?

আঁচল কেটে পীতু চ'লে গিয়েছিল না ?—উঠে দেখলে একটুও কাটা নেই। ভগবান যদি আসেন নি তো কে জুড়ে দিয়ে গেল মেজকাকা? তুমি পার ? আর পীতু দেখলেও যে নিজে। যখন চোখ খুললে না ?—দেখলে, ভগবানের পাহাড়ের বাড়ির ওপরে নতুন সূয্যির আলো কেঁপে কেঁপে উঠছে—কত গান হচ্ছে—মন্দিরে ঘণ্টা বাজছে, আর রাঙা মেঘ দিয়ে গড়া সোনার সিঁড়ি বেয়ে ভগবান, তার পরীরা আর সোনার পোশাক প'রে বাজনা বাজিয়ে যারা সঙ্গে এসেছিল—সব ফিরে যাচ্ছে... হ্যাঁ, দেখলে পীতু মেজকাকা; তখন আর একটু মনও কেমন করেছিল—মনে হচ্ছিল, ভগবান এত ভাল, এত লক্ষ্মী ; কিন্তু পরীরা যে বললে পীতুর মায়ের কাছে থাকবেন সর্ব্বদা—যদি ভুলে গিয়ে না-থাকেন কোন দিন !...

বৈরিগীর ভিটেয়

ভীষণ শীত! বাহিরে বৃষ্টি আর বাতাসে মাতামাতি চলিতেছে। তারাপদ বলিয়া দিয়াছিল, চাকর একটা তোলা উনানে এক উনান আগুন রাখিয়া গেল; সকলে নিজের নিজের চেয়ার টানিয়া লইয়া আগুনটা ঘেরিয়া ফেলিল। যে-প্রসঙ্গটা শুরু হইয়াছিল তাহারই জেরটা ধরিয়া রাখিয়া সুধেন বলিল, অশ্বিনী, বিশ্বাস না কর, নেই-নেই; তুমি কিন্তু এত রাত্রে ও-পথ দিয়ে আর বাড়ি যেও না, তারাপদ যেমন বলছে এইখানেই খেয়ে-দেয়ে রাতটা কাটিয়ে দাও। ভূত না থাক্, এই রকম ভয়ঙ্কর রাত্রের একটা নিজস্ব স্পিরিট আছে, অবস্থাগতিকে সেইটেই মানুষের প্রাণঘাতী হতে পারে।

অম্বিকা বলিল, নটা থেকে আবার অমাবস্যা পড়েছে।

অশ্বিনী উত্তর করিল, যাক, মানুষের স্পিরিট থেকে রাত্রির স্পিরিটে নেমে এসেছ; এইবার বলবে রাস্তার স্পিরিট, পুকুরের স্পিরিট!—আর এতই যদি চারি দিকে স্পিরিটের হুড়োহুড়ি তো অক্ষয় তো থাকবেই আমাব সঙ্গে···

অক্ষয় তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, মাফ করতে হচ্ছে, শর্ম্মা আর আজ এ-ঘর ছেড়ে বেরুচ্ছে না। এই রাত্রে দু-মাইল পথ ভেঙে যাওয়াব শখ আমার নেই, তাও আবার সিদ্ধেশ্বরীর শ্মশানঘাটের কাছ দিয়ে! তোমার মত আমার নতুন বিয়ে নয় যে, জবাবদিহি দিতে হবে; ববং অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে বিয়ের কথাটা এত দিনে যে উঠেছে, তাব জন্যে আমায় শত্তুরমুখে ছাই দিয়ে বেঁচে থাকতে হবে।

স্থানটা এদের দৈনিক তাসের আড্ডা—তারাপদর বাসা। মিল্-এরিয়াটা এইখানে প্রায় শেষ হইয়াছে। এর পরেই একটা প্রকাণ্ড মাঠ, তাহার একটা দিক গঙ্গা পর্য্যন্ত প্রসারিত। মুক্ত মাঠের উপর দিয়া

এলোমেলো হাওয়া আসিয়া চারিদিক দিয়া ঘরটায় প্রবেশের চেষ্টা করিতেছে, দুয়ার-জানালার ছিদ্রপথে কখনও কান্না, কখনও অনুযোগ, হাওয়ার উগ্রতায় কখনও বা ভীত আর্ত্তনাদের মত শব্দ হইতেছে। একবার দুয়ারের ছিটকিনিটা পর্য্যন্ত এমন ঝন্ঝনাইয়া দিল যে, সবাইকেই ফিরিয়া চাহিতে হইল; অম্বিকা একটু নিষ্প্রভ হাস্যের সহিত বলিল, সত্যিই ভেতরে আসতে চাইছেন নাকি ওঁদের কেউ?

অক্ষয় বলিল, যদি চানই তো কিছু বিচিত্র নয়। এই যে প্রবল ধাক্কাটা লাগল দোরের গায়ে, এটা এই পাগলা হাওয়ার হওয়াই বেশি সম্ভাবনা,—পনরো আনা; কিন্তু বাকি এক আনার মধ্যে আর একটা মস্ত সম্ভাবনা আছে। সেটাকে শুধু গঞ্জিকা ব'লে উড়িয়ে দিলে চলবে না, কেন-না, তাতে দর্শনশাস্ত্রের সীলমোহর আছে। ব্যাপারটা এই—তোমরা জান দর্শনের একটা থিয়োরি হচ্ছে যে, আসলে সময়ের বিভাগ অর্থাৎ ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ব'লে কোন বস্তু নেই, ও ধারণাটা নিতান্ত আপেক্ষিক। প্রকৃত তথ্য এই যে—There is one enternal 'Now',—অর্থাৎ কাল সর্ব্বব্যাপী একটি শাশ্বত সত্তা। এখন, তাই যদি ঠিক হয় তো জগতের যা কিছু ঘটনা ঘটেছে, ঘটছে আর ঘটবে ব'লে আমরা মনে করি, সবই একই সময়ে উপস্থিত রয়েছে—শুধু time and space অর্থাৎ স্থান আর কালের বিভিন্ন স্তরে। তার মানে ঠিক এই স্থানে—আমরা যাকে অতীত বলি, সেই সময় যদি কোন এক ঘটনা ঘ'টে থাকে তো এখনও তা ঘটছে—শুধু আমাদের জ্ঞানের অন্তরালে। জ্ঞানের অন্তরালে এই জন্যে যে, যে-স্তরে তা ঘটছে সেই স্তরে আমরা এই স্থূল চেতনা নিয়ে পৌছুতে পারি না। অনেক সময় পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুকূল হ'লে, বা অন্য কোন অজ্ঞাত কারণে, আমরা হঠাৎ সেই ঘটনার অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারি। তার মানে…

সুধেন বলিল, দোহাই তোমার, আর 'তার মানে' নয়, টীকা ক্রমেই মূলের চেয়ে জটিল হয়ে উঠছে। বরং প্রথমটা কিছু বুঝেছিলাম, এখন আর…

অক্ষয় বলিল, বুঝিয়ে দিচ্ছি খুব স্থূল ভাবে,—ধর, কোন অতীতে

ঠিক এই জায়গাতে একটা বাড়ি ছিল কারুর—এমনই এক দুর্যোগের রাত্রি,—সেদিনের সেই গৃহকর্ত্তা বা বাড়ির অন্য কেউ—বা ধর, কোন অতিথি বহু দূর থেকে এসে এই বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়াল—শীতে, বৃষ্টিতে, পথের শ্রান্তিতে একেবারে বিপর্য্যস্ত। দ্রুত ঘা পড়ল বন্ধ দরজার ওপর; হয়তো কাপড়ের আড়ালে প্রদীপ নিয়ে গৃহিণী কিংবা বাড়ির অন্য কোন বধূ গিয়ে দরজা খুলে দিলে। কিংবা হয়তো আগন্তুক বাড়ির কেউ নয়—কোন পথিক মাত্র আশ্রয়ভিক্ষায় এসেছে। কপাটে আঘাত হওয়ায় সন্দিগ্ধ কণ্ঠে ভেতর থেকে প্রশ্ন হ'ল—

—কে ধাক্কা দেয়?···

তারাপদ, সুধেন, অক্ষয়, অম্বিকা, রমেন হঠাৎ চমকিয়া পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল, অশ্বিনীও যেন বাদ গেল না। অক্ষয়ের কথার সঙ্গে সঙ্গেই যেন বাহিরে একটা তীক্ষ্ণ কণ্ঠের আওয়াজ হইল, কে?

দুয়ারের পানে শঙ্কিত নেত্রে একবার চাহিয়া প্রায় সবাই একসঙ্গে প্রশ্ন করিয়া উঠিল, কে?—কে ধাক্কা দেয়?

কিন্তু তখনই ঘরের পাশের ডোবাটায় একটা ব্যাঙের আওয়াজ পাইয়া কতকগুলা ব্যাঙ একসঙ্গে 'কে-কেও' 'কে-কেও' করিয়া তারস্বরে আওয়াজ তুলিল। সকলে লজ্জিত হইয়া আবার পরস্পরের মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করিল।

অশ্বিনী হাসিয়া বলিল, যাক, অক্ষয়ের থিয়োরিটা অনেকটা স্পষ্ট হ'ল এই দিয়ে—যেমন এই বায়ুর স্তরে বায়ু হানা দিচ্ছে আর জলের স্তরে ব্যাঙ 'কে-কেও' আওয়াজ করছে—দুটো সময়-হিসেবে এক সঙ্গেই হচ্ছে, মাঝখান থেকে আমরা দুটো জুড়ে একটা জিনিস খাড়া ক'রে নিয়ে আঁতকে উঠলাম।···কেমন হে অক্ষয়, এই তো?

অক্ষয় একটু রাগিয়া বলিল, অত উড়িয়ে দেবার কথা নয় হে অশ্বিনীবাবু, ঠিক এই ধরনের ব্যাপার আমাদের গ্রামে একবার হয়ে গেছে, আর মজার কথা এই যে তুমিও স্বয়ং তার মধ্যে ছিলে। এমন কিছু বেশি দিনের কথাও নয়; অথচ এখন দিব্যি ঠাট্টা ক'রে যাচ্ছ আমায়।

অশ্বিনী স্মৃতিকে আলোড়ন করিবার চেষ্টা করিয়া অক্ষয়ের পানে

চাহিয়া রহিল। তাহার পর হঠাৎ ঈষৎ হাস্যের সহিত বলিয়া উঠিল, ও!—তুমি বৈরাগীর ভিটের সেই সেদিনকার কাণ্ডটার কথা বলছ?

তারাপদ, সুধেন, অম্বিকা, রমেন একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, কি, কি, ব্যাপারটা কি শুনি?

অক্ষয় অশ্বিনীকে বলিল, বল না অশ্বিনী, অবিশ্বাসীর মুখেই শোনা যাক ব্যাপারটা।

অশ্বিনী বলিল, তাতে জিনিসটার অমর্য্যাদা হবে। তুমিই বল, আমি না হয় শেষ কালে টীকা ক'রে দোব 'খন। যদি কারুর সন্দেহ থাকে তো পরিষ্কার হয়ে যাবে।

অক্ষয় বলিতে আরম্ভ করিল, তারাপদ, তুমি বৈরিগীর ভিটেটা দেখেছ, ব'লে দিলেই বুঝতে পারবে। সেদিন সন্ধ্যেয় আমাদের বাড়ি যাবার সময় একটা উঁচুপানা জায়গায় একটা খেজুরগাছ দেখেছিলে মনে আছে?

তারাপদ বলিল, আছে মনে। সেই লম্বা উঁচু হয়ে গিয়ে আবার ঘাড়ের কাছটায় মুচড়ে নেমে এসেছে—সেইটে তো?

হ্যাঁ, সেইটে। তুমি বলেওছিলে—গাছটা বেয়াড়া দেখতে তো!... আমি বলেছিলাম—জায়গাটার ইতিহাস আছে একটা, বলব বাড়ি গিয়ে। তারপর তুমিও জিজ্ঞেস কর নি, আমিও বলতে ভুলে গেছি।...সেই উঁচু ঢিবিটা বৈরিগীর ভিটে। জায়গাটার একটা বিশেষত্ব এই যে, এক ঐ কাঁধ-মোচড়ানো খেজুরগাছ ছাড়া সবুজ একটি ঘাসের কণা পর্য্যন্ত দেখতে পাবে না। কিছু হয় না ওটুকুতে। কলেজে দু-পাতা কেমিস্ট্রী প'ড়ে আর সব জায়গার মত আমাদের গ্রামেও দু-একজন দিগ্‌গজ বৈজ্ঞানিক গজিয়েছেন, নাকে চশমা দিয়ে তাঁরা অবশ্য বলছেন—ঘরের দেয়াল প'ড়ে জায়গাটা বড্ড নোনা হয়ে গেছে, তাই কিছু হয় না; কিন্তু যারা জানে তারা ঠিকই জানে যে, সবুজ প্রাণবন্ত কিছু হবার জো নেই ও-ভিটেতে। ওর ওপর প্রাণের অভিশাপ আছে—পাশের চারি দিকেই সবুজ লতা-আগাছার ঘন জঙ্গল—ছাগল চরছে, গরু চরছে, ছেলেমেয়েরা বৈঁচি-আঁশফল সংগ্রহ করছে, শুধু বৈরিগীর ভিটেয় কিছু হবে না, জীবন্ত কারুর

পায়ের দাগ পড়বে না। ঐ একটি খেজুরগাছ,—সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তার ভাঙা কাঁধ আস্তে আস্তে দুলিয়ে দুলিয়ে পাহারা দিচ্ছে—অভিশাপের কোথাও ব্যতিক্রম ঘটল কি না। লোকে বলে নাকি, ওই গাছটার মাথায়ও কেউ কখনও একটা পাখি বসতে দেখে নি, অবশ্য সত্যি মিথ্যে ভগবান জানেন।

বৈরিগীর ভিটের ইতিহাস—সে এক সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার, আজকের যে ঘটনার কথা তুলেছি, তার সঙ্গে যেটুকু সম্বন্ধ আছে সেইটুকুর কথাই বলব, সবিস্তারে না হয় অন্য একদিন বলা যাবে।

ঐ খেজুরগাছের নীচে গোকুল বৈরিগীর বাড়ি ছিল। পরিবারের মধ্যে নিজে, স্ত্রী বিন্দু বোষ্টমী, গোকুলের প্রথম পক্ষের একটি মেয়ে আর সাধন। এই সাধন যে আসলে গোকুল বৈরিগীর কে ছিল কেউ জানে না। কেউ বলত, তার দুরসম্পর্কের এক ভাই, কেউ বলত প্রথম পক্ষের খুঁব দুরসম্পর্কের শালা, কেউ বলত গুরুভাই,—মোট কথা খুব নিকট-আত্মীয় কেউ না হয়েও সাধন গোকুলের বাড়িতে বহুদিন থেকেই ছিল। সাধন যাত্রার পালা বেশ বাঁধতে পারত; এদিকে ছিল পঙ্গু, তার ডান পা-টা জন্ম থেকেই শুকনো আর অসাড়। যখনই দেখ, শুকনো পা আর একটা মোটা খাতা কোলে ক'রে সাধন পালা লিখে যাচ্ছে। উঠত খুব কম, কেউ এলে পালা নিয়ে কথাবার্ত্তা হ'ত, সন্ধ্যের সময় গোকুল গাঁজার ছিলিম হাতে এসে বসত, দুটো সুখ-দুঃখের কথা হ'ত। বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক এক খাওযা নিয়ে, সেটাও বেশি দিনই গোকুলের মেয়ে রেবতী দিয়ে যেত।

এই রেবতী মেয়েটি যতই বড় হয়ে উঠতে লাগল, ততই বাইরে ভাত নিয়ে আসাটা তার ক'মে আসতে লাগল। সাধন লোকটার পা শুকনো ছিল বটে, কিন্তু মন শুকনো ছিল না—বুঝতেই পার, শুকনো মন নিয়ে কেউ কখন যাত্রার পালা বাঁধতে পারে না। যেদিন বাইরে ভাত না আসত, সেদিন সে বগলে ক্রাচ্ দিয়ে ভেতরে উপস্থিত হ'ত, রেবতীর মার কাছে তার নতুন-বাঁধা পালার কথা সবিস্তারে পাড়ত এবং দোরের আড়ালে, কিংবা উঠোনের ও-পাশে রেবতীর উপর তার প্রভাব কি রকম

কচ্ছে তার খোঁজ রাখত। লোকটার বয়েস খুব বেশি হয় নি—এত দিন পালা বাঁধা নিয়েই ছিল; বোঝা গেল, এবার তার মনে ঘর বাঁধবার তাগিদ জেগেছে। অবশ্য সে নিজে ছাড়া ভাল ভাবে কথাটা বুঝল রেবতীর মা, কিছু কিছু রেবতীও বোধ হয়। ক্রমে রেবতীর বাইরে আহার দিতে যাওয়া খুব ক'মে গেল, এবং সাধনের শুধু আহারের সময় ছাড়া অন্য সময়েও ভেতরে আসার নানান রকম প্রয়োজন হয়ে উঠতে লাগল। এই সময়ে রেবতীর মা হঠাৎ বিসূ্চিকায় মারা গেল এবং তার মাস-দুয়েক পরে গোকুল বিন্দু বোষ্টমীর সঙ্গে মালা বদল ক'রে তাকে বাড়িতে নিয়ে এল;

গোকুল লোকটা ছিল, যাকে ব'লে হ্যাবাখ্যাপা-গোছের। রেবতীর মায়ের সঙ্গে মালা বদল ক'রে একটানা আঠারো বছর ঘর ক'রে এসেছে, এর মধ্যে একটা মেয়ে হয়েছে—এই পর্য্যন্ত জানে; কিন্তু সে যে বড় হয়েছে এবং তার বড় হওয়ায় শুকনো-পা সাধনের বাড়িতে আসা বেড়েছে এসব তার চোখে পড়ে নি। বিন্দুকে আনার পর ব্যাপারটা সম্বন্ধে তার হঠাৎ চৈতন্য হ'ল। কিন্তু দুঃখের বিষয় সমস্ত ব্যাপারটা সম্বন্ধে চৈতন্য হ'ল না। সাধন যে রেবতীর জন্যই শুকনো পায়ের উপর উপদ্রব করছে, এটা সে টের পেল না। তার মনে হ'ল, বিন্দুর আসবার পর থেকেই সাধনের গতিবিধির মধ্যে এই পার্থক্যটুকু এসেছে। এই ভ্রান্তি থেকে জটিলতার আরম্ভ হ'ল।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, সাধনের বাড়িতে আসা অল্প অল্প ক'রে একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। বিন্দু বোষ্টমী হয়ে গেল ভীষণ রকম পর্দা-নশীন। শেষে এমন পর্য্যন্ত হ'ল যে, গোকুল বাইরে গেলে বাড়ির দোরে শেকল উঠতে লাগল।...

একদিন গোকুলের কাজ ছিল দূরে কোথায়। যথারীতি শেকলের ওপর সেদিন একটা তালাও ঝুলিয়ে গিয়েছিল দোরে,—সন্ধ্যের সময় এসে তালা খুলতে যাবে, হঠাৎ খেজুরগাছের মাথায় একটা খসখসে আওয়াজ শুনে নীচে গিয়ে দাঁড়াল, স্পষ্ট বুঝতে পারলে—ওপরে একজন লোক; ডাকলে, কে?...নেমে এস।

সাধন আস্তে আস্তে নেমে এসে সামনে দাঁড়াল। গোকুল একটু মাত্রও বিস্মিত হ'ল না। প্রশ্ন করলে, খেজুরগাছে যে, এই সন্ধ্যেয় ?

সাধন একটু কাঁপা গলায় বললে, শিউলি আজ নতুন গাছ কেটেছে —দেখছিলাম রস হ'ল কি না !

গোকুল বললে, আমি আসল কথাটা বলব ? তুমি অন্য জায়গায় রসের সন্ধান পেয়েছ। আজ সমস্ত দিন দেখা হওয়ার সুযোগ হয় নি, তাই এই সন্ধ্যেয় গাছে চ'ড়ে—

সাধন ধরা প'ড়ে স্বীকার ক'রে ফেললে। গোকুলের পায়ের ওপর প'ড়ে বললে, আমি পঙ্গু, কিন্তু একেবারে নির্গুণ নয়, গোকুলদা ; তুমি দাও আমায় রেবতীকে, তাকে আমি সুখে রাখব।

গোকুল হেসে উঠল ; বললে, এখনও মিথ্যে বলছ রেবতীর কথা তুলে ?—আমায় বোঝাতে চাও যে, তুমি রেবতীর টানেই—। সঙ্গে সঙ্গেই একটু কি ভেবে নিয়ে গলা নরম ক'রে বললে, তা বেশ, খেজুরগাছের কাঁটাও যখন তোমার কাছে তুচ্ছ, তখন নিশ্চয় তুমি ভালবাস আমার মেয়েকে। চল, ভেতরে চল, বিয়ের কথা খেজুরগাছতলায় দাঁড়িয়ে হয় না।

অক্ষয় একটু চুপ করিয়া বাহিরের দুর্যোগটা যেন ভাল করিয়া অনুভব করিয়া লইল, তাহার পর আরও একটু গুটাইয়া বসিয়া বলিল, ক্রমে বেড়েই চলেছে দেখছি যে !

তারাপদ প্রশ্ন করিল, তার পর ?

অক্ষয় বলিল, তার পর আর কি ! বৈরিগীর বাড়িটা একটেরেয় ব'লে সেদিন কেউ বুঝতে পারে নি, পরদিন সকালেই টের পাওয়া গেল— গোকুল বৈরাগী তিনটে খুন ক'রে উধাও হয়েছে। অবশ্য ধরা পড়ে কিছু দিন পরেই।...সাধনের ঘাড়টা ছিল মচকানো, লোকশ্রুতি যে পরের দিনই একটা দমকা হাওয়া উঠে খেজুরগাছের মাথাটা ঐ রকম ক'রে মুচড়ে দিয়ে যায়।

সুধেন খুব অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিল, হঠাৎ যেন সংবিৎ পাইয়া প্রশ্ন করিল, রেবতীকেও খুন করলে ? সে কি করেছিল ?

অক্ষয় হাসিয়া প্রশ্ন করিল, রেবতীর জন্যে তোমার প্রাণ কাঁদল ব'লে

তাকে খুন করাই যে বেশি অন্যায় হয়েছিল এমন তো নয়; বিন্দুরই বা দোষ কি? সাধনেরই বা কি এমন অন্যায় হয়েছিল?

সুধেন অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, না, সে কথা বলছি না···মানে ··থাক্, তোমার বৈরিগীর ভিটের পরবর্ত্তী কি ইতিহাস যেন বলতে যাচ্ছিলে, তাই বল।

অক্ষয় বলিতে লাগিল, বৈরিগীর ভিটেকে সেই থেকে সবাই এড়িয়ে চলে। পাড়ার জীবন্ত বাড়িগুলো থেকে দূরে, নিজের কাহিনী বুকে ক'রে বৈরিগীর ভিটে প'ড়ে আছে, না-ঘাঁটাও কিছু বলবে না, ঘাঁটাও এমন কিছু একটা অভিজ্ঞতা দেবে যা সহজে ভুলে উঠতে পারবে না। নানা প্রকার দেখে ঠেকে গ্রামের লোকে ছেড়ে দিযেছিল। এমন সময় সেবার গরমের ছুটিতে দেশে ফিরে এসে এক দল তোমাদের আধুনিক ছেলে গ্রাম থেকে অন্ধ সংস্কার দূব করবার জন্যে একেবারে অন্ধভাবে মেতে উঠল। ঠিক করলে তাবা ঐ বৈরিগীব ভিটের বুকের ওপর স্টেজ খাটিযে থিয়েটার করবে।

গ্রামের প্রাচীন অভিজ্ঞ লোকেবা অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বললে। বললে, অন্ধ সংস্কার বল বা যা-ই বল, লোকে চিরকালটা যা মেনে এসেছে —ভূত, প্রেত, উপদেবতা, হাঁচি, টিকটিকি, বার, ক্ষণ—সবই মানা উচিত। দু-অক্ষর ইংরেজী পড়লেই সব মিথ্যে হয়ে যায় না।

কিন্তু চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী। বার-ক্ষণের কথায় ছেলেরা ঠিক করলে সামনের শনিবারটাতেই তারা প্লে-টা করবে, সেদিন অমাবস্যাও আছে; আর টিকটিকি স্বাধীনচেতা জীব, তাদের উপর তো হুকুম চলবে না, তবে থিয়েটারের সীন তোলা, সীন ফেলা তারা করবে হাঁচির সাহায্যে, ঘণ্টা দিযে নয়; পাঁচ-ছ জন ছোকরা এই জন্যে নস্যি আর কাঠি নিয়ে তোয়ের থাকবে। এরও যথারীতি রিহার্সাল আরম্ভ হ'ল।

উপদেষ্টারা হাল ছেড়ে দিলে।

শুধু তাই নয়, শেষ পর্য্যন্ত কিছু লোক এদের দিকেও ঝুঁকল;— কয়েক জন পার্টের লোভে, কয়েক জন আবার আধুনিক হবার লোভে বোধ হয়। কয়েক জন আবার এই জন্যেও বোধ হয় যে, ভাল রকম

খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত ছিল,—শিঙাড়া, কচুরি, লুচি, সন্দেশ, আলুর দম, আর ঢালোয়া চা। একজন ময়রা ডাকিয়ে বৈরিগীর ভিটের এক পাশেই এসব তৈরি করাবার ব্যবস্থা হ'ল। জন তিন-চার ছেলে এই দিকটা নিয়ে রইল,—জিনিসপত্র যোগাড় করা, তদারক করা—এই সবের জন্যে।

অশ্বিনী বলিল, আমিও একজন ছিলাম তার মধ্যে।

অক্ষয় বলিল, তাই তোমার অবিশ্বাসটা আরও বেশি।

তারাপদ বলিল, ফাঁকা বাহাদুরিতে একটা আরাম আছে কিনা—

অক্ষয় বলিতে লাগিল, দল যখন পুরু হয়ে উঠল, আরও কয়েক জন এল—সাহসা বলবে লোকে এই লোভে। জানই তো—ভিড়ের মধ্যে ভয় থাকে না। ঠিক হ'ল দুটো প্লে হবে, বেশ বড় দেখে, অর্থাৎ সমস্ত রাত ধ'রে ভূতের ভিটেয় নৃত্য করতে হবে, ভূতেরা যেন না দুয়ো পাড়তে পারে যে,'প্রথম রাত্রে একটু চেহারা দেখিয়ে সব পালাল। পালা ঠিক হ'ল 'চন্দ্রগুপ্ত' আর 'পাণ্ডব-গৌরব'।

শনিবার সন্ধ্যে থেকে জায়গাটা বেশ গমগম ক'রে উঠল। প্রথমে ভাবা গিয়েছিল, লোক হবে না, ভূতেদেরই দেখাতে হবে প্লে-টা ; কিন্তু ক্রমে এক এক ক'রে অনেক লোক জুটে গেল। হোগলা দিয়ে একটা অডি-টোরিয়াম করা হয়েছিল, সেটা উপচে বাইরে পর্য্যন্ত লোক জ'মে উঠল।

ঠিক নটার সময় একেবারে আট-দশটা ছেলের হাঁচির আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে কন্‌সার্ট বেজে উঠল। বাইরের কয়েক জন ভূত-বিরোধী ছোকরা দর্শক তালি দিয়ে এদের অভিনন্দিত করতে যাবে, প্রবল একটা বাধা পড়ল ;—কন্‌সার্ট বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই আরও একটা জিনিস উঠল,—কোথাও কিছু নেই, একটা উৎকট রকমের দমকা হাওয়া। ঠিক কে যেন অডিটোরিয়াম আর স্টেজের ঝুঁটি ধ'রে একটা কড়া ঝাঁকানি দিয়ে বৈরিগীর ভিটের পুরনো পাহারাদার সেই কাঁধ-ভাঙা খেজুর-গাছটাকে জাগিয়ে দিয়ে আকাশ বেয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে চ'লে গেল। একটা রীতিমত গোলমাল হ'ল অডিটোরিয়ামে। যারা বুদ্ধিমান তারা ব্যাপার দেখে পাতলা হ'ল। কিন্তু এদের বাহাদুরি দিতে হবে—কন্‌সার্ট একবারও থামল না—

অশ্বিনী বলিল, তার কারণ সেটা ছিল গ্রামোফোনের রেকর্ড।

অক্ষয় কথাটা কানে না তুলিয়া বলিল, কন্‌সার্ট থামলে হাঁচির আরও একটা গুরুতর আওয়াজ হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে ড্রপ্‌সীন উঠল। হাঁচিটা আরও গুরুতর করবার অর্থ,—ভূতেই যদি দমকা হওয়া হয়ে দেখা দিয়ে থাকে তো যত পারে দিক, এরা পেছপা নয়।...এরা যে কাদের ঘাঁটাচ্ছে তখনও টের পায় নি। এবার আর ঝড় উঠল না, কিন্তু যা আরম্ভ হ'ল কিছু দিন এখন মনে থাকবে বাছাধনদের।... ড্রপ্‌সীন উঠল।... তারাপদ, তোমার আলমারিতে 'চন্দ্রগুপ্ত' আছে? দাও তা হ'লে, ব্যাপারটা যেমন হয়েছিল সঠিক বর্ণনা করতে পারব।

তারাপদ উঠিয়া আলমারি হইতে ডি. এল. রায়ের বাঁধানো গ্রন্থাবলী বাহির করিয়া আনিয়া অক্ষয়ের হাতে দিল। অক্ষয় 'চন্দ্রগুপ্ত' পালাটা খুলিয়া বাহির করিয়া বলিতে লাগিল, ড্রপ্ উঠতেই একটা নদীর দৃশ্য। সিন্ধু নদ। সূর্য্যাস্তের সময়। সীনে নদীর জলের কাছটায় একটু চিরে তার মধ্যে গোল লাল রঙের একটা কাগজ অর্দ্ধেকটা সাঁদ করিয়ে দেওয়া হয়েছে,—মানে, সূর্য্য অর্দ্ধেক অস্ত গেছে, বাকি কাগজটা টেনে দিলেই সূর্য্য একেবারে ডুবে যাওয়া হবে আর কি।

সামনেই সেকান্দার, সেলুকাস আর হেলেন; হেলেন সেলুকাসের হাত ধ'রে দাঁড়িয়ে। তিন জনেই সূর্য্যাস্ত দেখছে।

এই সময় একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার হ'ল। সূর্য্যের দরুণ রাঙা কাগজটা যেই আস্তে আস্তে টেনে নেওয়া হ'ল, স্টেজের কড়া গ্যাস-ল্যাম্পটা কয়েক বার দপ দপ ক'রে হঠাৎ নিবে গেল।

তোমরা বোধ হয় বলবে, ব্যাপারটা কাকতালীয়-ন্যায় গোছের একটা কোইন্‌সিডেন্স মাত্র, কিংবা গ্যাস-ল্যাম্পগুলোর একটা দোষই এই যে ঠিক সময় বুঝে নিবে ব'সে থাকে। পরে সেই নব্যদের মধ্যেও ধীরে সুস্থে সেই কথাই হয়েছিল; কিন্তু ঠিক সেই সময়টিতে অন্ধকারের ছায়া যেন সবার মুখ কালি ক'রে দিলে। অডিটোরিয়ামে তো একটা ভীষণ হট্টগোল উঠলই, আর এদিকে স্টেজের ওপরও সব বীরপুঙ্গবদের একটু মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করতে হ'ল। মুখ ফুটে না বললেও কারুর যেন সন্দেহ

রইল না যে, প্রথমটা অর্থাৎ দমকা হাওয়াটা ছিল যেন কারুর হুমকি, তাতে ফল না হওয়ায় সে-ই আবার এই মোক্ষম ঠাট্টার অবতারণা করেছে।—বাতাসে যেন একটা হি-হি-হি ক'রে বিদ্রূপ-হাসির চাপা ঢেউ ব'য়ে যাচ্ছে।...বাঃ, সূর্য্যাস্ত হ'লে অন্ধকার হয়ে যাবে না? তবে আর তোমরা সীনারি দেখাচ্ছ কি?"

ড্রপসীন ফেলে আবার আলো জ্বালা হ'ল। আর যাই হোক, হাঁচিটা যে ফললই এতে আর কারুর সন্দেহ রইল না। দ্বিতীয় বারও অবশ্য হাঁচি দিয়েই ড্রপসীন উঠল, তবে জোর অনেক ক'মে এসেছে। ওদিকে অডিটোরিয়ামও অর্দ্ধেকের বেশি খালি, যারা আছে তারা খুব গা ঘেঁষে ঘেঁষে ভয়ের নেশায় উৎসুক ভাবে ব'সে আছে।

যাক, প্লে আরম্ভ হ'ল। সেকান্দার ব'লে যাচ্ছে (অক্ষয় বইয়ের দিকে চাহিল), 'সত্য সেলুকাস্! কি বিচিত্র এই দেশ! দিনে প্রচণ্ড সূর্য্য এর গাঢ় নীল আকাশ পুড়িয়ে দিয়ে যায়, আর রাত্রিকালে শুভ্র চন্দ্রমা এসে তাকে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় স্নান করিয়ে দেয়। তামসী রাত্রে অগণ্য উজ্জ্বল জ্যোতিঃপুঞ্জে যখন এর আকাশ ঝলমল করে, আমি বিস্মিত আতঙ্কে চেয়ে থাকি।...'

এই পর্য্যন্ত ব'লে সেকান্দার অডিটোরিয়ামের গ্যাস-ল্যাম্পের দিকে চেয়ে, চোখ-মুখে যতটা সম্ভব আতঙ্কের ভাব ফুটিয়ে দাঁড়িয়ে রইল যেন সত্যিই কিছু একটা দেখেছে। প্রথমটা সবাই ভাবলে সেকান্দার জেশ্চার-পশ্চার দেখাচ্ছে। কেষ্টা, যে সেকান্দারের পার্ট নিয়েছে, তার আবার ওদিকে একটু বাড়াবাড়ি ছিল। কিন্তু যখন দেখা গেল, কেষ্টার হিসেবেও বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে, তখন প্রম্প্টার তাগাদা দিতে লাগল, এবার বল্—'প্রাবৃটে ঘনকৃষ্ণ মেঘরাশি...প্রাবৃটে ঘনকৃষ্ণ মেঘরাশি'—বল্ না কেষ্ট—'প্রাবৃটে ঘনকৃষ্ণ'—বল্...হয়েছে তো পশ্চার, মস্ত বড় পশ্চারী তুই—শিশির ভাদুড়ী!

প্রম্প্টার ছাড়াও উইংসের দুই দিক থেকে ঘন ঘন তাগাদা দিতে লাগল; অডিটোরিয়ামেও তালি পড়ল; কিন্তু সেকান্দারের মাথায় যে কি 'বিস্মিত আতঙ্ক' ঢুকে গেছে, না চোখ ফেরায়, না পার্ট বলে।

প্রম্প্‌টার শেষকালে হেরে বললে, সেলুকাস, তা হ'লে তুমি বল, 'সত্য সম্রাট !'...ও পশ্চার দেখাক।

সেলুকাস এমন ভাবে ফ্যালফ্যালিয়ে ফিরে চাইলে যেন কথাটা বুঝতে পারে নি, তার পর হঠাৎ সামলে নিয়ে বললে, সত্য সম্রাট।

এবার সেকান্দার বল, '...কোথাও দেখি তালীবন গর্ব্বভরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে'...বল্ না কেষ্টা, কি জ্বালা !

কেষ্টার যেন হঠাৎ খেয়াল হ'ল ; প্রম্প্‌টারের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলে, কি বলব ?

· অডিটোরিযামে আবার তালি পড়ল। 'ভূতে পেয়েছে, ড্রপ্‌ ফেলে দাও' বলে একটা সোরগোল উঠল, এবং আরও এক দল দর্শক পৃষ্ঠভঙ্গ দেওয়ায় অডিটোরিয়ামটা যেন খাঁ-খাঁ করতে লাগল। প্রম্প্‌টার ভেংচি কেটে বললে, কি বলব ! কচি খোকা !...বল্—'কোথাও দেখি তালীবন গর্ব্বভরে মাথা উঁচু ক'রে...'

কেষ্টা ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে আবার প্রশ্ন করলে, কেন ?

আবার একচোট হাততালি। সেই গোলমালে প্রম্প্‌টার প্রাণের আক্রোশ মিটিয়ে বললে, শখ ক'রে থিয়েটার করতে এসেছ যে, তোমার গুষ্টির পিণ্ডি, আর কেন !

পাশ থেকে সেলুকাস বললে, বাঃ, আমরা থিযেটার করছি যে বৈরিগীর ভিটেয়, মনে নেই তোর ? উইংসের দুই পাশ থেকে দাবড়ি খেয়ে সে চুপ ক'রে গেল।

কেষ্টার এবার যেন ঘুম ভাঙল, একটু ন'ড়ে-চ'ড়ে বললে, ও ! বুঝেছি, বল্।

গড়গড়িয়ে বেশ খানিকটা ব'লে গেল, প্রম্প্‌টেরও বড় একটা অপেক্ষা করলে না। শেষকালে সেলুকাসের মুখের পানে চেয়ে লেখামত প্রশ্ন করলে, 'পুরুকে বন্দী ক'রে আনি যখন—সে কি বললে জান ?'

সেলুকাসের অল্প পার্ট, তারই মধ্যে গোলমাল ক'রে ফেলে বললে, কি বললে রে ?

তার পর দাবড়ানি খেয়ে শুধরে নিলে, কি সম্রাট ?

কেষ্টা-সেকান্দার খানিকটা হাঁ ক'রে রইল—প্রম্পটিং যেন কানেই যাচ্ছে না। তারপর দুবার কপালে চিন্তিত ভাবে হাত বুলিয়ে ব'লে উঠল, দাঁড়া, মনে পড়েছে—আমি জিজ্ঞাসা করলাম—'আমার কাছে কিরূপ আচরণ প্রত্যাশা কর? সে নির্ভীক নিষ্কম্প স্বরে উত্তর দিলে, জামাইয়ের মত…!'

'ড্রপ্ ফ্যাল্, ড্রপ্ ফ্যাল্' ব'লে চারিদিক থেকে একটা রব উঠল। এবার স্টেজের মধ্যে থেকেও।

খুব বেশি দরকারের সময় ড্রপ্‌সীন খুব বেশি বাগড়া দেয়—এটা তোমরা সবাই জান; শূন্যে অনেক ওঠা-নামার পর শেষে পড়ল। তারপর স্টেজের ভেতরে যে নারকীয় গোলমালটা উঠল, তাতে স্বয়ং ভূতেদেরও লজ্জা পাবার কথা। কেষ্টা আর গজানন, যারা আলেকজাণ্ডার আর সেলুকাসের পাট নিয়েছিল, তাদের তো সবাই খুন করতে বাকি রাখলে। সে বেচারীরা মুখ চুন ক'রে এক ধারটিতে গিয়ে ব'সে রইল।

কয়েকজন বয়স্থ লোকও ভেতরে ঢুকে পড়ল। বললে, বাপু, সাধ মিটল তো? এখন ভালয় ভালয় পাত্তাড়ি গুটিয়ে সব ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে চল। রাত্তিরে তাঁদের নাম করতে নেই, কিন্তু আগাগোড়া কোথা থেকে ব্যাপারটা হচ্ছে তা নিয়ে এখনও আছে সন্দেহ তোমাদের মনে? শেষকালে পুরু যে বললে, 'জামাইয়ের মত ব্যবহার চাই'—বুঝতে পারছ না, ওটা গোকুলের মেয়ে রেবতীর সম্পর্কে সাধন বৈরিগীর মনের কথা, যা নিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা হ'ল এই ভিটের ওপর…তোমরা কি চাও আরও স্পষ্ট ক'রে বুঝিয়ে দেবেন তোমাদের ওঁরা? তা ভিন্ন শোনাবে কাদের তোমরা বাপু? মুখ বাড়িয়ে একবার অডিটোরিয়ামটা দেখে এস তো!

যজ্ঞের পাণ্ডা সতীনাথ ও আর কয়েকজন জিদ ধ'রে বসল, তারা করবেই থিয়েটার, দুজন আবোল-তাবোল বকেছে ব'লে কিছু ভূতের অস্তিত্ব প্রমাণ হয়ে যায় না। সতীনাথ এগিয়ে এসে বুক ফুলিয়ে বললে, আর ভূত যদি থাকেই, আর তাদের বুকের পাটা থাকে তো তারা সামনে এসে যা করবার—

বাস্, এই পর্য্যন্ত বলেছে, এমন সময় এক ব্যাপার ঘটল যা কেউ

স্বপ্নেও কখনও ভাবতে পারে নি। বিরূপাক্ষ চাণক্য সেজেছিল, হঠাৎ গ্রীনরুমের দিক থেকে এসে হাজির। সে কি উগ্র মূর্ত্তি! চাণক্যের নেড়া-মাথার ওপর টিকিটা ফেঁপে রয়েছে, গম্ভীর মুখ, রক্তজবার মত চোখ দুটো গর্ত্তের মধ্যে যেন জ্বলছে। সামনে দাঁড়িয়ে শিশির ভাদুড়ীর মত মাথা নেড়ে টিকিতে তা দিতে লাগল। ঠিক যেন কোন কিছুর ভর হয়েছে, মূর্ত্তি হাব-ভাব দেখে সবাই একটু স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বয়স্থদের মধ্যে বিশেষজ্ঞ হিসেবে এসেছিল নবীন হাজরা—ডাকসাইটে ভূতের ওঝা; চাণক্যের পানে চেয়ে কপালে হাতজোড় ক'রে বললে, ঠাণ্ডা হও বৈরিগীবাবা, এরা ছেলেমানুষ, ক'রে ফেলেছে একটা ভুল—। সতীনাথ কি বলতে যাচ্ছিল, বিরূপ ওদের দিকে চেয়ে একেবারে চীৎকার ক'রে উঠল, নীচের আজ স্পর্দ্ধা—ব্রাহ্মণ-বৈরিগীকে দেখে একটা শুষ্ক প্রণাম করতেও হাত ওঠে না?···যাও, আমার ছায়া মাড়িও না, আমার নিশ্বাসে বিষ আছে, আমি দুর্ভিক্ষ, আমি মড়ক··· এখনও গেলে না!···কাত্যায়ন!···কাত্যায়ন! নিয়ে এস তো রামদা-টা, আমি কোপাই সবগুলোকে, আর তুমি বাকিগুলোর ঘাড় মটকাতে থাক—ঐ খেজুরগাছটার মতন ক'রে।··কোথায় কাত্যায়ন?···আচ্ছা, দা না থাকে, স্টেজ-খোঁড়া ঐ শাবলটাতেই হবে—

ছুটে নিতে যাবে শাবলটা, সবাই তাড়াতাড়ি তাকে ধ'রে ফেললে। তার মধ্যে থেকেই কী সে আফ্‌সানি। জ্বলন্ত ভাঁটার মত চোখ, পরচুলটা পিছলে গিয়ে টিকির গোছাটা মুখে এসে পড়েছে, গায়ে এসে পড়েছে এক অসুরের ক্ষমতা; ধ'রে কি রাখা যায়? আর মাঝে মাঝে সেই চীৎকার, কাত্যায়ন! কোথায় গেল কাত্যায়ন?—নিয়ে এস 'তো শাবলটা, আমি দেখি একবার এদের—

এক উৎকট কাণ্ড, এখনও মনে পড়লে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে!···

অক্ষয় চুপ করিল। বেশ বুঝা গেল, এই অস্বাভাবিক গল্প বলিতে তাহার স্নায়ুগুলা অতিরিক্ত উত্তেজিত হইয়া গিয়াছে। বাহিরে সেই দুর্য্যোগ; রাত্রি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন আরও মাতিয়া উঠিয়াছে। সব মিলাইয়া বৈরিগীর ভিটার তাণ্ডব-চিত্রটা যেন সবার চোখের সামনে স্পষ্ট

করিয়া দিতেছে। ভিতরে সমস্ত ঘরটা থম্‌থম্‌ করিতে লাগিল। দুয়ার-জানালার উপর একটা প্রচণ্ডতর আঘাত আসিয়া পড়ায় সবাই—এমন কি অশ্বিনী পর্য্যন্ত—চমকিয়া উঠিয়া একবার সেইদিকে চাইল। রমেন নিতান্ত অল্প কথার লোক। এতক্ষণ বালাপোশে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়া শুধু নাক আর মুখটুকু বাহির করিয়া শুনিতেছিল, চমকিয়া উঠায় বোধ হয় নিজের দুর্ব্বলতাটা ঢাকিয়া লইবার জন্য ধীরে ধীরে টীকা করিল, গঞ্জিকা!

গাঁজা?—বলিয়া অক্ষয় চটিয়া উঠিয়া আরও কি বলিতে যাইতে-ছিল, অশ্বিনী শান্তভাবে বলিল, তুমি চোটো না অক্ষয়, যে আসল ব্যাপারটা জানে সে কখনও 'গঞ্জিকা' বলবে না।

অবিশ্বাসী অশ্বিনীর মুখে এ ধরনের কথা শুনিয়া সবাই বিস্মিত হইয়া তাহার পানে চাহিল, আরও নূতন কিছু শুনিবার জন্য। তারাপদ প্রশ্ন করিল, তুমি জান নাকি আসল কথাটা? অর্থাৎ ঠিক কার বা কিসের প্রভাবে—

অশ্বিনী গম্ভীরভাবে সিগারেট টানিতে টানিতে মাথা নাড়িয়া বলিল, হুঁ। সে শুনলে—

সকলে একসঙ্গে প্রশ্ন করিয়া উঠিল, কি? কি বল তো?

অশ্বিনী সিগারেটে একটা দীর্ঘতর টান দিয়া, ধুঁয়া ছাড়িয়া বলিল, গঞ্জিকা নয়, সিদ্ধি।

সবাই একটু থ হইয়া গেল, সে ভাবটা সামলাইয়া লইয়া অক্ষয় আবার উগ্রভাবে কি একটা বলিতে যাইতেছিল, অশ্বিনী শান্তভাবে হাত উঁচাইয়া তাহাকে বিরত করিয়া বলিল, থাম না ভাই, আমি নিজের হাতে কচুরির পুরের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিলাম; ও জিনিস পেটে গেলে একবার যা ঝোঁক মাথায় ঠেলে উঠবে, তা থামায় কার সাধ্যি! না হয় একবার দেখই একদিন পরখ ক'রে।...শুধু দুঃখু র'য়ে গেল থিয়েটারটা শেষ পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে গেল না ওরা,—চন্দ্রগুপ্ত, তার মা মুরা, ছায়া, অ্যান্টিগোনাস—এরা সব তো বাকিই র'য়ে গেল...

ধর্মতলা-টু-কলেজ-স্কোয়ার

ধর্ম্মতলার মোড়ে ট্রামে উঠিলাম, '—চিঠি'র অফিসে যাইতে হইবে।

একটু অগ্রসর হইয়াছি এমন সময় রব উঠিল, এই, বাঁধো, বাঁধো—লেডি!

একদমসে বাঁধ কর্কে; স্ত্রীলোক উঠতা হ্যায়!

ঘুরিয়া দেখিলাম, একটি চব্বিশ-পঁচিশ বৎসরের যুবক মন্দগতি ট্রামের পাশে পাশে পা চালাইয়া অগ্রসর হইতেছে। রড্‌টা ধরিবার জন্য ডান হাতটা উঁচু করা। উঠিবার উপক্রম করিতেছে, কিন্তু উপযুক্ত সাহস সঞ্চিত না হওয়ায় একেবারে থামিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেছে।

আমার পাশের বেঞ্চে অত্যন্ত মোটা কাঁচের চশমা পরা একটি প্রবীণ ভদ্রলোক বসিয়া ছিলেন। হাত-পাঁচেকের পরেই সব ঝাপসা দেখেন বলিয়া বোধ হইল, এবং সেই জন্য হাত-পাঁচেকের বাহিরে চারিদিকেই দুর্ঘটনার সম্ভাবনা রহিয়াছে মনে করিয়া খুব সতর্ক। একবার পিছন ফিরিয়া দেখিয়া লইয়া একটু রাগতভাবে ড্রাইভারকে বলিলেন, এই, ডেড স্টপ করো। লেডি উঠতা হ্যায়, শুনতা হ্যায় নেহি?

হাসি পাইল, লেডিই বটে!

তুলতুলে মেয়েলী ঢঙের চেহারা। ফাঁপা চাদর, সিল্কের পাঞ্জাবি আর লটপটে কাপড়েও অনুরূপ ভাব। সলজ্জ এবং সংকুচিত,—এই ট্রাম সম্পর্কিত ব্যাপারে লজ্জা-সংকোচে যেন আরও লুটাইয়া গিয়াছে। ট্রামটা নিশ্চলভাবে থামিয়া গেলে উঠিয়া কয়েকজনের দিকে চকিতভাবে চাহিয়া দৃষ্টি নত করিল।

একটি মেয়ে ট্রামের পিছনের বারান্দাটিতে একটা রড ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। যুবক উঠিতেই নিম্নস্বরে বলিল, চল, সামনের সীটটায় গিয়ে বসি, খালি আছে।

এতক্ষণে ভুলটা বুঝিতে পারিলাম, এই তাহা হইলে 'লেডি' !

কালোর উপর বেশ সুশ্রী। একটা টকটকে লাল শাড়ি পরা। পায়ে অল্প একটু উঁচু-গোড়ালির জুতা, হাতে একটি খর্ব্বাকৃতি ছাতা। সঙ্গীর অবস্থায় একটু লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছে, তবুও ভাবটা বেশ সপ্রতিভ।

দুইজনে একটু অগ্রসর হইল।

যুবক বলিল, তুমি এই লেডিজ সীটেই ব'স না। আমি বরং ওখানটায় গিয়ে বসছি।

অর্থাৎ গা-ঝাড়া দিতে চায় ও। ভিড়ের মধ্যে মেয়েটির সান্নিধ্যে যে কুণ্ঠা, তাহা কোন মতেই কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছে না। মেয়েটি নিশ্চয় তাহাকে চেনে, বেশ একটু দৃঢ়তার স্বরে বলিল, আচ্ছা, এস তো তুমি।

আমার সামনে একটি বেঞ্চ খালি ছিল; সেইটিতেই গিয়া দুইজনে বসিল। একটু চুপচাপ গেল, তাহার পর মেয়েটি মাথা নামাইয়া ধীরে ধীরে বলিল, আমার এমন হাসি পাচ্ছে!

যুবক কারণটা যে বুঝে নাই এমন নয়, তবু জড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, কেন?

মেয়েটা ঘুরিয়া একবার পিছনে চাহিল। আমি একটা খবরের কাগজ পড়িতেছিলাম, সেটা সঙ্গে সঙ্গেই তুলিয়া ধরিতে আমার মুখ দেখিতে পাইল না। নিজের পড়া লইয়া আছি ভাবিয়া নিশ্চিন্তস্বরে কহিল, কেন আবার!—তোমার কাণ্ড দেখে। সবাই 'লেডি হ্যায়—বাঁধকে, লেডি হ্যায়—বাঁধকে' করছে, লেডির সাহস হচ্ছে না যে টপ ক'রে উঠে পড়বেন। আগেভাগে উঠে প'ড়ে এমন লজ্জা করছিল আমার। তোমায় ঠাট্টা ক'রে সব লেডি বলছে, কি আমায় ইঙ্গিতে টম-বয় বলছে!...এমন জ্বালায়ও পড়ে মানুষে!

একটু তরল হাসি উঠিল।

উত্তর হইল, গেলে কেন উঠতে না থামতেই?

অপরাধ হয়েছিল। লেডি সঙ্গিনীকে আগে তুলে দেওয়া উচিত ছিল বটে।

আর একটু হাসি ছলছল করিয়া উঠিল। তার পর—

আজকে কেমন আমার অনেকদিন পরে স্কুলের খেলাধুলো, ড্রিল, স্কিপিঙের কথা মনে প'ড়ে গেল, বাপু! . অতশত ভাববার আগেই টুপ ক'রে কখন উঠে পড়লাম। আর ট্রামটা তখন মোটে চলতে আরম্ভ করেছে। তবু কি ভাবলে লোকে কে জানে।—ভাবুক গে! ব'য়ে গেল।

আঃ, সবাই শুনতে পাবে; কি করছ?

সাহেব মেম আর কি বুঝবে?

ফিসফিস করিয়া প্রশ্ন হইল, আর পেছনে?

ফিসফিস করিয়া উত্তর হইল, হিটলার অস্ট্রিয়া দখল করেছে—দু ইঞ্চি টাইপের বোল্ড্ হেডলাইন।—উনি এখন জার্মেনিতে; সেখান থেকে ধর্ম্মতলার কথাবার্ত্তা শোনা যায় না।.

হাসির ছলছলানি একটু লাগিয়াই আছে।

যুবক একবার নিশ্চয় ঘুরিয়া দেখিল। সত্যই কাগজ পড়িতেছি দেখিয়া অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া থাকিবে, বলিল, না, শোনা যায় না। বরং—

মেয়েটি প্রশ্ন করিল, বরং কি, ব'লেই ফেল না। কেউ আমাদের আলাপ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। আর ঘামালেও শুনতেই পাবে বড়! পুরনো ট্রামের এই একটা মস্ত সুবিধে। এটার আবার কোথায় কি একটা ঢিলে হয়ে গেছে।

বলছিলাম—বরং কাছে সুন্দরী ব'সে থাকলে হিটলারের বিজয়ের কথাই অতি সামান্য ব'লে মনে হয়।

কালো আবার সুন্দরী!

সুন্দরী আবার কালো!

এবার তাহার একলার হাসি নয়, দুইটি স্বরের মিশ্র হাসি উঠিল, অবশ্য চাপা,—যুবকটির বেশি চাপা।

একটু নীরব। আবার হিটলারে মনঃসংযোগ করিব, প্রশ্ন হইল, আচ্ছা, আমি কাছে রয়েছি ব'লে তুমি অমন গুটিসুটি মেরে রয়েছ কেন

বল দিকিন? যেন ভয়ে সারা! আমি প্রথমেই বলেছিলাম—তোমার কর্ম্ম নয়। ল' কলেজের ফার্স্ট বয় হ'লেই হয় না, বড্ড মর‍্যাল কারেজের অভাব তোমার। আমি তো তোমার সঙ্গে রয়েছি ব'লেই কাউকে গ্রাহ্য করি না। পাশে যখন নিজের—

এই সময় ট্রামটা দাঁড়াইয়া পড়ায় বাক্যটা অসমাপ্ত রহিল।

আমাদের সামনে এই সময় কয়েকটা সীট খালি হইল। একটি ইংরেজ যুবক আসিয়া একটাতে বসিতে যাইয়া হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং আমাদের যুবক-দম্পতির সামনের সীটে উপবিষ্ট সাহেবটির দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, হ্যালো জোন্‌স, তুমি এখানে! জামালপুর থেকে কবে এলে?

জোন্‌স করমর্দ্দনের জন্য হাত বাড়াইয়া বলিল, পরশু এসেছি। তোমাকে আমার স্ত্রীর সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দি। তোমার ঠিকানা কোন মতেই জোগাড় করতে পারলাম না, খবর দিতে পারি নি, মার্জ্জনা কর।

আগন্তুক বন্ধুপত্নীর সহিত করমর্দ্দন করিয়া কুশলাদি প্রশ্ন করিল। ওদের একেবারে সামনের দুটো সীট—তিনজনের কথাবার্ত্তা জমিয়া উঠিল। ইতিমধ্যে ট্রাম ছাড়িয়া আওয়াজটা বাড়িয়াছে। মেয়েটি প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, যাচ্ছ তো আমায় নিয়ে ওভারটুন হলের মীটিঙে। ধর, যদি কোন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়, এই রকম ভাবে ইন্‌ট্রোডিউস ক'রে দিতে পারবে?

যুবকটি শুষ্ক কণ্ঠে বলিল, নিশ্চয়, এ আর কি শক্ত?

কি বলবে?

বলব—

কণ্ডাক্‌টার আসিয়া দাঁড়াইল। আমি মাসিক টিকিট তুলিয়া ধরিলাম। যুবকটির সামনে গিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গটা মন্দ লাগিতেছিল না। আমি কাগজের উপর দিয়া দেখিতে লাগিলাম কত দূরের দৌড়। যুবক একটু ইতস্তত করিল, তাহার পর একটা আট-আনি বাহির করিয়া বলিল, শ্যামবাজার।

মেয়েটি একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, সে কি? কলেজ-স্কোয়ারে নামবে না?

যুবক একটু অপ্রতিভভাবে দুর্ব্বলকণ্ঠে বলিল, শ্যামবাজারেই চল না!

বাঃ রে! মীটিং কলেজ স্ট্রীটে, ওভারটুন হলে, আর যাবে শ্যামবাজারে?

আরও দুর্ব্বল সন্ত্রস্ত কণ্ঠে উত্তর হইল, আঃ, আস্তে।

কণ্ডাক্‌টার একটু অসহিষ্ণুভাবে বলিল, কোথাকার দোব ঠিক ক'রে ফেলুন।

মেয়েটির মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, কলেজ-স্কোয়ার?

কাগজের উপর হইতে দেখিলাম—মেয়েটি একবার সঙ্গীর দিকে চাহিল। মুখ দেখিতে না পাইলেও বুঝিলাম তাহার অবস্থা তখন অতীব শোচনীয়।

মেয়েটি কণ্ডাক্‌টারের দিকে চাহিয়া বলিল, না, শ্যামবাজার।

স্বর হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গিয়াছে। ট্রাম তখন মোড় ফিরিয়া ওয়েলিংটন স্ট্রীটে প্রবেশ করিতেছে। টিকিট লওয়ার পর মেয়েটি ঘুরিয়া পার্কের দিকে মুখ করিয়া বসিল

বুঝিলাম—রসভঙ্গ হইয়াছে, এবার নিঃঝুমের পালা চলিবে। কাগজগুলা ঠিক করিয়া লইয়া আবার হিটলার অভিযানে মনোনিবেশ করিয়াছি, এমন সময় জার্ম্মেনি থেকে শুনিলাম—গাঢ়, অনুতপ্ত, ভাবাকুল, স্বরে অনুযোগ হইতেছে, রাগ করেছ?

স্বর লক্ষ্য করিয়া বুঝিলাম—মুখটাও রোষান্বিতার ঘাড়ের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে, নিতান্ত যদি ঘাড়ে নাই পড়িয়া থাকে। একটু শঙ্কিত হইলাম, ছেলেমানুষদের কাণ্ড, ট্রামের মধ্যেই জ্ঞান হারাইয়া কিছু একটা করিয়া না বসে। একটু গলা খাঁকারি দিলাম।

কিন্তু আমাকে যাহারা জার্ম্মেনি প্রবাসের অপবাদ দিয়াছিল, তাহারা নিজেই এখন সুধু অন্য দেশে নয়, একেবারে অন্য লোকে। কোন ফল হইল না।

শুনছ? রাগ হ'ল নাকি?

একটু চুপচাপ। আবার—

কেন যে শ্যামবাজারের টিকিট করতে চাইছিলাম, একবার তো জিজ্ঞেসও করলে না। রাগ!

বুঝতে পেরেছি ; জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন নেই। ওভারটুন হলে যদি আবার কারুর কাছে পরিচয় করিয়ে দিতে হয় সেই ভয়ে।

যে পরিচয়ে গর্ব্ব, তাতে ভয় ?

থামো, খুব গর্ব্ব !—গর্ব্ব না, লজ্জা—কালো নিয়ে ; তাই তো এড়িয়ে যাচ্ছ।

আরও চাপা গদগদ স্বরে উত্তর হইল, আমার কালোর কাছে কোন ফরসা দাঁড়াত একবার দেখতাম—

ওঃ ! তা কেন শ্যামবাজারের টিকিট করা হচ্ছে শুনি ?

স্বর পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কঠিন বরফে তরলতা আসিয়াছে একটু। যাক, ল' কলেজের ফার্স্ট বয়, বাঙালী যুবক, সে চলতি ট্রামে উঠিতে না পারুক, কথায় যে মন ভিজাইতে পারিয়াছে, ইহাতে আশান্বিত হইলাম ; ঐ করিয়াই তো খাইবে। প্র্যাক্‌টিসও হইতেছে জজ সাহেবের চেয়ে কড়া এজলাসেই। আহা, ভাল !

যুবক সেই রকম গাঢ় স্বরে বলিল, বলব ?

শুনিই না।

আজ মীটিং-ফিটিং ভাল লাগছে না। ইচ্ছে করছে, দুজনে সব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আজকের দিনটা কাটাই। কতটুকুই বা পাই তোমায় নন্দা ?

কথাটা নিশ্চয় অন্য তরফের মর্ম্ম স্পর্শ করিল। কোন উত্তর হইল না খানিকক্ষণ। আবার আপিল হইল, কি মত তোমার ?

আমার আবার আলাদা মত আছে নাকি ? তা কোথায় কাটাবে ? সিনেমা ?

সিনেমায় কি পরস্পরকে পাওয়া যায়, নন্দু ? এদিকে কায়ার ভিড় ওদিকে ছায়ার ভিড়—বাস্তবে অবাস্তবে ওখানে অনুভূতিটাকে আধখেঁচড়া ক'রে দেয়।—তুমি থাকবে পাশে অথচ সে কথা ভুলে এক অলীক ছায়ালোকে তোমার পেছনে ঘুরব, যখন নাগাল পাব না। আমি তোমায় চাইছি, পেয়েওছি, অথচ বিরহী যক্ষের মত—

ট্রাম বউবাজারের মোড়ে দাঁড়াইল। একটু উঠানামা চলিল, পুরাতনের

স্থানে নূতনরা আসিয়া বসিল। বিশ্রম্ভালাপ একটু স্থগিত রহিল। আমি অস্ট্রিয়া অভিযানের আর একটা প্যারাগ্রাফ শেষ করিলাম। সামনে সাহেব-দম্পতির পরিত্যক্ত সিটে একটি বৃদ্ধ বাঙ্গালী ভদ্রলোক আসিয়া বসিলেন। মেয়েটি অতি সাধারণ ঔৎসুক্যের কণ্ঠে কতকটা জোরেই যুবককে প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, এপ্রিল থেকে শুনছি আমাদের ই. আই. আর. এর টাইম অনেক চেঞ্জ করবে, সত্যি নাকি ?

অর্থাৎ এই ধরনের কথাই এতক্ষণ হইতেছিল এবং পরেও হইবে ; প্রতিবেশী আমাদের অযথা ঔৎসুক্যের প্রয়োজন নাই। অস্ট্রিয়ার স্বাধীনতার লোপ সুখের না হইলেও আমায় কাগজের আড়ালে হাসিতে হইল। এরা আমাদের ভাবে কি ? অথবা আমরাও বোধ হয় এককালে এই করিয়াছি, সবাইকে এই রকমই ভাবিয়াছি—আজ আর মনে নাই। ট্রাম চলিয়া আবার শব্দ আরম্ভ হইল।

যুবক আবার নিম্নকণ্ঠে বলিল, এই ধর 'দেশবন্ধু পার্ক' কিংবা আরও দূরে দমদম এরোড্রোমের দিকে, কিংবা—

মেয়েটি উল্লসিত হইয়া উঠিল। বলিল, চল, সত্যি, চল। দমদমাই ভাল ; না, আর দ্বিধায় কাজ নেই।

আঃ, আস্তে।

বাবাঃ, ভয়েই সারা !

বলছ তো যেতে, কিন্তু হবার উপায় নেই যে !

শঙ্কিতকণ্ঠে উত্তর হইল, কেন ?

ওভারটুন হলের সামনে যতীন আর তিমির দাঁড়িয়ে থাকবে বলেছে —তোমায় অভ্যর্থনা করবে।

একটু চুপচাপ গেল। এদিকে অভ্যর্থনা, ওদিকে দমদমা। তাহার পর মেয়েটি মীমাংসার স্বরে বলিল, না, দমদমা যেতেই হবে কোন রকমে।

একটু আবদারের সুরে উত্তর হইল, আমি কিছু শুনব না—আমার মীটিং-ফিটিং একেবারে ভাল লাগছে না। বিয়ের আগে ওসব হুডুন্দুম ক'রে বেড়ানো শোভা পেত। আর এখন—

এখন দমদমায় গিয়ে উড়ে বেড়ানো!

ঠাট্টা রাখ। বুঝিলাম মুখ আবার অন্যদিকে ফিরিয়াছে!

বিমুখভাবেই উত্তর হইল,' বাবা-মা ভাগলপুর থেকে ফিরলেই বলব, তাঁরা নেই দেখে আমায় ভুজুংভাজুং দিয়ে মীটিঙে একপাল লোকের মধ্যে নিয়ে গিয়ে—

স্ত্রিয়াশ্চরিত্র! ভদ্রসন্তানকে তো বড়ই ফাঁফরে ফেলিল মেয়েটা। কিন্তু আমার হাতে তো কোন রকম উপায় ছিল না, থাকিলেই বা ট্রামের এই ক্ষণরচিত অন্তঃপুরে প্রবেশের পথ কোথায়? অধিকারই বা কি? চুপ করিয়া বসিয়া ঘটনা কি ভাবে বিকশিত হয় তাহারই অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

শানু!

ঐ যুবক ঐ মেয়েটিকেই ডাকিল। এরই মধ্যে 'নন্দা', 'নতু'; 'সুনু' আবার এই 'শানু'। টুকরা এই পাপড়িগুলির মূলপুষ্প কি—সুনন্দা? যাই হোক বড় বেদনা বোধ হইতেছিল। নামের প্রতি অক্ষরের মধ্যে যে এতটা মধু পাইয়াছে, তাহার এই বঞ্চনা।

কোন উত্তর নাই। প্রশ্ন হইল, কিন্তু এ অবস্থায় করাই বা যায় কি বল না? যা বলবে, তাই করা যাবে না হয়।

সংক্ষিপ্ত উত্তর হইল, দমদমা।

কিন্তু কি ক'রে হবে? তারা পথ আগলে রয়েছে যে।

এ পথ ছেড়ে দাও।

ঘুরে? বউবাজার দিয়ে?

একটু থামিয়া আবার করুণকণ্ঠে, কিন্তু কাণ্ডাক্টারটা জানে আমরা শ্যামবাজারের টিকিট করেছি—পাশের সব ভদ্রলোকেরাও দেখেছে শ্যামবাজারের টিকিট করতে। কি ভাববে বল তো?—উঠলেই কণ্ডাক্টার বলবে—শ্যামবাজার এখানে নয় বাবু। আর গাড়িসুদ্ধ লোক শ্যামবাজার কোথায় তা বলবার জন্যে হামড়ে উঠবে;—সঙ্গে মেয়েছেলে দেখলে উপকার করবার জন্যে কি রকম হন্যে হয়ে ওঠে সব দেখ নি তো…

সেই সংকোচপীড়িতা ব্রীড়াময়ী লেডি !

এত আপীল-উপরোধের পর আবার একটি সংক্ষিপ্ত উত্তর হইল, কণ্ডাক্‌টারকেই খুশি কর তা হ'লে।

যুবক বিপন্নভাবে একবার এদিক-ওদিক চাহিল ; অস্ফুটস্বরে বলিল, কি যে করি ! মেডিকেল কলেজ এসে পড়ল এদিকে।

আমিও উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িতেছিলাম। আদ্যোপান্ত শুনিয়া উদ্বিগ্ন না হইয়া গতি ছিল না। আহা ! আর বোধ হয় দুটো মিনিট, তাহার পরই সংসারের ভাণ্ডার থেকে অতি কষ্টে অপহৃত এই কয়টি ঘণ্টা একেবারে নিষ্ফল হইয়া যাইবে। ওদের ওভারটুন-হলে আর মন নাই। যুবকের বোধ হয় সংকোচ, কিন্তু তাহার সঙ্গিনীর মন যে সত্যই মুক্তপক্ষ হইয়া উধাও হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বাড়ির তুলনায় ওভারটুন ছিল মুক্তি, কিন্তু দমদমার কাছে তাহাই হইয়া পড়িয়াছে পিঞ্জর। দুইটি মিনিট, ওদের আজকের দিনেব চরম কথাটি এবই মধ্যে।

...কোনও উপায় নাই ?

এই সময় সামনে একটা রিকশ বাঁচাইতে ট্রামের হঠাৎ ব্রেক দেওয়ায় সবাই যেন হোঁচট খাইয়া সামনে ঝুঁকিয়া পড়িলাম। আমি কাগজসুদ্ধ যুবকটির বেঞ্চের পিঠে গিয়া পড়িলাম। নিজেকে সামলাইতে হাতের কাগজটা তাহার পাশে ছিট্‌কাইয়া পড়িল। যুবক উঠিয়া বসিয়া কাগজটা আমার হাতে তুলিয়া দিল ; একটু যেন সন্দেহের সহিত আমার চোখের দিকে একবার চকিত দৃষ্টি হানিল! আমি কাগজটা লইয়া সহজভাবে বলিলাম, থ্যাঙ্ক্‌স্।

আবার না-পড়ার পড়া সুরু হইল।

ট্রাম আবার চলিতে আরম্ভ করিল। যুবক কতকটা নিজের মনে কতকটা সঙ্গিনীকে শুনাইয়া বলিল, যদি একটা খবরের কাগজও হাতে থাকত, তা হ'লেও—

মেয়েটি গ্রীবা ঘুরাইয়া প্রশ্ন করিল, কি হ'ত তা হ'লে ?

তা হ'লে ঐ জায়গাটুকু—ওভাম্বুটুনের সামনে দু'জনে আড়াল হয়ে বসতাম—কাগজের আড়াল দিয়ে। ওরা তো আর ট্রামে উঠে দেখতে আসত না!

মনে হইল, যেন স্বামী-গরবিণী প্রশংসাদীপ্ত নেত্র তুলিয়া চাহিল।—এটা আমার নিছক কল্পনা হইতে পারে, কিন্তু এর পরের নীরবতাটুকুতে যেন এই ছবিই ফুটিয়া উঠিল। অন্তত সে যে ঘুরিয়া বসিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না আমার।

একটু পরে শুনিলাম, খবরের কাগজ তো রয়েছে

কই?

পেছনে

ধ্যাৎ, চাওয়া যায় কখন'

মেয়েটি ঘেঁসিয়া আসিল আরও নিম্নকণ্ঠে বলিল, এক উপায় ঠাউরেছি; কিন্তু তুমি যা মেয়ে-মুখো। আমি শুনিয়ে শুনিয়ে তোমায় জিগ্যেস কবি—কোয়ালেশ্যন মিনস্ট্রী ফরম্ করবার কি হ'ল বলতে পার? তুমি বলবে—না, আজকের কাগজটা মোটেই পড়া হয় নি, অথচ ভয়ানক আগ্রহ জেগে রয়েছে। তা হ'লেই ভদ্রলোক ভদ্রতা ক'রে কোন্ না কাগজটা একবার বাড়িয়ে দেবেন। আদ্দেক প'ড়ে অমৃতবাজারটা যদি না ফেলে আসতে তাড়াতাড়ি···। তা হ'লে আমি সুরু করছি (প্রকাশ্যকণ্ঠে) —আচ্ছা, কোয়ালি···। যুবক একরকম শিহরিয়া উঠিয়া তাহার বাম হাতটা চাপিয়া ধরিল, চাপা ত্রস্তস্বরে বলিল, না না না, না নন্দু, ছিঃ!

আবার সেই 'লেডি'!

ট্রাম কলেজ-স্কোয়ারের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। কি নীরব অসহায় উদ্বেগ! আমিও নিশ্চিন্ত ছিলাম না। মাথায় একটি মতলবও আসিয়াছে, কিন্তু দারুণ দ্বিধায় মনস্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। আর কিন্তু সময় নাই; এর পরের স্টপেজ একেবারে ওভাম্বুটুন-হলের সামনে।

আমি কাগজটি সীটে রাখিয়া দিয়া বেশ জানান দিয়া সাড়ম্বরে উঠিয়া

পড়িলাম। দরজার দিকে পা বাড়াইতে একটি মাড়োয়ারীভদ্রলোক বলিলেন, বাবুজী, আপনার অখ্‌বার প'ড়ে রইল যে!

আমি ঘুরিয়া দেখিলাম। পলক মাত্রের দ্বিধা, তাহার পর বিমূঢ়দৃষ্টি যুবকটিকে দেখাইয়া ভদ্রলোকটিকে বলিলাম, না, কাগজটা ওঁর; পড়তে নিয়েছিলাম।

ফল কি হইল, আর ফিরিয়া না দেখিয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িলাম।

দ্রব্যগুণ

১

বড়দিনের বাজার করিতে এটা-ওটা-সেটায় বোঝাটা বেজায় ভারী হইয়া গেল। এই দুঃখে বাজারে বড় একটা আসি না। সবার টানাটানিতে পড়িয়া কিছু কিছু করিতে বিষম হইয়া পড়ে।

সবশেষে পড়িয়াছিলাম মুদীর পাল্লায়। আমার প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের অপেক্ষা না রাখিয়াই ছোট বড় নানা রকম পুলিন্দা বাঁধিয়া ঝুড়ির ফাঁক-টাকে বুজাইয়া দিতেছিল। শেষ হইলে ঝুড়ির চারিদিক একবার ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া হাত দুইটা সশব্দে ঝাড়িয়া বলিল, এই কপির পাশটা খালি রয়েছে—বাঃ, কপি বটে একখানি! জিনিস কেনেন তো শৈলেনবাবু! সেই কাপড়-কাচা সাবান একটা বের কর্ তো রে।

বলিলাম, সাবান আর চাই না এখন।

নাঃ, চাই না! বড়দিন—ব'লে বসলেন কিনা কাপড়-কাচা সাবান চাই না! হাসালেন আপনি!

সত্যই কিছু হাসির কথা হইল নাকি? নিজের নিকট সংশয়ের উত্তর না পাইয়া চুপ করিয়া গেলাম। একটা হাতখানেকেরও উপর চৌকা সাবান বাহির হইল।

বাচ্চা চাকর ছোঁড়াটা একটু দূরে অশ্বত্থতলায় হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজিয়া এক-একবার পরিবর্দ্ধমান মোটটার পানে আড়চোখে চাহিয়া অসহায়ভাবে ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছিল। সাবানটা গুঁজিতে দেখিয়া ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, বাপরে, হামরা জান লে লি সব!

মুদী ঘুরিয়া বলিল, একটা সাবানের ভরে অমনই তোর জান চ'লে যাবে?

তাড়াতাড়ি তাহার হাতে দুইটা পয়সা গুঁজিয়া দিয়া বলিল, নেঃ, পুরনো খদ্দের বাবু—লাভ তো নিতে পারলামই না, উলটে ট্যাঁক থেকে দুটো পয়সা—তা হোক গিয়ে, বাবুর চাকর তুই, খুশি থাক্।

যাহারা পরার্থে প্রাণ দান করে, তাহাদের মত মহৎ ঔদাসীন্যের সহিত ছোঁড়াটার মাথায় মোটটা তুলিয়া দিল। সে ডান হাতে চোখ মুছিতে মুছিতে বাড়িমুখো হইতে বলিলাম, দাঁড়া একটু, এই বোতল দুটো হাতে ঝুলিয়ে নে।

পাজি তাড়াতাড়ি দুই-একবার টলমল করিয়া ডান হাতটাও ঝুড়িতে লাগাইয়া নাকী সুরে বলিল, দুনো হাত তো বঝল বা—অর্থাৎ দুটো হাতই তো জোড়া।

রাগে গা-টা রি-রি করিয়া উঠিল; কিন্তু চটাইতে গেলে আবার টলিতে পারে—চাই কি আরও জোরে টলিতে পারে, এই আশঙ্কায় আর আপাতত কিছু বলিলাম না।

নিরুপায় হইয়া ছড়িটা কাঁখে চাপিয়া বোতল দুইটা দুই হাতে তুলিয়া লইলাম। কিন্তু কয়েক পা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা অস্বস্তিকর ভাব যেন বোতল দুইটার মসৃণ অঙ্গ বাহিয়া, আমার হাত দুইখানা বাহিয়া আমার সমস্ত শরীরটা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। কেমন যেন মনে হইল, এ ঠিক হইতেছে না—সন্ধ্যার এই গা-ঢাকা অন্ধকারে দুই হাতে দুইটা বোতল, বগলে ছড়ি,—এ যেন কি-রকম বলিয়া বোধ হয়! বাজারের সব লোকের চোখের মধ্য দিয়া নিজের দিকে চাহিলাম। এ কি হইয়া গিয়াছি! মনটা যেন নিজের প্রতি নিজেই ইয়ারকির ঢঙে বলিয়া উঠিল, আরে, কে ও! কোত্থেকে?

ছড়িটা বোতলের সঙ্গে ডান হাতে লইলাম, দৃশ্যটা কিন্তু বেশ শোধরাইল বলিয়া বোধ হইল না। তখন দুইটা বোতলই বাম কাঁখে পুরিলাম, ডান হাতে ছড়ি। এ যেন আরও মারাত্মক হইয়া উঠিল। মাথা ক্রমেই গুলাইয়া আসিতেছিল। ব্যাপারটা জড়াইয়া লইলাম, ঠিক সেই সময় পিছনে গা ঘেঁষিয়া একটা লোক চলিয়া যাওয়ায় বোতল-জোড়ায় একটু ঠোকাঠুকি হইয়া একটা প্রচ্ছন্ন তরল শব্দ হইল। মনে হইল, যেন

ব্যাপারের মধ্যে আত্মগোপন করিতে গিয়া অপরাধী হীনচরিত্র বোতল দুইটি হাটের মাঝখানে জাহির হইয়া গেল।

আমি ঘামিয়া উঠিতেছিলাম, চাকর ছোঁড়াটার তাগাদায় হুঁশ হইল। ভাবিলাম, আচ্ছা দুর্ব্বলচিত্ত লোক তো আমি! একটা শরবতের খালি বোতল আর একটা ফেনাইলের বোতল রাস্তা দিয়া বেপরোয়াভাবে লইয়া যাইবার সৎসাহসটুকু নাই? অন্ধকার? তাহা হইলে কোন সাধু ব্যক্তিই অন্ধকারে আর নিজের গৃহস্থালীর কাজ করিবে না? শিশি কিংবা বোতল না হইলে একদণ্ড চলে?

বেশ স্বচ্ছন্দভাবে বোতল দুইটার লেবেল সামনে করিয়া দুই হাতে ধরিলাম এবং সমস্ত জড়তা দূর করিয়া মুখে একটা সহজ প্রসন্নতার ভাব ফুটাইয়া তুলিলাম।

একটুর মধ্যেই বুঝিতে পারিলাম, অত প্রসন্নতার ভাবটা ফুটাইয়া তোলা সমীচীন হয় নাই। বাজারের নীচেই বিদ্যুতালোকিত প্রশস্ত চৌমাথা রাস্তা, সেখানে নামিয়া অবিলম্বেই টের পাওয়া গেল যে, এই পাপ-পৃথিবীতে এমন লোকের অভাব নাই, যাহারা চাকরের মাথায় ভোজের গুরু আয়োজন এবং মনিবের হাতে বোতল এবং তৎসঙ্গে প্রচুর প্রসন্নতার ভাব দেখিলে একেবারে উলটা রকম মীমাংসা করিয়া বসে।

একজন আড়চোখে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি হানিয়া গেল। আর একটু যাইতে এক ছোকরা তাহার বন্ধুর গা ঠেলিয়া আমায় দেখাইয়া দিল। একটু দূরে পানের দোকানের সামনে কয়েকজন হিন্দুস্থানী দাঁড়াইয়া জটলা করিতেছিল, একজন সকলের দৃষ্টি আমার দিকে আকর্ষণ করিয়া মাথা দুলাইয়া বলিল, আলবৎ বড়দিন হ্যায় ইয়ার; বড়ে খুশ-মেজাজমে হ্যাঁয়!

ইচ্ছা হইল, ব্যাটার মাথার উপর বোতল দুইটা আছড়াইয়া প্রমাণ করিয়া দিই যে, তাহার মধ্যে এমন কিছু ব্যাপার নাই, যাহাতে তাহাদের অর্থে খুশ-মেজাজ হইবার সম্ভাবনা আছে। কোন রকমে রাগটা চাপিয়া চৌমাথাটা ছাড়াইয়া গেলাম। মুখের প্রসন্ন ভাবটা টানিয়া রাখা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হইল না; বেশ সহজে মিলাইয়াও গিয়াছিল। বোতল দুইটা কিন্তু সেই ভাবেই রহিল। দুর্ব্বল মনের সঙ্গে যে তর্কটা

হইতে লাগিল, তাহাতে এই কথাটাই আমি ধরিয়া রহিলাম—কেন, আমার ভিতরে যখন কোন রকম কু নাই, বিশেষ করিয়া যখন বোতলের ভিতরেও কোন রকম কু নাই, তখন ভয় পাইতে যাইব কেন? কাল এই সময় এই পথ দিয়াই এক হাতে একটা পশমের বাণ্ডিল আর অন্য হাতে সাবানের বাক্স লইয়া গিয়াছি। তফাতটা কি হইল এমন? আমায় যাহারা চেনে না, তাহারা যা ইচ্ছা মনে করুক—চেনে যাহারা, তাহারা তো আর—

. চেনা লোকের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হইয়াও গেল, আর বেশ ভাল লোকের সঙ্গেই। করুণাময়বাবু, জেলা-বোর্ডের আপিসে কাজ করেন। বয়স হইয়াছে, অথচ খুব আমুদে আর মিশুক। এইজন্য, আর তাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের জন্য সবাই চায় তাঁহাকে। ' বেহারে চার পুরুষ আছেন, —এইটি প্রয়োজনভেদে কখনও সগৌরবে, কখনও বা দুঃখের সহিত জাহির করিবার একটি বাতিক আছে; ভাষার মধ্য দিয়াও বেহার মাঝে মাঝে উঁকি মারে।

একটু দূর হইতেই দুই হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া একগাল হাসিয়া বলিলেন, এই যে শৈলেনবাবু, ভাল তো? আরে, এ যে বড়্কা ভোজের আয়োজন! কি কপি মশায়! বেহারে চার পুস্ত্ কেটে গেল, কিন্তু এমন কপি তো দেখি নি—বাঃ, সঙ্গ নোব নাকি?

একটু কম দেখেন, কাছে আসিতে বোতল দুইটিতে নজর পড়িল। আমি হাসিয়া উত্তর দিতে যাইতেছিলাম, তাঁহার মুখের হঠাৎ নিষ্প্রভ ভাব দেখিয়া আর রা সরিল না। কুণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, ও দুটো—?

আমি একটা ঢোক গিলিয়া হাসির সঙ্গে সহজভাবে বলিবার চেষ্টা করিলাম, কিছু নয়। বোতল দুটো,—একটাতে ফেনাইল আছে, একটা খালি, নারকোল-তেল রাখবার জন্যে কিনে নিয়ে—

করুণাবাবু খুব আগ্রহের সহিত এবং অতি সহজে বিশ্বাস করিয়া লইলেন; আমাকে কথা শেষ করিতে না দিয়াই বলিলেন, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই—সে কি কথা, রাম কহো—ঐ তো সাফ লেখা রয়েছে, 'ফেনাইল'; আমি

কানা মানুষ পড়তে পারছি, আর কার সন্দেহ হবে ? ছি ছি, সে কথা ভাবতে আছে ?

শীতেও আমার কপালে ঘাম জমিয়া উঠিতেছিল। অনেক কষ্টে কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিলাম, হ্যাঁ, সঙ্গ নেবেন বললেন, চলুন না, আজ বড়দিনের রাতটা পাঁচজনে একসঙ্গে ব'সে একটু আমোদ-প্রমোদ—

হঠাৎ চমক ভাঙিল, ভাষা আমায় এ কোন্ দিকে লইয়া যাইতেছে ? সামলাইয়া লইয়া বলিলাম, আজ আপনার মত আমুদে-আহ্লাদে লোকই তো—

আরও সাংঘাতিক হইয়া যায় দেখিয়া থামিয়া তাঁহার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া আন্তরিকতা ও সৌজন্যের হাসি হাসিবার চেষ্টা করিলাম এবং বেশ অনুভব করিলাম, সেটা মৃতের হাসির মত মুখটাকে বিকৃত করিয়া তুলিয়াছে মাত্র।

করুণাবাবুও কেমন এক অপ্রতিভ হাসি হাসিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, না, আমি আজ্ আসছি, আমায় আজ মাফ করবেন। যেতুম নিশ্চয়, আপনার বাড়ি যাব, তাতে আর—তবে কথা হচ্ছে, কি রক্কম শীত পড়েছে দেখেছেন ? বেহারে চার পুস্ত কেটে গেল মশায়, কিন্তু এবারের মত শীত—একেবারে যাকে বলে ঠাড়—

বলিলাম, শীতেই তো বড়দিনের খাওয়া-দাওয়ার জুত বেশি করুণা-বাবু, একটু গান-বাজনার বন্দোবস্তও করেছি। যখন পাওয়া গেছে ভাগ্যক্রমে আপনাকে, তখন আর—

করুণাবাবুর চোখ দুইটা আর একবার বোতলের উপর গিয়া পড়িল, তাহার পর নাছোড়বান্দা মাতালের হাতে পড়িলে লোকে যেমন বিব্রত হইয়া পড়ে, অনেকটা সেই ভাবে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, না না শৈলেনবাবু, শীত এমনই কথায় বলছিলাম। চার পুস্ত বেহারের জান-নেকলানো শীতের মধ্য দিয়ে কেটে গেল, আর এ তো সামান্য। একটা কাজ আছে এই দিকে—আচ্ছা, তবে আসি।

হঠাৎ নমস্কার কারয়া হনহন করিয়া চলিয়া গেলেন।

নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। এ কি বিষম ফাঁফরে পড়া গেল! আমি যেন অপরিচিত একজন কে! এই দশ মিনিট পূর্ব্বে যে আমি ছিলাম, যেন সে নয়। বোতল দুইটার পানে চাহিলাম; ইচ্ছা হইল, সামনের লোহার পোস্টে ঘা দিয়া চূর্ণ করিয়া ফেলি।—এই হতভাগা দুইটার জন্য নিতান্ত সহজ সাদা কথা যাহা বলিয়াছি, তাহারও মানে এক ধার হইতে বিগড়াইয়া গিয়াছে।

ছোঁড়াটাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হ্যাঁ রে পুনিয়া, পোঁটলার মধ্যে গুঁজে গাঁজে দিলে বোতল দুটো নিয়ে যেতে পারবি নি?

বলিল, কাহে না? উতার দিঁ মোটরিঠো।—অর্থাৎ কেন পারব না? মোটটা নামাইয়া দাও।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া তাড়াতাড়ি মোটটা নামাইয়া দিলাম। পুনিয়া ঘাড়ে গোটা তিন-চার ঝাঁকানি দিয়া এবং হাত দুইটা কয়েকবার ঝাড়িয়া দুই-তিনবার পায়চারি করিয়া লইল।

রাস্তার ধারে মোটটা নামাইতেই গোটাকতক চ্যাংড়া জুটিয়া হাজার রকম আন্দাজ করিয়া তর্কবিতর্ক জুড়িয়া দিল। একটা বলিল, সাদি হ্যায়।—মানে; বিয়ে আছে।

একটা বলিল, কভি নেহি, বাঙ্গালীলোক সাদিমে দারু পীতা নহি হ্যায়।—বলিয়া ইশারা করিয়া বোতলের দিকে দেখাইয়া দিল।

ভাগো হারামজাদা সব।—বলিয়া খেদাইয়া দিয়া বোতল দুইটা গুঁজিবার জন্য একটা পোঁটলার গেরো খুলিতেই চাকরটা নাকি সুরে বলিয়া উঠিল, মোটরি গিরেসে হাম্‌নিকে না কহব।

চোখ তুলিয়া বিস্মিতভাবে কহিলাম, মোট প'ড়ে গেলে তোকে কিছু বলতে পারব না? বটে! এই দুটো বোতলের চাপেই তোর মোট প'ড়ে যাবে? বেয়াকুব পেয়েছিস আমায়?

তাহার পর আমার কাছে উপর-চাল দিয়া, খানিকটা ও-রকম আরাম করিয়া লইবার জন্য অত্যন্ত রাগ হওয়ায় বোতল দুইটি জবরদস্তি পোঁটলার মধ্যে ঠুসিতে ঠুসিতে বলিলাম, ফেল্ পুঁটলি তোর যদি সাহস থাকে, বেটা হারামজাদা কোথাকার! যত কিছু বলি না—

বোতল বহাইতামই, সেও কিছু ফেলিতে সাহস করিত না, আর এইখানেই আমার বোতল-বিড়ম্বনার অবসানও হইত; কিন্তু ঠিক এই মোহড়ায় হঠাৎ অনাথ আসিয়া আমার 'মর‍্যাল কারেজ'—কিনা সৎসাহসে উৎসাহিত করিবার জন্য একেবারে মরণবাঁচন জিদ করিয়া পড়িল।

২

অনাথের সঙ্গে আজিকার পরিচয় নয়,—সে আমার বাল্যবন্ধু। তাহার কথা মনে হইলেই সঙ্গে সঙ্গে খুব ছেলেবেলার একটি দৃশ্য চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে। রেলের পুলের নীচে দুই পা ফাঁক করিয়া, বুক চিতাইয়া অনাথ নাকের মধ্য দিয়া দুইটি সিরেট-গোছের ধোঁয়ার স্রোত ছাড়িতেছে; ডান হাতে একটি দগ্ধপ্রান্ত সিগারেট, সামনে আমরা হাঁ করিয়া সপ্রশংস বিস্ময়ে চাহিয়া আছি।

এণ্ট্রাস ক্লাস পর্য্যন্ত একসঙ্গে ছিলাম, তাহার পর কে কোথায় ছিটকাইয়া পড়ি। আবার কালের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে আমরা দুইজনে এক জায়গায় আসিয়া পড়িয়াছি—অনাথের পক্ষে সুরার স্রোতেও বলা চলে। শুনা যায়, একদিন নাকি খুব গুলজার আড্ডা হইতে রাত করিয়া টলিতে টলিতে ফিরিবার সময় তাহার মনে এই কথাটা হঠাৎ গাঁথিয়া যায় যে, টাকাই যত অনর্থের মূল। মাহিনার টাকাটা পকেটে ছিল। কোন রকমে পাপ বিদায় করিবার জন্য সে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া উঠিল। কিছু স্টেশনের হোটেলে দিল; দিয়া সদ্য-বৈরাগ্যের তাড়নায় ৺পুরীধামের একখানি টিকিট কাটিয়া ফেলিল। তাহার পর দেরাদুন এক্সপ্রেসে চড়িয়া কেমন করিয়া পাটনার গঙ্গা পার হইয়া একেবারে এখানে—মজঃফরপুরে। তাহারই মুখে শোনা গল্প। বলে, ভাই, ভুলটা বুঝতে পেরে সারাদিন সারারাত যতই গাড়ি বদলাতে যাই, যতই আঁকুপাঁকু করি, ততই দেখি, উল্টো পথে চলেছি। রেলগাড়িকে কখনও বিশ্বাস করিস নি শৈলেন; তবে এ একটা কথা, মহাপ্রভু রথের কাছি দিয়ে না টানলে তো হবার জো নেই কিনা!

এখানে এক জমিদার-জহুরী এই মানিকটিকে চিনিতে পারিয়া মাথার মণি করিয়া রাখিয়াছেন। অনাথ বলে, যাক ভাই, নেপালের পশুপতি-নাথের খুব কাছেই রইলাম, বুড়ো একটা ডাক দিলেই গাড়িতে গিয়ে উঠব।

একটা বোতল পোঁটলায় পুরিয়া আর একটা তুলিয়াছি, অনাথ আসিয়া সামনে দাঁড়াইল। পা দুইটা একটু একটু টলিতেছে, চক্ষু অর্দ্ধনিমীলিত। গাঢ় জড়িতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের শৈলেন না? ব্যাপার কি রাজা?

বলিলাম, অনাথ যে! ব্যাপার কিছু নয়, দুটো বোতল ছোঁড়াকে নিয়ে যেতে বলছি, তা নানান রকম ছুতো লাগিয়েছে, তাই—

চক্ষু দুইটিকে যথাসম্ভব বিস্ফারিত করিয়া অনাথ বলিল, বোতল! দুটো বোতল! কবে থেকে তোর এ সুমতি—

চাকরটা বোধ হয় তাহার মনিবের মান বাঁচাইবার জন্য বলিল, ফিনাইল তো বা।

অনাথ আমার পানে চাহিয়া একটু মুচকিয়া হাসিল, তাহার পর কৃত্রিম রাগের সহিত চাকরটাকে ধমক দিয়া বলিল, ফেনাইল নেহি তো ক্যা রহেগা? হাম জানতা নেহি? আলবৎ ফেনাইল হ্যায়। চোপ রও।

তাহার পর আমার প্লান তাহার বুঝিতে বাকি নাই, আর সে চাকরের কাছে ফাঁস করিবার ছেলে নয়—চতুর দৃষ্টিতে আমায় এই কথা জানাইয়া প্রশ্ন করিল, আর এই শরবতের বোতলটা—এতে দিশী শরবৎ, না বিলিতী শরবৎ ভাই—স্মিত হাস্যে চাহিয়া ঈষৎ টলিতে লাগিল।

বিরক্ত হইয়া বলিলাম, আঃ, কি পাগলামি করিস। এই দেখ না বাপু, কি রকম বিলিতী শরবৎ নিয়ে যাচ্ছি।—বলিয়া খালি বোতলটা উল্টাইয়া দেখাইতে যাইব, অনাথ খপ করিয়া হাতটা ধরিয়া বলিল, আমি তোকে অবিশ্বাস করতে পারি শৈলেন? তোকে আজ দেখছি?

বিব্রত হইয়া বলিলাম, তা হ'লে পথ ছাড়, এখন যাই, রাস্তার মাঝে একটা হৈ-চৈ করিস নি।

অনাথ আমার ডান হাতটা দুই মুঠায় ধরিয়া হঠাৎ কাঁদ কাঁদ হইয়া সুরাদ্রব আবেগের সরু মোটা নানান স্বরে বলিল, ছাড়ছি পথ। আর কখনও তোমার পথ আগলে দাঁড়াব না, কিন্তু আজ প্রাণে যে কি চোট দিলি শৈলেন—ও-ফ!

কি গেরো! আজ কাহার মুখ দেখিয়া যাত্রা করিয়াছিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, দেখ দিকিন! কি আবার চোট দিলাম প্রাণে তোর?

অনাথ 'ও-ফ' করিয়া আর একটা বুকভাঙা শব্দ করিয়া গদ্গদস্বরে বলিল, আজ অনাথ এতই পর হ'ল? ধরেছিস তো তাকেও লুকোতে হয়?

বলিলাম, ভ্যালা বিপদ! পর হতে যাবি কেন? কিন্তু ধরেছি তোকে কে বললে?

অনাথ অভিমানভরে বলিল, কেউ না। তুই নিজেই যখন লুকোচ্ছিস তো অন্য আর কে বলতে যাবে ভাই?

বলিলাম, কি আশ্চর্য! লুকোবার কোনও কথাই নেই তো লুকোতে যাব কেন?

আমার হাত দুইটা চাপিয়া ধরিয়া অনাথ বলিল, এই কথাই তো শুনতে চাই ভাই। আমার কাছে—তোর সেই ছেলেবেলার অনাথের কাছে এ কোন্ একটা লুকোবার কথা শৈলেন?

এ কি ভাষার প্যাঁচে পড়া গেল মাতালের হাতে! এখন ইহাকে বুঝাই কি করিয়া? এর মুখ দিয়াই কথাটার জট খুলিয়া লইবার জন্য প্রশ্ন করিলাম, কি কোন্ একটা লুকোবার কথা বলছিস বল্ দিকিন?

যেটা লুকোচ্ছিলি।

কিছুই তো লুকোই নি; তুই বিশ্বাস না করলে কি করব?

বিশ্বাস তো করেছি ভাই।

অনেকটা আশান্বিত হইয়া বলিলাম, কি বিশ্বাস করেছিস বল্ তো?

যা আর লুকোচ্ছিস না।

একেবারে হতাশ হইয়া গেলাম। আপাতত নিস্তার পাইবার জন্য

বলিলাম, এমন ফ্যাসাদে মনিষ্যি পড়ে! আচ্ছা ভাই, স্বীকার করছি, ধরেছি ; এখন পথ ছাড়, দেরি হয়ে যাচ্ছে। ঐ দেখ, চাকরটা আবার মোড়লি ক'রে ছোঁড়াগুলোর সামনে পরিচয় দিতে লেগেছে। পুনিয়া, এদিকে আয় হারামজাদা।

অনাথের কাঁদ-কাঁদ ভাবটা যেমন হঠাৎ আসিয়াছিল, তেমনই হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া গেল। আমার হাতটা ছাড়িয়া সিধা হইয়া দাঁড়াইল এবং আমার মুখের উপর সুরালস চক্ষু দুইটি খানিকক্ষণ নিবদ্ধ করিয়া গম্ভীর ভাবে কহিল, ছাড়ছি পথ ; তোমার পথ রোখবার আমি কে? শুধু একটি কথা জিজ্ঞেস করব, দয়া ক'রে উত্তর দেবে কি ভাই শৈলেন?

এ আর এক ভাব! অত দুঃখেও হাসি রুখিতে পারিলাম না ; বলিলাম, না দয়া করলে তো উদ্ধার নেই, বল।

আমরা না স্বরাজ চাই?

উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া উত্তর করিলাম, তা চাই বইকি।

আর এমন মর‍্যাল কারেজ নেই যে, রাস্তা দিয়ে নিজের জিনিস দুটো বুক ফুলিয়ে হাতে লটকে নিয়ে যাব! ধিক, কোন মুখে আমরা—

রাগ সামলাইতে পারিলাম না ; বিশেষ করিয়া এই জাতীয় একজনের উপর ঝাল ঝাড়িবার দরকারও ছিল ; বলিলাম, দোষ কি? জিনিসটা তোমাদের হাতে প'ড়ে এমন সুযশ লাভ করেছে যে, একটু আবছায়া হ'লে গঙ্গাজল ভর্ত্তি ক'রে নিয়ে যেতেও পা ওঠে না। এইটুকু আসতে যে কি দুর্ভোগ হয়েছে!

অনাথ ত্রিভঙ্গ হইয়া টলিতে টলিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, দুর্ভোগ! এই আমি বোতল নিয়ে যাচ্ছি, একটি কথা যে বলবে, তার দু সারি দাঁতের ওপর এই দুগাছি বোতল ভাঙব।

একটা মতলব ঠাহর করিলাম। নিম্ন হইয়া কহিলাম, হ্যাঁ, তা হ'লে আর দুর্ভোগের মোটেই ভয় থাকে না। কিন্তু তোর অত হাঙ্গাম ক'রে কাজ কি অনাথ? আমি এইটুকু পথ কাটিয়ে যাব'খন। তোকে দেখেই বোধ হচ্ছে, যেন বিশেষ একটা দরকারী কাজে যাচ্ছিস ; তোকে আর আটকে রাখতে চাই না।

দরকারী কাজের কথায় অনাথের মনটা যেন একটু ভিজিল ; ভারিক্কে হইয়া বলিল, দরকারী ! এত দরকারী যে—

ঔষধ ধরিয়াছে আশা করিয়া তাড়াতাড়ি তাহার পিঠে হাত দিয়া বলিলাম, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমায় বলতে হবে না, আমি বুঝি না ? তা হ'লে আয় গিয়ে। নে পুনিয়া, তোল্।

পুনিয়া পা বাড়াইতেই অনাথ হাত উঠাইয়া তাহাকে বারণ করিল। আমার পানে চাহিয়া বলিল, কিন্তু খুব দরকারী ব'লেই আরও যাব না ; তা না হ'লে আর স্যাক্রিফাইস হ'ল কি ? আমি মর্যাল কারেজের জন্যে আজ সব দরকারী কাজ ত্যাগ করতে চাই, এই দরকারী জীবনটা পর্য্যন্ত।

বুদ্ধিমান মাতালের উপর বেশি রাগ ধরে ; ও যে আমার কথাটাই এ রকম কাজে লাগাইবে, তাহা ভাবি নাই। বিরক্ত হইয়া বলিলাম, নে ছাড়, রাস্তার মাঝখানে একটা কেলেঙ্কারি—

চাকরটাকে ধমকাইয়া বলিলাম, আয় না বেটা বদমাইস, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছে তখন থেকে !

অনাথ বোতল দুইটা বগলে করিয়া রাস্তায় বসিয়া পড়িল। বলিল, সত্যাগ্রহ করলাম—আমি গান্ধীর চেলা, মাড়িয়ে যাও।

বোতল দুইটা হাতের মুঠায় চাপিয়া ধরিয়া বলিল, জান যায়, তবভি নিমক নেহি দেগা।

বেশ ভিড় দাঁড়াইয়া গিয়াছে ; এমন কি একটা ঝালচানাওয়ালা তাহার খঞ্চে নামাইয়া বেশ দুই পয়সা করিয়া লইতেছে। নানা রকম টিপ্পনী, পরামর্শ, উৎসাহবাণী।

লজ্জায় অপমানে আমি সত্যই ধৈর্য্য হারাইতেছিলাম। অনাথ বোধ হয় সেটা একটু একটু বুঝিল। বলিল, আচ্ছা, এস, রফা করা যাক—গান্ধী-আরউইন প্যাক্ট। হয় আমায় নিয়ে যেতে দাও, না হয় তুমি বুক ফুলিয়ে নিয়ে যাও—ইস মাফিক। চাকরকে দিতে পারবে না, আমি চাই মর্যাল কারেজ—নিজের মাল নিজে নিয়ে যাব, তার আবার—

তাড়াতাড়ি বলিলাম, আচ্ছা দে, আমিই নিয়ে যাচ্ছি।—বলিয়া

বোতল দুইটা তাহার হস্ত হইতে লইলাম, এবং এই সুযোগ হারাইবার ভয়ে তাড়াতাড়ি চাকরটার মাথায় মোটটা তুলিয়া দিয়া দ্রুত পা চালাইয়া দিলাম।

কানে গেল, অনাথ সমবেত দর্শকদের বুঝাইতেছে, হামরা লঙ্গোটিয়া ইয়ার হ্যায়, নয়া শুরু কিয়া—ডরতা হ্যায়।

ইহার পর কলেজের এক দল ছাত্র রাস্তায় পড়ে। তাহাদের অনেকেই আমার সহিত পরিচিত। কিন্তু হঠাৎ তাহাদের ভাবপরিবর্ত্তন দেখিয়া মনে হইল, তাহারা যেন আমার যথেষ্ট পরিচয় এতদিন পর্য্যন্ত পায় নাই বলিয়া ঠাহর করিয়া ফেলিয়াছে।

ভাবিতে ভাবিতে বাড়ি ফিরিলাম, আচ্ছা অভিশপ্ত জিনিস তো! সূর্য্যাস্তের পরে যেন মানেই বদলাইয়া যায়; তখন সঙ্গে লইয়া আর রাস্তা চলিবার জো নাই।

প্রসন্ন মুখে চলিলে বলিবে, ফুর্ত্তি আর ধরে না; লজ্জিতভাবে চলিলে বলিবে, এখনও আনাড়ী; যদি সহজভাবে চল, বলিবে, বোঝে কার সাধ্য, একেবারে ঝানু; খোলাখুলি লইয়া গেলে বলিবে, ঘাগী, বেপরোয়া; একটু পর্দ্দার মধ্যে লইয়া গেলে বলিবে, চোখে ধুলো দিচ্ছে; রাগিলে বলিবে, বেহেড; না রাগিলে বলিবে, পাঁড়, বেমালুম হজম ক'রে ফেলেছে।

সবচেয়ে বিপদের কথা এই যে, বুঝাইতে গেলে এত গভীর বিশ্বাসে এবং এত সহজে বুঝিয়া বসিবে যে, প্রমাণ দিয়া যে ধারণাটা মন হইতে একেবারে নির্ম্মূল করিব, তাহার অবসরই পাওয়া যাইবে না।

বলা বাহুল্য, অত আড়ম্বর করিয়া বাজার করাই সার হইল; মনের সে অবস্থায় আর বড়দিন জমিতে পাইল না।

সমস্ত রাত ভাল ঘুমও হইল না। কেবল এলোমেলো স্বপ্ন—বোতলগুলার যেন হাত-পা গজাইয়াছে, তাহাদের নানা ভঙ্গিতে নাচ, এদিকে গৃহস্থালির বাকি তৈজসপত্র যে অতবড় মীটিং করিয়া তাহাদের হুঁকা তামাক বন্ধ করিয়া জাতে ঠেলিল, স্ফূর্ত্তির চোটে সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নাই। স্বপ্নের না আছে মাথা, না আছে মুণ্ড।

৩

পরদিন সকাল হইতেই ইহার জের চলিল, এবং সমস্ত দিন মনে হইল, সবাই অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ আপাতত মুলতুবি রাখিয়া আমার চরিত্র-সংশোধনের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছে।

সকালেই প্রতিবেশী বৃদ্ধ প্রসন্নবাবু লাঠি হাতে ঠুকঠুক করিয়া হাজির হইলেন। আমতা আমতা করিয়া কথাটি পাড়িলেন, শুনলাম নাকি কাল রাত্রে তুমি--

আমি কথাটা কাড়িয়া লইয়া মুখের দিকে চাহিয়া উত্তর দিতে যাইতেছিলাম, তিনি নিজেই মাথা নাড়িয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন, না না, আমায় সে বলতে হবে না; আমি কি তোমায় জানি না যে, লোকের কথায় বিশ্বাস ক'রে বসব? হেঁ-হেঁ—তবে কথা হচ্ছে, কাজ কি ও বিলিতী ফেনাইল-টেনাইলে—দিব্যি শুদ্ধ গোবরজল রয়েছে—

আমি শেষ কথাটার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া মুখ তুলিতেই একটু হাসিয়া বলিলেন, বুড়ো সেকেলে লোক আমরা, একটু হেঁয়ালিতেই কথা কওয়া অভ্যেস—তা তুমি বুঝবে বইকি। তা ঐ যা বললাম বাবা, শরীর-টরীর একটু খারাপ রইল নেহাৎ, এক দলা সিদ্ধি চালিয়ে দিলে—দিশী শুদ্ধ জিনিস, শিবের ভোগে লাগে। আর ওসব? নাঃ, ছি ছি! ও বোতল-টোতলের ধার দিয়েও যেও না। একটা বিশেষ কাজ ছিল যদু ডাক্তারের কাছে, তা ভাবলাম, আগে শৈলেনের সঙ্গে দেখাটাই ক'রে যাই—ছেলেমানুষ, উঠতি বয়সে—

প্রসাদের ঔষধের দোকানে একটা কাজ ছিল। যাইতেই বলিল, হ্যাঁরে, কাল কি কাণ্ড করেছিস? করুণাবাবু মুখ গম্ভীর ক'রে ক্রমাগত ব'লে বেড়াচ্ছে, বেহারে চারপুরুষ হয়ে গেল মশায়, এমন চাপা মাতাল তো একটাও চোখে পড়ল না!

বিরক্তভাবে চাহিতে বলিল, বিশ্রী রকম ঠাণ্ডা পড়েছে, যদি শরীর

খারাপ হয়েছিল তো আমায় বললেই হ'ত, একটা মেডিসিন ডোজ দিয়ে দিতাম। এই আমিই তো কখনও কখনও—তোমার গিয়ে, শরীর-টরির ম্যাজম্যাজ করলে—

মনটা তিক্ত হইয়া উঠিতেছিল, মরিয়া হইয়া গম্ভীরভাবে বলিলাম, আমার আর মেডিসিন ডোজে পোষায় না।

অফিসে বড়বাবু বলিলেন, ছিঃ, শৈলেনবাবু, এখন এই গান্ধীর যুগে কোথায় লোক ছাড়ছে ; আপনি এতদিন মতিস্থির রেখে—

মতিস্থির আর রইল না মশাই।—বলিয়া মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেলাম।

কথাটা এক হিসাবে ঠিকই ছিল। কাল সন্ধ্যা হইতে যা অবস্থা চলিয়াছে, ইহাতে মতিস্থির থাকা দুষ্কর। অন্যে পরে কা কথা, এমন কি অনাথ পর্য্যন্ত আমার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছে। দেখা করিয়া আগ্রহভরে কহিল, না, তোকে ছাড়তেই হবে। এ যে কি পাপ জিনিস! আর একবার যদি ধরেছিস তো হাজার চেষ্টা ক'রেও আর ছাড়তে পারবি নি।

আমি বলিলাম, কাল লাল-চোখে না হয় বিশ্বাস করতে পারিস নি ; কিন্তু আজ সাদা চোখে কেন বিশ্বাস করতে চাইছিস না যে, আমি ধরি নি?

সেই কথাই তো বলছি, সাদা-চোখে তো আর ভুল হবে না। কিন্তু যাক, আর ধরিস নি, মাইরি।

ওর সেই গোলমেলে তর্ক। উত্যক্ত হইয়া বলিলাম, না ছাড়তে আমি পারব না। যা, আর ত্যক্ত করিস নি!

মনটা লজ্জা, রাগ, বিরক্তি প্রভৃতি নানান খানায় এমন খিঁচড়াইয়া রহিল যে, বিকালবেলায় আর বাহির হইতে ইচ্ছা হইল না। বলা বাহুল্য, তাহাতে ফল ভাল হইল না ; কেন না, আমার দরদীর দল কাল্পনিক মূর্ত্তিতে আমার শূন্য মনের মধ্যে আসিয়াই ভিড় জমাইলেন, এবং তাঁহাদের সঙ্গে মানসিক দ্বন্দ্বে আমার মাথাটা পর্য্যন্ত একেবারে উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। ভাবিলাম, এ কাজের কথা নয়, মাঠের দিকে গিয়া মাথায় একটু পরিষ্কার হাওয়া লাগানো দরকার। পাগল করিয়া দিবে নাকি!

হায়, সন্দেহও করি নাই যে, শেষ চোপটি, আর সবচেয়ে মোক্ষম চোপটি তখনও বাকি, আর তাহা বাড়ির বাহিরেই আমার মস্তকের প্রতীক্ষায় উদ্যত হইয়া রহিয়াছে।

জুতা জামা পরিয়া বাহির হইতেই দেখি, খদ্দর আর গান্ধীটুপি পরিহিত কতকগুলি ছেলের একটি মাঝারি-গোছের দল দুয়ারগোড়ায় দাঁড়াইয়া; কালকের কয়েকজন কলেজের ছেলেও তাহাদের মধ্যে। দেখা হইতেই অত্যন্ত বিনীতভাবে সবাই কপালে যুক্তকর ঠেকাইয়া অভিনন্দন করিল।

অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিতে যাইতেছিলাম, পূর্ব্বাহ্নেই জাতীয়-পতাকাধারী একটি যুবক অগ্রসর হইয়া আর একটি অধিকতর বিনীত অভিবাদন করিয়া বলিল, আমাদেব কর্ত্তব্য অতি কঠিন, মাফ করবেন—আপনাকে আজ বেরুতে দিতে পারি না আমরা।

বুঝিতে বাকি রহিল না, শ্রাদ্ধ অনেক দূর পর্য্যন্ত গড়াইয়াছে,—এ বাড়ি বহিয়া লিকার-পিকেটিং। ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতেছিল, তবুও শান্তস্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম, এ রকম কঠিন কর্ত্তব্য করার আপনাদের উদ্দেশ্য?

যুবক যুক্তকরেই দাঁড়াইয়া ছিল, বলিল, উদ্দেশ্য দেশমাতাকে বন্ধনমুক্ত করা।

প্রশ্ন করিলাম, তার সঙ্গে আমায় আপাতত বন্ধনে ফেলার কোন বিশেষ সম্বন্ধ আছে কি?

সেই রকম বিনীত উত্তর হইল, আপনি শিক্ষিত, আপনার সঙ্গে কি তর্ক করব? তবে একবার ভেবে দেখুন, জিনিসটা কতই গর্হিত। আমেরিকা সেইজন্যেই স্পেশাল ল ক'রে জিনিসটাকে দেশছাড়া করেছে।

বলিলাম, আচ্ছা, আপনারা সত্যিই কি সন্দেহ করেন যে, আমি বাজার থেকে বোতল ক'রে মদ নিয়ে—

যুবক সসঙ্কোচে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, না না, সন্দেহ আমরা কি কখনও করতে পারি?

তা হ'লে কি আপনারা এ বিষয় একেবারে নিঃসন্দেহ? দেখুন,

কাল থেকে এই ধরনের তর্ক শুনতে শুনতে আমার মাথার ঠিক নেই। অথচ ব্যাপারটা—

দলের মধ্যে আর একটি যুবক সামনে আগাইয়া আসিল এবং মাথা নিচু করিয়া গভীর বিনয়ের স্মিত হাস্যের সহিত বলিল, আমার অপরাধ নেবেন না; আপনি, মাথা ঠিক না থাকার প্রকৃত কারণটা বোধ হয় ধরতে পারেন নি; তবে মাথাটা যে ঠিক নেই, এইটুকু স্বীকার ক'রে আমাদের কাজটা অনেক হালকা ক'রে দিয়েছেন, এবং সেইজন্যে আপনাকে ধন্যবাদ।

হাঁ করিয়া রহিলাম, এর উপর আবার 'ধন্যবাদ' চাপায়!

প্রথম যুবকটি বলিল, অনেকে এইটুকুও লুকোতে চান কিনা।

আর একটি যুবক শীলতায় ইহাদেরও উপরে গিয়া বলিল, অথচ লুকোবার জো নেই—কথাবার্ত্তায়, হাত-পার ভঙ্গিতে আপনি বেরিয়ে আসবে। আশা করি, আমাদের কথায় অফেন্স্ নেবেন না আপনি। আসলে আপনার এখনও কালকের ব্যাপারের আফ্টার এফেক্ট্ চলেছে।

এমন বিনয়ের অত্যাচারের কখনও অভিজ্ঞতা ছিল না। অস্বস্তির চোটে মনে হইতেছিল, হাত-পা ছুঁড়িয়া চীৎকার করিয়া একটা কিছু করি। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করিয়া বলিলাম, দেখুন, আপনারা সকলেই ভদ্রসন্তান, সহজেই বিশ্বাস করতে পারেন। ব্যাপারটা হচ্ছে—কাল সন্ধ্যার সময় চাকরের মাথায় কিছু তরিতরকারি আর অন্য দু-একটা জিনিস দিয়ে নিজে একটা ফেনাইলের বোতল আর তেল রাখবার জন্যে একটা খালি বোতল কিনে নিয়ে আসছিলাম। শীতের কনকনানিতে বোতল দুটো র‍্যাপারের মধ্যে—

পতাকাধারী যুবকটি বলিল, আমাদের অত কষ্ট ক'রে কিছুই বলতে হবে না আপনাকে। শুধু অনুরোধ—আপনি অভ্যেসটা ছাড়ুন।

মাথায় যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল, মুখের চেহারাতেও তাহার উত্তাপ অনেকটা প্রকাশ পাইয়া থাকিবে। তবুও ধীরকণ্ঠেই বলিলাম, বেশ, ছাড়ব; মাসে একটা ক'রে ফেনাইলের বোতল আনলে এমন কিছু

অভ্যেসও হয়ে যায় না। এখন অনুগ্রহ ক'রে আমায় একটু পথ ছেড়ে দিন ; একটু ঘুরে আসা নিতান্ত দরকার হয়ে পড়েছে।

পতাকাধারী অন্য সবাইয়ের দিকে চাহিয়া ঠোঁট চাপিয়া একটু হাসিল। তাহার পর আমার পানে চাহিয়া বলিল, দরকার হয়ে পড়াটা স্বীকার করি। কিন্তু যেতে দেওয়ার আমাদের অধিকার নেই ; ক্ষমা করবেন।

আর একজন কথাটাকে একটু পরিষ্কার করিয়া দিল, সন্ধ্যার সময়েই আমাদের বেশি সাবধান থাকতে হয় কিনা।

ইহাদের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা ; ইহাদের গালাগালও ক্রমে স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে। অগ্রণী যুবকটির দিকে চাহিয়া বলিলাম, আপনাদের অধিকার আমার মাথায় ঢুকছে না ; আমি জানি, আমার যাবার অধিকার আছে।—বলিয়া পা বাড়াইলাম।

যুবক আমার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া সঙ্গীদের দিকে ফিরিয়া বলিল, তা হ'লে তোমাদের এইবার আত্মিক বল প্রয়োগ করতে হ'ল।

সেটা আবার কি আকৃতিতে দেখা দিবে, ভাবিয়া ঠিক করিবার পূর্ব্বেই দলের সব যুবকগুলি সটাং রাস্তার এমুড়ো ওমুড়ো জুড়িয়া চিত হইয়া শুইয়া পড়িল ; সামনে এতটুকু আর পা ফেলিবার জায়গা রহিল না।

আমার কান্না আসিতেছিল। রাস্তায় লোক জড়ো হইতেছিল। আমি কিছুক্ষণ একটা কথাও কহিতে পারিলাম না। অত অত্যাচারের মধ্যেও এইটুকু বুদ্ধি ছিল যে, আর এ লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিতে গেলেই সমস্ত পাড়া জাগাইয়া একটা গুলতান হইবে। অনেক চেষ্টায় মনটাকে সাধ্যমত গুছাইয়া লইয়া বলিলাম, আচ্ছা, আপনারা যদি তাতেই সন্তুষ্ট হন তো আমি আর বার হব না, আপনারা যান।

যুবক কোন উত্তর না দিয়া নিশ্চলভাবে ঘাড়-হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অন্য সবাই সেই অবস্থায় পড়িয়া। রাস্তার ওদিক হইতে দর্শকদের প্রশংসাবাণী আমার কানে আসিয়া ধিক্কারের মত বাজিতে লাগিল।

বলিলাম, যান আপনারা, কেন আর কষ্ট করবেন! আমি বেরুব না তো বলছি।

শুধু বাইরের শত্রুকে না আনলেই তো হ'ল না, ঘরের শত্রুকেও

বিদেয় করতে হবে। আমরা এইজন্তে আপনার মধ্যে যে দেবতা আছেন তাঁর কাছে ধন্না দিয়ে রইলাম।

আমি আর রাগ চাপিতে পারিলাম না। গলা একটু চড়াইয়া বলিলাম, দেখুন, আমার মধ্যেকার দেবতাকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে দানবকে চটাচ্ছেন মাত্র। আচ্ছা, আপনারা কি বলতে চান যে, আমি বাড়ির মধ্যে বোতল ভ'রে—

আমাদের কেন লজ্জা দিচ্ছেন ?

· ও! আর আমার বুঝি লজ্জা ব'লে জিনিস নেই ? ইঙ্গিতে কিছুই বলতে তো বাকি রাখলেন না ? আর এদিকে বাইরেও যেতে দেবেন না, বাড়িতেও স্থির হয়ে থাকতে দেবেন না, যেন কতবড় অপরাধ করেছি ! তাও ছাই যদি স্পষ্ট ক'রে বলেন, কি করলে আপনাদের বিশ্বাস করাতে পারি, কি প্রমাণ দিলে— আচ্ছা বেশ, থামুন। এর চেয়ে তো আর বড় প্রমাণ হতে পারে না ?—বলিয়া রাগে মাথা গোঁজ করিয়া বাড়ির মধ্যে চলিয়া গেলাম এবং তখনই যেখানে ফেনাইল প্রভৃতির বোতল থাকে, সেই কুলুঙ্গি হইতে ভরা বোতল একটা লইয়া বাহিরে আসিয়া তুলিয়া ধরিলাম এবং দলটির পানে চাহিয়া বলিলাম, এই দেখুন, কাল যা নিয়ে এসেছিলাম ; না বিশ্বাস হয়, কেউ এসে শুঁকে দেখুন, ফেনাইল কি না !

সবাই অনড় ; মুখে অমায়িক অবিশ্বাসের হাসি।

উদ্ব্যস্ত হইয়া বলিলাম, তবুও বিশ্বাস করবেন না ? এ যে মহা জ্বালা ! আচ্ছা মশায়, আমি স্বীকার করছি, আমি অপরাধী—এটা ফেনাইল নয়, একটা এক্সট্রা নম্বর ওয়ান—আমায় মার্জ্জনা করুন, আর অমন কর্ম্ম করব না। এইবার যান। এ কি ! এতেও নিস্তার নেই ? আমার কোন কথাই বিশ্বাস করবেন না ? আচ্ছা নিন, আমায় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কিসে এতটা মিথ্যাবাদী চরিত্রহীন ক'রে তুলেছে, এই আপনারাই বিচার করুন।

সমস্ত শক্তি দিয়া সামনের দেওয়ালে হাতের বোতলটা আছড়াইয়া দিলাম। বলিলাম, বুঝুন কিসের গন্ধ ! এবার তো আর অবিশ্বাস রইল না যে—

ক্রোধান্ধ হইয়া তাড়াতাড়ি কিসের বোতল যে বাহির করিয়া আনিলাম, খেয়াল হয় নাই। আমার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই চূর্ণ বোতল হইতে মেথিলেটেড স্পিরিটের উগ্র সুরাগন্ধ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

দলটি ভূমিশয্যা ত্যাগ করিয়া গগন বিদীর্ণ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, একবার বোলো ভাই—গান্ধীজীকি জয়! ত্যাগী শৈলেনবাবুকি জয়!

তাহার পর ক্যাপ্টেনের পরিচালনায় আমায় একটি নম্র অভিবাদন করিয়া সামরিক প্রথায় কুইক মার্চ করিয়া চলিয়া গেল।

আমি মূঢ়ের মত শূন্যদৃষ্টিতে সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিলাম।

* * *

যাক, সহৃদয় বন্ধুবান্ধবেরা শুনিয়া আশ্বস্ত হইবেন যে, আমার নষ্ট চরিত্র পুনরায় ফিরিয়া পাইয়াছি। প্রমাণস্বরূপ আটাশে ডিসেম্বরের 'বজ্রবাণী' পত্রিকা হইতে "মজঃফরপুরে সুরা পিকেটিং" শীর্ষক সমাচার হইতে খানিকটা তুলিয়া দিলাম—

"...এই শোচনীয় সংবাদ শুনিয়া পরদিন সন্ধ্যার সময় স্থানীয় কংগ্রেস কমিটি একদল স্বেচ্ছাসেবককে শৈলেনবাবুর গৃহে সত্যাগ্রহ করিবার জন্য প্রেরণ করেন। শৈলেনবাবু প্রথমত দারুণ উগ্রভাব ধারণ করেন, ভৃত্য দিয়া স্বেচ্ছাসেবকদের সবিশেষ অপমান করান, এমন কি শেষে পুলিসের সাহায্য পর্য্যন্ত লইবার ভয় দেখান; কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকদের অটুট সহিষ্ণুতা ও অপরিসীম সৌজন্য এবং নম্রতায় মুগ্ধ হইয়া তাহাদের সমক্ষে সুরার বোতল, পানপাত্র, সোডার আধার প্রভৃতি যাবতীয় আনুষঙ্গিক দ্রব্য চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ভবিষ্যতে সুরাত্যাগে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন।

"আমরা স্বেচ্ছাসেবকদের সাধনা, ধৈর্য্য এবং শৈলেনবাবুর হৃদয়ের বল—এই উভয়েরই প্রশংসা করি এবং সুরাসেবী মাত্রকেই শৈলেনবাবুর মহনীয় দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিতে মিনতি করি।"

সম্পত্তি

স্বরূপ মণ্ডল বলিল, আদালত-আদালত একালের একটা বাই হয়েছে দাদাঠাকুর। এগুনে, মানে আমাদের সময়ে এসব ছেল না। তার আগেও ছেল না। দুজ্জোধন যখন বললেন—'ছুঁচের ডগায় যতটুকু মাটি ওঠে ততটুকু পর্য্যন্ত দোব না', কই, এঁরা পাঁচ ভাইয়ে তো কৌসুলী ডেকে আদালতে গিয়ে উঠলেন না!···মোট কথা মকদ্দমা করলেই যে সম্পত্তি-জ্ঞানটা খুব টন্‌টনে হ'ল—এ কথা মানব না, দাদাঠাকুর। ওটা হ'ল ট্যাকার গরমাই। শুনছেন তো—ঢোলের আওয়াজটা?—ট্যাকা আছে, কলকেতা থেকে কৌসুলী আনিযে মকদ্দমা জিতে দত্তরা লবীনের বাগানের ওপর দাঁড়িয়ে নিলেমের ঢ্যাঁড়রা পিটোচ্ছে। ট্যাকার গরমাই, একে সম্পত্তিজ্ঞান বলব না।

স্বরূপ আবার খানিকক্ষণ একমনে বাঁশের বাতাটা চাঁচিল, তাহার পর হাত থামাইয়া বলিল, কেমন ক'রে বলব কন না, আমরা যে অন্য রকম দেখেছি কিনা! বেশি দূরেব কথা নয়, এই তিনটে গেরাম পেরিয়েই বাতাসপুরে। বেশি দিনের কথাও নয় এমন, কতই বা আমার বয়েস হবে ত্যাখন? ধরুন দশ—জোর, বারো। যদি মনে করেন, স্বরূপ মিছে বলছে তো পাশের গেরামে গিয়ে খোঁজ নিলেই হবে,—বাঞ্ছারামের নাতি-নাতকুড়েরা এখনও বাতাসপুরের ছ-আনিদের দেওয়া নাখরাজ রাজার হালে ভোগ ক'রে যাচ্ছে।

—বাতাসপুরের ছ-আনি তরফের কত্তা ত্যাখন উমেশ পাল। সবে কিছুদিন আগে সম্পত্তি ভাগ হয়েছে—দশ-আনি আর ছ-আনি এই দু-তরফের মধ্যে খুব রেষারেষি। ভৈরব পাল যদি উত্তুর দিকে যায় তো উমেশ পাল যাবে দক্ষিণ দিকে। উমেশ পাল মায়ের সেরাদ্দে সাতখানা গেরাম ব'লে খুব ধুমধাম করলে; ভৈরব পালের সেরাদ্দ করবার জন্যে না ছেল মা, না ছেল মাসী, না ছেল খুড়ী; মেয়ের এক দূর-সম্পক্যের

জ্যেঠশাশুড়ী কোথায় প'ড়ে ভুগছিল, তাকে দেশে নিয়ে এসে ঘটা ক'রে গঙ্গাযাত্রা করালে,—তারপর সেরাদ্দ যা করলে তাতে উমেশ পালের মুখে চুনকালি মাখিয়ে দিলে একেবারে।·· উমেশ পালের হাতে তখনও এক খুড়ী রয়েছে—বিধবা। কে জানে ভাসুরপো যেমন খেপে আছে, রেষারেষির মাথায় কখন কি ঘটিয়ে বসবে—এই ভয়ে তিনি রাতারাতি একদিন স'রে পড়ল। ভাবটা—আমার ঘটা ক'রে সেরাদ্দর কাজ নেই বাপু, কোনরকমে দুটো দিন বাঁচি আগে। দশ বছর পরে সেতুবন্ধ তীর্থ থেকে তাঁর মিত্যুর খবর যেদিনকে পাওয়া গেল, উমেশ পাল তিলকাঞ্চন ক'রে গোনাগুনতি বারোটি বামুন খাইয়ে দায় খালাস হ'ল। দোষ দেবেন কি ক'রে দাদাঠাকুর? খুড়ীর ব্যাভারটা তো ভাল হ'ল না।

—এইরকম কাণ্ড,—পুজো বল, পাব্বণ বল, অতিথি বল, কুটুম বল—সব নিয়েই রেষারেষি,—এমন রেষারেষি যে, সমস্ত গেরামটা অষ্টপহর সরগরম হয়ে আছে। সমস্ত তল্লাটটায় পালেদের ঝগড়া নিয়ে একটা ডাক প'ড়ে গেল। এই সময় বাঞ্ছারাম হঠাৎ কেমন ক'রে একদিন ধরা প'ড়ে গেল।

—বাঞ্ছারাম যেমন সিঁদও কাটত তেমনি আবার সুবিধে পেলে দিনমানেই গেরস্তর থালাটা, বাটিটা, কাপড়টা, গামছাটা বেমালুম পাচার ক'রে দিত। খুব হাতসাফাই ছেল, কিন্তু বিধেতাপুরুষ যখন মুখ তুলে চান, তখন হাতসাফাইয়ে আর কি করবে বলুন দাদাঠাকুর? ধরা প'ড়ে গেল।

আমি কতকটা বিস্মিতভাবেই প্রশ্ন করিলাম, অথচ বলছ—বিধাতা-পুরুষ মুখ তুলে চাইলেন?

স্বরূপ হাত থামাইয়া একটু মৃদুহাস্যের সহিত আমার পানে চাহিল, বলিল, ধৈর্য্য ধ'রে সবটা শুনতে হবে দাদাঠাকুর। যদি দেখেন স্বরূপ মণ্ডল ভুল বলেছে, যেমন অভিরুচি সাজা দেবেন। ত্যাতক্ষণ একটু ধৈর্য্য ধ'রে শুনতে হবে।···হ্যাঁ, কি যে বলছিলুম—বাঞ্ছারাম আর সেবারটায় পারলে না চোখে ধুলো দিতে, ধরা প'ড়ে গেল।···বাতাসপুরের দশ-আনি আর ছ-আনি তরফের বাড়ি দুটো পাশাপাশি; মাঝখানে কুল্যে একটা পুষ্করিণী। ভাগাভাগিতে দশ-আনি তরফের ভৈরব পাল

পেলে বসত-বাড়িটা, তারপরেই পুষ্করিণীটা, তারপরে কাছারি-বাড়ি। উমেশ পালের ভাগে পড়ল কাছারি-বাড়িটা। সেইটেকেই লম্বা দেয়াল দিয়ে ঘেরে-ঘুরে, দোতলার ওপর আর একতলা উঠিয়ে উমেশ পাল যা বাড়ি হাঁকড়ালে, তার সামনে দশ-আনিদের বাস্তু কানা হয়ে গেল। ছোট তো হ'তে পারে না জ্ঞাতির কাছে?—তখন ভৈরব পালও আবার দোত-লার ওপর আর একতলা চাপাতে শুরু ক'রে দিলে। মানে, খুন চেপে গেল আর কি দু-তরফের মাথায়। এ যদি বলে—আমার বাড়ি দোতলা, তো ও বলে—আমি তেতলা তুললুম। ওর যদি তেতলা শেষ হ'ল তো ও বলে—আমি চারতলা তুলব। এর চারতলা তো ওর পাঁচতলা, ওর পাঁচতলা তো এর ছয়, এ যদি বলে—আমার ছয়, তো—

স্বরূপ কাটারিসুদ্ধ হাতটা এক-এক তলার অনুপাতে ধাপে ধাপে তুলিতেছিল। সাতের কাছে যখন আসিল, আমি তাহার হাতের পানে বিমূঢ়ভাবে চাহিতে হাতটা নামাইয়া বলিল, না, সাততলা পর্য্যন্ত উঠতে পেলে আর কই? ভৈরব পালের তেতলা শেষ হয়ে চিলেকোঠা উঠছে, এমন সময় কোথা দিয়ে কি হ'ল,—সমস্ত চিলেকোঠাটা, তেতলার খানিকটা, দোতলার খানিকটা, মায় পুরনো একতলারও কোণের দিকটা নিয়ে হুড়মুড়িয়ে নেমে পড়ল। ভৈরব পাল একটা ছুতো-নতে ক'রে উমেশ পালের সঙ্গে ঠিক একটা দাঙ্গা বাধিয়ে দিত, কিন্তু—

আমি আবার বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম, এতে উমেশ পালের দোষটা হ'ল কোথায়, বুঝছি না তো স্বরূপ?

স্বরূপ মৃদু হাসিয়া বলিল, দোষ, মকদ্দমা, সালিসী—এসব হ'ল আপনাদের একালের কথা দাদাঠাকুর, সেকালে এসব তো ছেল না।··· তুমি কোট্ ক'রে একতলার ওপর দোতলা চাপাতে গেলে ব'লেই তো আমার এই ক্ষতি আর অপমান হ'ল—সেকালের লোকেরা কথাটা এই-রকম সোজাসুজি ভাবেই ধরত কিনা।···নির্ঘাৎ একটা হাঙ্গামা বেঁধে যেত এক-আধ দিনের মধ্যে। কিন্তু উমেশ পালের গুরুঠাকুর ব্যাপারটা সামলে দিলে। তিনি পুকুরে চান-আহ্নিকটুকু সেরে গামছাটি মাথায় পাট ক'রে দশ-আনিদের শুনিয়ে শুনিয়ে মন্তর আওড়াতে আওড়াতে ঐ পথ

দিয়ে বাড়ি সেঁধুচ্ছেল, আদ্দেকগুলি ইঁট নেমে মস্তরসুদ্দু তেনাকে চাপা দিয়ে দিলে। তবু মন্দের ভাল—ব'লে ভৈরব পাল গায়ের জ্বালাটা গায়েই মেরে নিলে। বাড়ি পড়া নিয়ে আর কোন গোলমাল করলে না। উমেশ পালের তেমন গুরুভক্তি টুরুভক্তি ছেল না দাদাঠাকুর—সবার তো সমান হয় না! তবুও বাতাসপুরের লোকেরা কি হয় কি না-হয় করছে, এমন সময়, আপনাকে যা বলছিলুম, বাঞ্ছারাম ধরা প'ড়ে গেল।

—বাঞ্ছারামকে এ তল্লাটে সবাই চেনে, সাবধান থাকে; কিন্তু বাতাসপুর তো দূরে, সেখানে তাকে বড় একটা কেউ চিনত না। না চেনার দরুন উমেশ পালের বাড়িতে দিন-মজুরিতে সে এক টা কাজ পেয়ে গেছল।... দুপুর গড়িয়ে গেছে, শীতকালের বেলা, মজুরি সেরে বাঞ্ছারাম গায়ে সুতির র‍্যাপারটুকু জড়িয়ে দাঁতন করতে করতে ঠুকঠুক ক'রে চলেছে। এইবার চানটা সেরে খুদ মুড়ি যা জোটে একমুঠো গালে দিয়ে আবার খাটুনিতে নামবে, এমন সময় হেঁড়ে গলায় এক ডাক—কে জাতা হ্যায়?

—রাস্তাটা ভৈরব পালের দেউড়ির সামনে দিয়ে। বাঞ্ছারাম ফিরে দেখে সিং-দরজায় এক তেপাইয়ের ওপর এক বেটা নতুন পশ্চিমে দরোয়ান। সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পেরে বাঞ্ছারামের বুক একেবারে শুকিয়ে গেল। কি তেওয়ারী না কি নামটা, আমার ঠিক স্মরণ হচ্ছে না, এগুনে পুলিশে কাজ করত, বাঞ্ছাকে এর আগে জেলে দেখেছে। বেশ ভাল ক'রে চেনে।... মুখ ফিরুতেই জিজ্ঞেস করলে, বাঞ্ছারাম আছে না? এখানে কোথা থেকে?

—যেমন বলা উচিত—খুব এক লম্বা সেলাম ঠুকে বাঞ্ছারাম বললে, হ্যাঁ, আমিই দারোগা সায়েব। গতর খাটিয়ে এক মুঠো উপাজ্জন ক'রে যা জোটে তাতেই কোনরকমে দিন গুজরান করছি। অনেকদিন পরে দর্শন পেয়ে বড় আনন্দ হ'ল।...

—মানে, মন ভিজোবার যতরকম কথা হতে পারে বাঞ্ছারাম আওড়ে দিলে, কিন্তু কথায় বলে, চোরা না শোনে ধম্মের কাহিনী, আর কথাতেই যদি মন ভিজবে তো পশ্চিমে বলেচে কেন? ··তেওয়ারী সব শুনে চোখ পাকিয়ে বললে, তোমারা র‍্যাপারকে ভেতরমে ফোলা কেন?

—বাঞ্ছারাম একটু হাসবার চেষ্টা ক'রে বললে, দুটো মুড়ি কিনেছিলুম দারোগা সাহেব, চান ক'রে উঠে মুখে দোব।... আচ্ছা, এখন তা হ'লে আসি, বড্ড তাড়াহুড়ো রয়েছে, জমিদারের মজুর খাটছি কিনা। সন্দের সময় এসে ভাং ঘুটে দিতে হবে দারোগা সাহেবকে, অনেকদিন সেবা করতে পাই নি...

—তেওয়ারী তেপাই ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, গোঁফে একটা চাড়া দিয়ে গলা চড়িয়ে বললে, তোম এদিকে আবেগা কি হামকো উঠনে পড়েগা ?

—তেওয়ারীর শরীর আগে থেকে ভারী হয়ে গেছে, বাঞ্ছারাম ছুট দিলে যে দৌড়ে ধরতে পারত এমন নয়, তবে কথা হচ্ছে, যখন যেটা ঘটবার সেটা ঘটবেই কিনা দাদাঠাকুর, বাঞ্ছারাম কেঁচোটির মত সুড়সুড় ক'রে কাছে এসে দাঁড়াল। দাঁড়াতে দেরি, তেওয়ারী র‍্যাপার ধ'রে দিলে এক রাম-ঝটকা। র‍্যাপারটা তো হাতেই থাকুক, একদিকে বাঞ্ছারাম ঐ হুখানে ছিটকে পড়ল, আর একদিকে এই এত বড় এক রূপোর পানের ডিবে। তেওয়ারী বললে—উঠায় করকে লে আও।

—বাঞ্ছারাম আস্তে আস্তে ডিবেটা কুড়িয়ে এনে দিতে হাত ধ'রে আর একটা ঝটকা দিয়ে দে মার। পুলিসের কাজ ছাড়া পর্য্যন্ত আসামী পায় নি, হাতটা নিসপিস করছিল, মার যা দিলে তার আর হিসেব রইল না দাদাঠাকুর। দশ-আনি দেউড়ির আমলা গোমস্তা যে যেখানে ছিল ছুটে এল, কেউ থামাবার চেষ্টা করলে, কেউ ওরই ওপর আরও দু-ঘা বসিয়ে হাতের সুখ ক'রে নিলে। কেরমেক সোরগোলটা যখন বেড়ে গেল, তখন ছ-আনিদের তরফ থেকেও কয়েকজন এসে জুটল।

—ছ-আনি তরফের দারোয়ানের নাম পাঁড়ে। অমন লাসও কেউ এ তল্লাটে কখনও দেখে নি, অমন রুক্ষু মেজাজও না। রুটির ময়দা ঠাসছিল, চোর ধরা পড়েছে শুনে তালটা থালায় ঢাকা দিয়ে হাত ঝাড়তে ঝাড়তে এসে উপস্থিত হ'ল, ভিড় ঠেলে সামনে এসে জিজ্ঞেস করলে, ক্যা হুয়া হ্যায় ?

—তেওয়ারী দেশওয়ালীর কাছে বাহাদুরি দেখিয়ে বললে, শালা, রূপোর ডিবি চুরি ক'রে পালাচ্ছেল পাঁড়েজী, ধরেছি।

—পাঁড়েজী একে লোকটাই গোঁয়ার, তায়—যেমন হয়ে থাকে দাদাঠাকুর, নিজে কখনও পুলিসে কাজ করত না ব'লে তেওয়ারীর ওপর ভেতরে ভেতরে খুশি ছিল না। তার ওপর আবার যখন বাঙ্গারামের দিকে চেয়ে বুঝলে যে, তেওয়ারী তার জন্যে কিছু বাকি রাখে নি, তখন ভয়ঙ্কর খাপ্পা হয়ে উঠল। তা ছাড়া মনিবের মেজাজও বুঝত; জিজ্ঞেস করলে—ডিবে কোথায় ?

—তেওয়ারী ডিবেটা হাতে তুলে দিল। ডিবেটা হাতে নিয়ে পাঁড়েজী বললে, এ তো দেখছি আমাদের বাড়ির ডিবে। চোরকে ছেড়ে দেও। তেওয়ারী লতুন এসেছে, দুপক্ষের সব ব্যাপারটা শোনে নি তখনও, তায় পুলিসের লোক, সোজা পদ্ধতিটাই জানে, একটু হতভম্ব হয়ে থেকে বললে, বাঃ, চোরকে ছেড়ে দেবো কেন ?—ধরা পড়েছে, তাকে পুলিসে দিতে হবে।

—পাঁড়েজী একটা সুবিধেই খুঁজছেল,—পুলিসের নাম হতেই তো ওদের নিজেদের ভাষায় চোখা চোখা একরাশ গাল ঝাড়লে, নিজে পুলিস ছেল না ব'লে বরাবর একটা আক্রোশ ছেল কিনা। তারপর এগিয়ে বললে, মাল আমার, চোরও আমার, হাম য্যাসা খুশি করেঙ্গা, চোর দে দেও।

—তেওয়ারীরও রোখ চেপে গেল, বাঙ্গারামকে আড়াল ক'রে দাঁড়িয়ে বুক ফুলিয়ে বললে, কোভি নেই ছোড়েঙ্গা, চোর সরকার বাহাদুরকে হ্যায়।

—বলতে দেরি, চিতুনো বুকে এক রাম রদ্দা কষিয়ে তেওয়ারীকে হটিয়ে পাঁড়েজী ধরলে বাঙ্গারামের টুঁটি টিপে; তারপর সে যা আরম্ভ হ'ল দাদাঠাকুর, সে এক রামায়ণ-মহাভারতেই গপ্প শোনা যায়; প্রথমে তো নিজেদের মধ্যেই দিব্যি খানিকক্ষণ চড় ঘুষি অদল-বদল করলে দুজনে, তারপর চোর নিয়ে টানাটানি—একজন ধরলে দুটো নড়া বাগিয়ে, একজন ধরলে দুটো পা, তারপর টানাটানি, হেঁচড়া-হেঁচড়ি—এ একবার পাঁড়েজী সুদ্দু হিড়হিড় ক'রে দেউড়ির দিকে টেনে নিয়ে যায় তো ও একবার তেওয়ারী সুদ্দু সিং-দরজার পাঁচ হাত বাইরে হিচড়ে নিয়ে আসে—

'হামকো চোর' তো 'হামকো সরকারী চোর'। আমরা সবাই হাঁ ক'রে তামাসা দেখছি। আমি ত্যাখন খুড়োর কাছে বেশির ভাগ থাকতাম কিনা—একবার মনে হচ্ছে, বুঝি নড়া দুটো ছিঁড়ে গেল, আবার মনে হচ্ছে পা দুটো বুঝি বাঞ্ছারামের কোমর থেকে খ'সে বেরিয়ে গেল। জন্মে আর একবার মাত্র সে-রকম কাণ্ড দেখেছি দাদাঠাকুর, কলকেতার গড়ের মাঠে দু-দল গোরা খেলছেল—তা সেটা ছেল একটা কাছি নিয়ে। গোটা একটা নিরীহ মানুষ নিয়ে—আর সে মানুষও আমাদের জানাশোনা বাঞ্ছারাম—এ ধরনের কাণ্ড আর দেখি নি কখনও। তামাসা দেখতে বোধ হয় দু-তরফে এমন শতাধিক লোক জমা হয়ে গেছে, খিস্তি খেউড় যা চলছে তার আর নেকা-জোকা নেই।···মাঝখানে ঐ রকম সমুদ্রমন্থনের পালা চলেছে।···

বলিলাম, মারা গেল না লোকটা স্বরূপ? গল্প শুনেই তো আমার আদ্দেক হয়ে এসেছে!

স্বরূপ হাসিয়া উত্তর করিল, কথায় বলে—চোরের পরাণ ভোমরার মধ্যে থাকে দাদাঠাকুর, তা ছাড়া ওকে মরতে হবে যে অন্যভাবে, ত্যাতক্ষণ পর্য্যন্ত ওকে ধকলটা সামলাতেই হবে কিনা—তা না হ'লে নিয়তি আর বলেছে কেন?···তারপর যা বলছিলুম,—বাঞ্ছারামের এর পরে যখন জ্ঞান হ'ল, তখন দেখে সে ছ-আনিদের কাছারির সামনে ঘাসের ওপর প'ড়ে রয়েছে, চারিদিকে একপাল লোক। পাশেই পাঁড়েজী, দশ-আনিদের দেউড়ির দিকে চেয়ে এক-একটা হুংকার ছাড়ছে আর তাল ঠুকছে—আর দ্যাখো, কিসকা চোর হ্যায়, শ্যালা তেওয়ারী! হামকো সামনে পুলিসগিরি ফলানে আয়া হ্যায়!

—উমেশ পাল আহারাদি ক'রে এই সময়টা ভেতরে থাকে। রাজামানুষ, একটু রঙেই থাকে, বুঝতেই পারেন, দাদাঠাকুর। পেরাই তো এই রকম ব্যাপার হচ্ছে দু-বাড়ি নিয়ে, গা করে না। তেমন তেমন কিছু হ'ল, খবর গেল ভেতরে। দরকার মনে হয় বেরিয়ে এল, নয়তো হুকুম পাঠিয়ে দিলে। এই রকম ক'রে চলে। এবার তো কাণ্ডটা একটু ঘোরালই হয়েছে—দাওয়ানজী খানসামাকে দিয়ে এত্তালা দিয়ে দিলে। খানসামা ছেল

আমারই খুড়ো ভবানী মণ্ডল, দাদাঠাকুর। এত্তালা হ'ল—এই রকম রূপোর ডিবে নিয়ে চোর পালাচ্ছেল, ও-দেউড়ির দারোয়ান, আটকে রেখে মারপিট করছেল, পাঁড়েজী তাকে বামালসুদ্দু ছাড়িয়ে নিয়ে এসে আটকে রেখেছে, হুজুরের কি হুকুম হয় ?

—উমেশ পাল চোখ বুজে আলবোলায় তামাক খাচ্ছেল, বললে—শি. লে আও।

—কাঁচা মাথা একটা কেটে ফেলা সে সময় খুব বেশি কথা ছেল না, দাদাঠাকুর। খুড়ো বাইরে এসে হুকুম শুনিয়ে দিলে। শুনতে দেরি, মার খেয়ে বাঞ্ছারামের যে একটা ঝিম ধরেছেল, কোথায় গেল উড়ে, ডাক ছেড়ে কান্না জুড়ে দিলে। চোরের কান্না, তায় আবার মশানে যেতে বসেছে, কান্নার চোটে সারা দেউড়ি তোলপাড় ক'রে তুললে বাঞ্ছারাম— এমন কাণ্ড ক'রে তুললে যে, কত্তার যে একটু রঙের আমেজ ধ'রে এসেছেল, সেটা গেল চ'টে। দাওয়ানজীর ভেতরে ডাক পড়ল।

—সামনে গিয়ে দাঁড়াতে কত্তা উমেশ পাল জিজ্ঞেস করলে, কাঁদে কে?

—কত্তা রঙের মুখে থাকলে দাওয়ানজীও তটস্থ হয়ে থাকত, মানে মেজাজের ঠিক থাকত না কিনা ; ভয়ে ভয়ে বললে—ঐ ব্যাটা চোর। সামান্য একটু মাথাটা কেটে নেওয়ার হুকুম হয়েছে হুজুরের থেকে, পাড়া তোলপাড় করছে,—কেউ যেন কখনও দেয় নি মাথা এর আগে। ত' এক্ষুনি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। যাই, পাঠিয়ে দিই।

—দাওয়ানজী ফিরতেই কত্তা হাতটা একটু তুলে দাঁড়াতে হুকুম করলে, বললে—তোমার মাথা খারাপ হয়েছে, কাজ-কম্ম ছেড়ে বাড়ি গিয়ে বস এবার। আমি কাঁচা মাথা চেয়েছি সে বেটা খোট্টা দারোয়ানের।...কি অধিকারে সে আমার চোরের গায়ে হাত দেয়? পাঁড়ে কি করছেল? জানে না সে আমার হুকুম ? আজ আমার চোর আটকাবে, কাল আমার ভাবী আটকাবে, পরশু আমার জুড়ি আটকাবে, পরদিন আমার জমিদারিতে হাত দেবে—আমার খাস সম্পত্তির ওপর যদি এই ভাবে দখল বসায় সবাই, তো পাঁড়ে ব্যাটা কি করতে আছে শুনি ? তোমরাই বা কি করতে আছ ?... যাও, আভি নেকালো সব।

—চ'টে গেলে উমেশ পালের আবার বেশি ক'রে মালের দিকে ঝোঁক পড়ত,—খুড়োকে বোতল আনতে হুকুম ক'রে দিলে।

—দাওয়ানজী হাতজোড় ক'রে বললে, হুজুর, পাড়েজী তো সে বেটার ধাষ্টামো আর বে-আইনির জন্যে কিছু বাকি রাখে নি,—অচৈতন হয়ে ও-তরফের সিং-দরজার সামনে প'ড়ে আছে, হুকুম হয় তো ধড় থেকে না হয় মাথাটা আলাদা ক'রে আনিয়ে হুজুরে নজর দিই।

—কত্তা কিছুই উত্তর না দিয়ে একটু গোঁজ হয়ে রইল, তারপর বললে, চোর বেটা কোথায়?

—দাওয়ানজী বললে, বাইরেই প'ড়ে আছে আধমরা হয়ে, হুজুর…। বেটা চীৎকার করছিল, ঠাণ্ডা করবার হুকুম দিয়ে এসেছি।

—দশ-আনির বড় কত্তা কোথায়—অন্দরে?

—হৈচৈ শুনে তিনি বেইরে এসেছিলেন, এখন তেওয়ারীর এজাহার নিচ্ছেন বোধ হয়। বারান্দার সামনে বেস্তর লোক জড়ো হয়েছে।

—কত্তা আবার খানিকটা গোঁজ হয়ে রইল। দাওয়ানজী একবার জিজ্ঞেস করলে, তা হ'লে চোর বেটার সম্বন্ধে যা সাজার হুকুম হয় হুজুরের—

—কত্তা বললে, সাজা উমেশ পাল নিজের হাতে দেবে। হাতীশালা থেকে নতুন হাতীটা বের করতে বল, হাওদাসুদ্দু। আমি স্বয়ং আসছি।

স্বরূপ বাতা আর কাটারিটা রাখিয়া দিয়া দুইটা হাঁটু দুই হাতে জড়াইয়া আমার দিকে মুখ করিয়া বসিল। বলিল, হাতীর তলায় চাপা দিয়ে চোর মারা হবে, স্বয়ং কত্তা থাকবেন হাতীর উপর—সঙ্গে সঙ্গে কথাটা চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল দাদাঠাকুর।

—কম ক'রে বোধহয়দশখানা গেরামের লোক ভেঙে পড়ল। ছেলেমানুষ ব'লে খুড়ো আমায় দেখতে মানা ক'রে দেছল, আমি চুপি চুপি গিয়ে একটা ছাতিমগাছে উঠে ব'সে রইলেম। দশ-আনি তরফেরও যত লোক বাইরে এসে জমা হ'ল, দেউড়ির ছাতে মেয়েরা গিয়ে জমা হ'ল। ওদিকে দশ-আনির বড় কত্তা ভৈরব পাল গোপনে গোপনে সদর থানায় লোক

ছুটিয়ে ওপর-ঘরের একখানি ঘরে জানলার ধারে ব'সে ওপিক্ষে করতে লাগল। সেও তো ব'সে থাকবার পাত্তোর নয়—অত বড় অপমানটা হ'ল!

—বৈকাল হ'লে উমেশ পাল বাইরে এল। দাওয়ানজীকে জিজ্ঞেস করলে, ঢোল-সানাইয়ের জন্যে বলা হয়েছিল? হয় নি বলা—দাওয়ানজী চুপ ক'রে রইল। কত্তা গলা চড়িয়ে বললে, বলেছি নিজে সাজা দোব, আমায় কি মেয়েমানুষের মত লুকিয়ে চুরিয়ে সাজা দিতে হবে?··· নেকালো সব! তক্ষুনি ঢুলী সানাইদের ডাকতে পাইক ছুটল। কত্তা হুকুম দিলে—চোরকে হাজির করা হোক।

—বাঞ্ছারামকে দু-তিনজন মিলে এক রকম টাঙিয়েই নিয়ে এল। হাতীর পিঠে রূপোর হাওদাই থাকুক আর সোনার হাওদাই থাকুক, তার তো মিত্যুই দাদাঠাকুর—একেবারে নেতিয়ে পড়েছে, মুখ দিয়ে আর রা সরছে না।

—কত্তা হুকুম দিলেন, চারজন বরকন্দাজ সাজগোজ প'রে হাজির হবে। তোষাখানা থেকে একখানা জরির পোষাক, আর কত্তার খাস আলমারি থেকে এক বোতল বিলিতীমালেরও হুকুম হ'ল। সাজার আয়োজনটা দেখে দেউড়ির চারদিকে ভিড় চাপ বেঁধে উঠল।···এইবার তামুকটা একবার দিন দাদাঠাকুর, একটু পেসাদ পাই।

স্বরূপ বেশ পুরাদমে কয়েকটা টান দিল। কলিকাটা একবার দেখিয়া লইয়া বলিল, আছে এখনও খানিকটে।

তাহার পর কলিকাটা আবার আমার হুঁকার মাথায় চাপাইয়া দিয়া বলিল, সে অনেক কথা দাদাঠাকুর, কত আর কইব! তাই বলছিলুম যে সম্পত্তি-জ্ঞান একটা জিনিসই আলাদা, কথায় কথায় মামলা মকদ্দমা করলেই যে সেটা খুব টন্‌টনে বলতে হবে তা নয়।···হ্যাঁ, সেদিনকার কথা যা বলছিলুম—সদর থেকে খুনের খবর পেয়ে য্যাখন দারোগা এসে হাজির হ'ল, ত্যাখন জলুসটা ঠিক দশ-আনি তরফের সিং-দরজার সামনে। ঝালর-হাওদা দেওয়া—হাতীর ওপরে, হাওদার ঠিক মাঝখানটিতে জরির কাপড়-চোপড় প'রে বাঞ্ছারাম, বাবুর বোতলের মাল খেয়ে জয়জয়কার করতে

করতে রূপোর ডিবেটা যতদূর হাত যায়, মাথার ওপরে তুলে ধরেছে—চারপাশে চারটে সাজগোজ-পরা বরকন্দাজ আসাসোঁটা নিয়ে দাঁড়িয়ে নীচে দুখানা গেরামের যত ঢুলী আর সানায়ী পেল্লায় জোরে নহবৎ বাজিয়ে চলেছে।

—দশ-আনিদের দেউড়ি ঘুরে, সারা বাতাসপুরটায় বার দুই চক্কোর দিয়ে, জলুসটা পোড়ো শিবমন্দিরের সামনে দাঁড়াল। সেখান থেকে বাঞ্ছারাম সুদ্দু হাতীটা মাঠে নামিয়ে দশ-আনিদের জমির পাশেই ছ-আনিদের যে একটা চাকলা আছে, তার প্রায় বিঘে পাঁচ ছয় ঘেবে মাহুত আর একটা চক্কোর দিলে; হাতীর পেছনে পেছনে একটা লোক চুনেব দাগ দিতে দিতে চলল। বাঞ্ছারামেব নাতি-নাতকুড়েরা আজ সেটা ভোগদখল করছে। দশ-আনিদের জমিব ঠিক লাগোয়াই, দাদাঠাকুর, যেন ওরা কখনও ভুলতে না পারে আর কি।

—তেওয়ারীর কাঁচা মাথাটা নিয়ে আসতে পারে নি ব'লে কত্তা পাঁড়েজীব ওপর একটু চ'টে গেছল; তবুও পঞ্চাশটা টাকা বকশিশ করলে। নইলে যে বড় অধম্ম হয় দাদাঠাকুর—সে-বেচারী চেষ্টার তো কিছু কসুব করে নি…

কালিকা

যাহারা সৃষ্টিরহস্যের কিছু কিছু খবর রাখে তাহাদের মতে নটু গোঁসাইয়ের কন্যা রাধারাণীকে গড়িতে বিধাতাপুরুষ একটা মস্ত বড় ভুল করিয়া বসিয়া আছেন—মেয়ে না হইয়া রাধারাণীর বেটাছেলে হইয়া জন্মানো উচিত ছিল। অমন আদর্শ বৈষ্ণব পরিবার, বাড়ির কুকুর-বেড়ালটি পর্য্যন্ত যেন তৃণাদপি সুনীচ; মাঝখানে তালগাছের মতো খাড়া, রুক্ষ ঐ ধিঙ্গী মেয়ে! একেবারে বেমানান। লোকে বলে, নটু তপস্যা ক'রে মেয়ে-পেল্লাদ পেয়েছে—না ডোবে জলে, না পোড়ে আগুনে।

নূতন কলেবরের প্রহ্লাদটিব রূপের পরিচয় এইখানেই একটু দিয়া রাখা ভালো। কালো, বেশ স্পষ্টভাবেই কালো; শ্যামবর্ণ কি ঐরকম কোন গোলমেলে বিশেষণ হাতড়াইবার দরকারই হয় না। হাড়কাট মোটা, তাই গড়নটা খুব গোলালো নয়। চওড়া পিঠের উপর একরাশ চুল; অন্যত্র প্রশংসা পাইত, এ মেয়ের কাঁধে পিঠে সমস্তদিন নাচিয়া-কুঁদিয়া, ফুলিয়া-ফাঁপিয়া একটা বিশৃঙ্খল বোঝা হইয়া থাকে। মাত্র চোখ দুইটির নিন্দা করা চলে না,—ডাগর, টানাটানা; তবে যাহারা খুব প্রশংসা করে তাহাদেরও স্বীকার করিতে হয়—হ্যাঁ, একটু পুরুষালি ভাব আছে বইকি চাউনিতে—তা যা দস্যি মেয়ে!

বাপ-মায়ের ভাবনার কূলকিনারা নাই, বয়স তো আর মুখ চাহিয়া কথা কহিবে না! মেয়ে ভাবনার কিনারা দিয়াও যায় না। ঘুড়ি উড়ায়, সাঁতার কাটে, জল ছাঁচিয়া, ডিঙি ভাসাইয়া হাল টানে; পূজা আসিলে যাত্রার আসর সাজায়, ভাঙা আসরে দল লইয়া রাবণের অভিনয় করে। যখন বিয়ের লগনসা নামে, সানাইয়ের বাদ্যে গ্রাম মুখরিত হইয়া উঠে, তাহার বাপ-মায়ের মনে আশার শিখাটি নিরাশার ধূমে ক্রমে আচ্ছন্ন হইয়া আসে,

রাধারাণী সদলবলে বরযাত্রীদের বিপন্ন করিবার নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবনে মনেপ্রাণে মাতিয়া থাকে।

সন্ধ্যার রঙে রঙ মিশাইয়া যখন বাড়ি ঢোকে, মা'য়ের কাছে সেই এক ধরনের বাঁধা অভ্যর্থনা,—এলেন গেছো মেয়ে! ওলো, তুই আবার ফিরলি কেন, গাছের ভূতপেত্নী বেহ্মদত্যি ভাগাড়ে গেছে? নিতে পারলে না তোকে?

অত শান্ত নিরীহ মা, কাহারও কাছে মুখ তুলিয়া কথা কহিতে জানে না; সন্ধ্যায় মেয়ের শ্রীছাঁদ দেখিয়া কিন্তু তাহারও আর ধৈর্য্য থাকে না।

মেয়ের কিন্তু এতটুকু খেদ নাই, দুঃখ নাই, গ্রীবাভঙ্গি করিযা উত্তর দেয়, আহা! কি মেয়েই পর্শ করেছ। ভূত-পেত্নীতে দূর থেকে দেখেই পালায়, তার আবার নিতে আসবে!

হাসিয়া ফেলে, সঙ্গে সঙ্গে মার হাতের কাজ কাড়িয়া লইয়া অমিত উৎসাহে লাগিয়া যায়—কুট্‌না কোটা, বাঁসন মাজা থেকে ভাইয়ের দুধ খাওয়ানো পর্য্যন্ত যে কাজই হউক না কেন। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দিনের কীর্ত্তি-বিবরণী চলিতে থাকে: বুঝলে মা, বাঁধের ধারে আজ থেকে যাওয়া ঘুচিয়ে দিলে ড্যাকরা নস্তেটা। কুঠির সায়েব তাঁবু ফেলেছে, তুই ওসব করতে গেলি কেন বাপু? আমায় উল্টে বলে—'তুই তো শিকিয়ে দিয়েছিলি'··· বোঝ; হ্যাঁগা, আমার কি দায়টা পড়েচে শেকাতে যাবার? মেয়েমানুষ আমি। মাঝখান থেকে অমন চমৎকার কুলগুলো পাঁচ ভূতের পেটে যাবে। আর এই সময় নদীতে যা গঙ্গার কাঁকড়া আসতে লেগেচে মা! হ্যাঁ, তোমার যেমন কথা, আঁচলে রক্ত লাগতে যাবে কেন? বা রে, কনুই থেঁৎলে যাবে কেন সুস্থ শরীরে?···দেখি, তাই তো গো!—এ মা, মাখনার কাণ্ড; আমি অত ক'রে পাড়লাম পেঁপেটা, আর পোড়ারমুখো কিনা গাছের ওপরে গিয়ে কাড়াকাড়ি লাগিয়ে দিলে, অবলা মেয়েমানুষ পেয়ে! তেমনি, হয়েওছে, তিনমানুষ ওপর থেকে প'ড়ে গতর চুর হয়ে গেছে বাছাধনের। রাধী বামনীর মুখের গেরাস খাবে—খাও!···

গেছো মেয়ের পাকা দেখা হইল গাছের উপরেই। কালিকাপুরের বিষ্ণু ভট্টাচার্য্য চরণডিহির কালভৈরবীর তলায় মানৎ পাঁঠা বলি দিয়া

ফিরিতেছিলেন—রাস্তার ধারে, পেয়ারা গাছের ডালে একটি বারো-তেরো বৎসরের মেয়ের উপর নজর পড়িল। নজর না পড়িয়া উপায় ছিল না।—মেয়েটির গাছকোমর বাঁধা, খালি গা, এলো চুল। ডালের ঊর্ধ্বে উপবিষ্ট একটি ছেলেকে ভূমিসাৎ করিবার শুভ উদ্দেশ্যে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়া দোলা দিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছ্বসিত হাসি।

বিষ্ণু ভট্টাচার্য্য কাছাকাছি কয়েক বাড়ি ঘুরিয়া পরিচয় লইলেন, তাহার পর সরাসরি রাধারাণীদের গৃহে গিয়া তাহার পিতার নিকট মেয়েটিকে পুত্রবধূরূপে ভিক্ষা করিলেন। নটু গোঁসাইয়ের কথাটা বুঝিতে এবং বিষ্ণু ভট্টাচার্য্যের মানসিক সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ মিটিতে যা একটু দেরি হইল, তাহার পর কথাবার্ত্তা স্থির হইয়া গেল। অন্তরের উল্লাস সাধ্যমত সংযত করিয়া নটু গোঁসাই বলিলেন, তা হ'লে পাকা দেখাটা কবে সুবিধে ··

বিষ্ণু ভট্টাচার্য্য উত্তর করিলেন, পেয়ারা গাছের মগডালে মাকে আমার পাকা দেখেছি, আর দেখেই চিনেছি; আর দ্বিতীয়বার দেখার দরকার নেই।

বৈশাখের মাঝামাঝি ঘটনা, জ্যৈষ্ঠ মাসের গোড়ায় বিবাহ হইয়া গেল। শ্বশুরের আগ্রহাতিশয্যে রাধারাণী বিয়ের পর আর বেশীদিন বাপের বাড়ি থাকিতে পাইল না, আশ্বিন পড়িলে বিজয়ার শুভদিনে শ্বশুরবাড়ি চলিয়া গেল। মা মেয়ের চোখের জলের সঙ্গে নিজের চোখের জল মিশাইয়া বলিল, সেখানে গিয়ে আর ওসব যেন করতে যেয়ো না মা, রাধারমণ যখন মুখ তুলে চাইলেন ··

মেয়ে, ফোঁপানির মধ্যে যতটা সম্ভব, স্পষ্ট বলিল, ফিরে আসতে দাও, তারপর তোমার রাধারমণকে যদি না···

মা মুখের উপর হাত দিয়া অমঙ্গলসূচক কথাটা আর শেষ করিতে দিল না।

শ্বশুর কালিকাপুরে আসিয়া বধূকে একবার বাড়ির বিস্তীর্ণ সীমার মধ্যে ঘুরাইয়া আনিলেন, বলিলেন, এই তোমার পেয়ারা গাছ মা; ঐ আম জাম জামরুলের বাগান; সাঁতার কাটার জন্যেও তোমায় বাইরে যেতে হবে না; দেখছই, মস্ত বড় পুকুর সামনে প'ড়ে আছে। কাজের দিকে যাবে না,·

ঢর বয়েস আছে; কাজের মধ্যে কাজ রইল এই মন্দিরটি। নিলে তো মার সেবার ভার ?…বেশ !…তোমার শাশুড়ী যাওয়ার পর থেকে মার সেবার ত্রুটি হচ্ছিল ব'লেই আমায় তোমাকে পাইয়ে দিলেন ··

একটু থামিয়া বধূর মাথায় হাত দিয়া হাসিয়া বলিলেন, নিজের কাজ নিজে করবার ইচ্ছে হয়েছে এবার, না গা মা ?

বধূ কথাটা বুঝিল না অতশত, তবু মাথা নাড়িয়া জানাইল, হ্যাঁ।

ঘোর শাক্ত লোকটি। প্রকাণ্ড দেবোত্তর সম্পত্তির মাঝখানে বাড়ির লাগোয়া শ্যামা-মন্দির। নিকষে গড়া মূর্ত্তি, পায়ের তলে শ্বেত-পাথরের মহাকাল স্তিমিতনেত্রে শয়ান। মূর্ত্তি বেশী উঁচু নয়, চাহিতেই প্রথমে বরাভয়ে তোলা দক্ষিণ হাতটির উপর নজর পড়ে—রক্তাভ করতল, তর্জ্জনী আর মধ্যমা আঙুল দুইটি ঈষৎ লীলায়িত, মুখখানি ডাহিনে একটু তোলা, আকাশ-নিবদ্ধ উন্মনা দৃষ্টি—একটি বারো-তেরো বৎসরের কিশোরী নিজেরই ভাবের সম্মোহনে যেন হঠাৎ নিশ্চল হইয়া গিয়াছে।

কোথাও এতটুকু পাষাণত্ব নাই, শিল্পী নিজের বাসনাতপ্ত প্রাণ ঢালিয়া দিয়া যেন সব কঠোরতা গলাইয়া লইয়াছে। দিগ্বসন অঙ্গখানির রোম-রোম মাতৃত্বের সুষমায় পূর্ণ।

এর সঙ্গে সেদিনের পেয়ারা গাছের মেয়েটির কোথায় একটি মিল ছিল—খুব সূক্ষ্ম, শুধু তেমন চোখেই ধরা পড়ে। তাই বিষ্ণু ভট্টাচার্য্য তাহাকে সযত্নে আনিয়া বাড়িতে তুলিলেন। সবচেয়ে ভালো লাগিল তাহার নামটি—রাধারাণী! বিষ্ণু ভট্টাচার্য্যের মনে হইল, এই রহস্যময়ী মেয়েটির এ যেন ঘোর একটি প্রবঞ্চনা, নামের অন্তরালে আত্মগোপনের প্রয়াস, একটি ছলনা; ঐ পাষাণময়ী মায়ের হাতের ছিন্নমুণ্ডে, কটিতটের করমালিকায় যে রকম ছলনার আভাস লুকানো আছে।

বধূ পরুষ—নাম ধরিয়াছে কোমল। মা মমতাময়ী, হাতে লইয়াছে ছিন্নমুণ্ড।

যে ধরা দিতে চায় না, সেই মনকে প্রবলতর বেগে টানে।

বিষ্ণু ভট্টাচার্য্যের রাধারাণীকে পুত্রবধূরূপে ঘরে আনার দরকার ছিল

বটে, কিন্তু পুত্রের বিবাহ দেওয়ার মোটেই তাগাদা ছিল না। তাহাকে রাধারাণীর আসার উপলক্ষরূপে দাঁড় করানো হইল মাত্র।

কালীপদর বয়স বছর চৌদ্দ হইবে, মাথায় রাধারাণীর চেয়ে মুঠাখানেকও বেশী হয়, কি না-হয়। বাপের সম্পত্তি আছে, খায় দায়, নিজের খেয়ালখুশি লইয়া থাকে। সকালে একটু সংস্কৃত পড়িয়া আসে, রাত্রে মৌলবী আসিয়া খানিকটা ফারসী পড়াইয়া যায়। যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন ইংরাজ সবে এ দেশে পা দিয়াছে, শিক্ষার আসরটা সংস্কৃত-ফারসীর মধ্যে ভাগাভাগি করা।

ফল কথা, রাধারাণী যে একটা স্বামী-বিভীষিকা লইয়া বাড়ি হইতে বিদায় লইয়াছিল, শ্বশুরবাড়ি আসার সঙ্গে সঙ্গে সেটা প্রায় তিরোহিত হইয়া গেল। সে দেখিল—পুঁটে, গোবরা, মাখনা গোছেরই তাহার একটি সঙ্গী জুটিয়া গিয়াছে—বরং আরও একটু বেশী অন্তরঙ্গ। জীবনের এই নূতনত্বটুকু পুরাতন ছাঁচে ঢালিয়া লইতে তাহার মোটেই দেরি হইল না।

সংসারটি খুব ছোটখাট, তাহার গতির পথে কাহারও সহিত ঠেলা-ঠেলি হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রথম—শ্বশুর, তিনি প্রতিমাটি আর মন্দিরটি লইয়াই থাকেন। বাড়িতে পিস্-শাশুড়ী—ঘোর বৈষ্ণব পরিবারের কুলবধূ। অল্পভাষী আর বেজায় রাশভারী মানুষটি—আসিয়া অবধি জগদম্বার পাঁঠা খাওয়া বন্ধ করিয়াছেন। প্রথম একদিন বলির পর এমন কুরুক্ষেত্র কাণ্ড করিয়া তুলেন যে, মা নাকি সেই রাত্রেই বিষ্ণু ভট্টাচার্যের নিকট আবির্ভূত হইয়া কাতরভাবে বলেন, বাবা বিষ্ণু, ঢের হয়েছে, এত হেনস্তার চেয়ে বরং আমায় কুমড়ো-বলিই দিস তদ্দিন।

কথাটা বিষ্ণু ভট্টাচার্য্য বড় দুঃখের সহিত দুই-একজনের কাছে জাহির করিয়াছেন, ভগ্নীরও কানে উঠিয়াছে, কিন্তু কোন প্রতিকার হয় নাই। তবে, এমনি তিনি কোন কথাতেই থাকেন না। ভিতর-বাড়িতে জগন্নাথের বিগ্রহ, নানামতে তাঁহারই সেবায় দিন কাটে।

একটি ঝি আছে, একটি বামুনের মেয়ে আসিয়া রাঁধিয়া দিয়া যায়। এই সংসার—দুইটি ঠাকুর, আর এই কয়টি মানুষ। প্রকাণ্ড বাড়ি—

পূজাপার্ব্বণে কাজেকর্ম্মে আত্মীয়-স্বজনদের জোয়ার আসে, ভাঁটার সময় অধিকাংশ ঘরই তালাবন্ধ থাকে।

রাধারাণীর কাজ বাঁধা। ভোরে উঠিয়া স্নান সারিয়া, এলোচুলের একটি সরু গোছায় একটা গেরো দিয়া, কালীপদকে ডাকিয়া তোলে। দুইজনে ফুল তুলিতে বাহির হইয়া যায়। গাছে উঠিবার পালা থাকে কালীপদর। অশোক আছে, পলাশ আছে, চাঁপা আছে। সুবিধা পাইলে কালীপদ ফুল তুলিয়া রাধারাণীর কোঁচড়ে ফেলিয়া দেয়। যখন হাতের কাছে পায় না, কিংবা যখন আগডালের দিকে অগ্রসর হইতে সাহস পায় না, পা দিয়া দুলাইয়া দুলাইয়া রাধারাণীকে ধরাইয়া দেয়। রাধারাণী হাসিয়া বলে, ঘেন্না ধরালে তুমি পুরুষ নামে, ভয়েই সারা! কি বলব, আমার হাত নিস্‌পিস্‌ করছে, নেহাৎ নাকি ইয়ে হয়েছি, তাই···

'ইয়ে' হওয়ার জন্য যে বড় একটা আটকায় এমন নয়। গাছটা একটু ঝাঁকড়া হইলে, এদিক ওদিক দেখিয়া লইয়া বধূ কখন উঠিয়াও পড়ে, এ-ডালে ও-ডালে পা দিয়া অসম্ভব অসম্ভব জায়গায় গিয়া কোঁচড় ভরিতে থাকে; কালীপদ ত্রস্তভাবে ডাকিতে থাকে, চ'লে এস,···রাধু, শুনছ? তোমার পায়ে পড়ি···এইবার তা হ'লে আমি চেঁচাব··· চেঁচাই?···ও বা···

শাসনের ভঙ্গীতে রাধারাণীর চোখের তারকা আয়ত হইয়া উঠে, বলে, ডাকো বাবাকে, শেষ করেছ কি আমি হাত-পা ছেড়ে নাপিয়ে পড়েছি—বাবা এসে দেখবেন তালগোল পাকিয়ে ম'রে প'ড়ে আছি···

যা মেয়ে, ও তা স্বচ্ছন্দে পারে, কালীপদর আর সন্দেহ থাকে না। বেচারী জোর কাকুতি-মিনতি লাগাইয়া দেয়; লোভ দেখায়; লম্বা কিছু একটা আঁটে আঙুলের দ্বারা এই ধরনের একটা মুদ্রা সৃজন করিয়া বলে, দেখ, এই এনে দোব, ঘোষালদের পুকুরপাড় থেকে, পেকে হলদে হয়ে রয়েছে—সত্যি—

জিনিসটা কামরাঙা। তবে রাজী হওয়া না-হওয়া নির্ভর করে রাধারাণীর মেজাজের উপর। এক-একদিন যেন কোন মন্ত্রের আকর্ষণে

নামিয়া আসে, কামরাঙার নামে মুখে এত লালা জমিয়া উঠে যে, কথা কহা শক্ত হইয়া পড়ে; সামলাইবার চেষ্টায় মুখে একটা চক্‌চক্ শব্দ করিতে করিতে বলে, ঠিক বলছ? ঠিক? মা কালীর খাঁড়ার দিব্যি —মিথ্যে বললে তেরাত্তির কাটবে না···আচ্ছা, তিন সত্যি গালো···

একেবারে তেরাত্তির লইয়া গালাগাল! মুখটি ভার করিয়া কালীপদ বলে, আমি না তোমার বর হই?

এ-ধরনের আলাপনে এক-একদিন কথায় কথায় ঝগড়াও হয়; আবার কোনদিন রাধারাণী একটু অপ্রতিভ বা অনুতপ্ত হয়—যেমন মেজাজ থাকে; বলে, হ্যাঁ, তাই আমি বললাম নাকি? চললাম—যদি মিথ্যে বলো—'যদি'র কথা···

চলিতে চলিতেই হয়তো হাতটা ধরিয়া ধীরে ধীরে বলে, সে সব কিচ্ছু হবে না, আমি রোজ মা-কালীর কাছে মাথা খুঁড়ি—'হে ঠাকুর, দেখো, যেন···'

ঝোঁকের মাথায় একটু বলিয়া আবার লজ্জা হয়, হাতটা ছাড়িয়া দিয়া বলে, হ্যাঁঃ, মাথা খুঁড়ি, না আরও কিছু, মিছিমিছি বলছিলাম; ব'য়ে গেছে আমার পরের জন্যে মাথা খুঁড়তে!

পূজার যোগাড় করিবার সময় আর এক রূপ, রাধারাণী তখন মহা তাত্ত্বিক একজন।—চন্দন ঘষিতে ঘষিতে কিংবা স্তরে স্তরে বিল্বপত্র গুছাইতে গুছাইতে প্রশ্ন করে, তা হ'লে গিয়ে কালী কার মেয়ে হলেন, বাবা?

শ্বশুর হাসিয়া উত্তর দেন, উনি আবার কার মেয়ে হ'তে যাবেন, মা? বিশ্বপ্রসবিনী, উনিই তো সবার মা।

তবুও তো কেউ না-কেউ বাপ-মা ছিলই। শিবঠাকুরের সঙ্গে বিয়ে দিলে কে?—কালী তো আর ফিরিঙ্গী নন, বাবা; তাদের শুনেছি নাকি···

পাগলী মেয়ে! শ্বশুর বাধা দিয়া বলেন, ওদের কি আবার বিয়ে দেওয়ার জন্যে বাপ-মায়ের দরকার হয় মা?—প্রকৃতি আর পুরুষ—অনাদি কাল থেকেই ওদের লীলা···

আমিও তাই বলি। বাপ-মা থাকলে একটু ব্যবস্থা হ'তই। দেখ না, গায়ে একখানি গয়নার পর্য্যন্ত বালাই নেই ;—আহা!···আর রাধারমণের দেখ না বাবা,—বাবা হলেন বসুদেব, না হয় ধরো নন্দই হ'ল, তিনিও তো হাঘরে ছিলেন না? কেমন গয়নাগাঁটি, মোহনচূড়ো, রেশমের কাপড়ে জমজম করছেন ঠাকুর!···আর এদিকে দেখ না,—কপালগুণে বরটিও তেমন জুটেছেন···আহা!

হয়তো প্রতিমার দিকে চোখ তুলিয়া চায়। শূন্যদৃষ্টি উদাসিনী প্রতিমার দিকে চাহিয়া চাহিয়া কেমন যেন একটা মায়ায় মনটি সিক্ত হইয়া আসে। ক্রমে অন্যমনস্কতায় হাতটি শিথিল হইয়া আসে—আহা, বড় যেন রূঢ় কথা বলা হইয়াছে ; ওঁর বাপ-মা থাক্ না-থাক্, উনি তো সবার মা!—ঠিক হয় নাই বলাটা···হঠাৎ মনে পড়িয়া যায়—বিয়ের কয়েকদিন আগে কি-একটা কড়া কথায় তাহার নিজের মায়ের চোখ দুইটি এই রকমই করুণ হইয়া উঠিয়াছিল···হারুদের মার মুখখানি চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে—স্বামী বিছানায় পড়িয়া, একা মেয়েমানুষ বাড়ি বাড়ি পাট সারিয়া দুপুরে ফিরিতেই ছেলে-মেয়েতে সাতটি যখন ঘিরিয়া ফেলিত ···আবার ছোট মেয়েটির নিত্য রাঙা কাপড়ের ফরমাশ···নিজে এদিকে চিরকুট-পরা, সাত জায়গায় তালি···কোলে তুলিয়া লইয়া চুমা খাইতে খাইতে বলিত,—হ্যাঁ, দোব বইকি, দোব না?—এই রকম ঠিক মুখের ভাবটি হইত। রাধারাণীর মাতৃবিরহিত মনের সামনে এই রকম কত মার ছবি ফুটিয়া উঠে—যত জায়গায় যত মা দেখিয়াছে, সবার—ঐ রকম সব চোখ, বেদনাতুর দৃষ্টি সব ছাড়াইয়া যেন কোথায় গিয়া পড়িয়াছে ; কেমন যেন একটা অতৃপ্ত ভাব—মা-মা মাখানো।

ঠাকুরে মানুষে মিশিয়া একাকার হইয়া যায়—হঠাৎ মায়ের জন্য বড় মন কেমন করিয়া উঠে, আর তেমনি আকস্মিক ভাবেই প্রতিমার উপর মন করুণায় ভরিয়া উঠে—কোথায় তোমার ব্যথা, মা? তুমি এমন সর্ব্বহারা কেন হ'তে গেলে?···

শ্বশুর আড়চোখে দেখেন—বধূ হাঁটুর উপর চোখ ঘষিয়া অশ্রু মুছিতেছে। টোকেন না।

স্বামীর কাছে রাধারাণী অন্তরের বেদনাটা না জানাইয়া থাকিতে পারে না। বলে, আহা, আমার এত কষ্ট হচ্ছিল দেখে আজ, কে জানে কেন! ঠাকুরেরা হোন ঠাকুর,—কিন্তু এ তো মানুষের মতন!...

কালীপদ এক কথায় সব উল্টাইয়া দেয়, দেখ তো বোকামি মেয়ের? কালীঠাকুর কিনা ভালোমানুষ। অমন ভয়ংকর ঠাকুর নাকি আছে?—পার তুমি স্বামীর বুকে পা দিতে?...ডাকাত যে ডাকাত, তাকেও কালীপুজো করতে হয়...

রাধারাণী একটু অন্যমনস্ক হইয়া যায়। বলে, তা জানি মশাই, আমায় আর বলতে হবে না।

ছেলেবেলার একটি দৃশ্য মনে পড়িয়া যায়। সে সাজিত কালী, গোবরা সাজিত ডাকাত, নন্তেদের পাকা-ফলে-রাঙা 'মোহনভোগ' আমগাছটা হইত রাজবাড়ি...

কতকটা এই সব স্মৃতিতে, কতকটা স্বামীর কালী-গুণকীর্ত্তনে মনের সেই দুর্ব্বল করুণ ভাবটি কাটিয়া যায়। আবার পূর্ণ উৎসাহে গাছে উঠা, জলে ঝাঁপাইঝোড়া, বাগান কাঁপাইয়া হাসি, ছুটাছুটি, দাপাদাপি চলে; স্বামীর বুকে পা উঠে না বটে, তবে ফরমাশে, ধমকানিতে, টানা-হিঁচড়ানিতে সে বেচারীকে যে নির্য্যাতনটা সহ্য করিতে হয়, তাহার তুলনায় শিবঠাকুরকে ভাগ্যবানই বলা চলে। কালীপদ বড় দুঃখে এক-একদিন বলিয়া ফেলে, তুমি ভাই কালীঠাকুরের বাবা! স্বামী ব'লে আমায় একটুও মান্য কর না।...

মাঝের পাড়ায় নবনারীতলায় যাত্রা ছিল; 'সুভদ্রা-হরণ' পালা; বিকালবেলা শেষ হইল। পিসীমা যে রকম গুছাইয়া-সুছাইয়া নবনারীর মন্দিরে মালায় বসিলেন, শীঘ্র উঠিবার সম্ভাবনা নাই। কালীপদ সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবার জন্য থাকিয়া গেল। অর্জ্জুন-সুভদ্রার কেমন একজোটে কাজ! রাধারাণীর মনে অব্যক্ত কি একটা হইতেছিল, বলিল, তুমি তার চেয়ে চল না কেন?—ঝি থাক্।

কালীপদের মনে অর্জ্জুনের বীরত্বের আঁচ তখনও লাগিয়া আছে, বলিল, তা কি হয়? একজন বেটাছেলে থাকা ভালো।

রাধারাণী নীচের ঠোঁটটা একবার উল্টাইল—বিদ্রূপে; তাহার পর ঝিয়ের হাত ধরিয়া বাড়িমুখো হইল।

পথে কথায় কথায় বলিল, সুভদ্রাঠাকরুণ কেমন কড়া হাতে রাশ বাগিয়ে ধরল, ঝি!

ঝি বলিল, সব মেয়েমানুষেই পারে। তাহার পর রাধারাণীর জিজ্ঞাসু দৃষ্টির উত্তরে বলিতেছিল, আহা, দিদিঠাকরুণ যেন কিছু জানেন না,—কেন মেয়েমানুষের ঘোড়া হ'ল সোয়ামী, রাশ মানে হ'ল···

এমন সময় তাদের ঠিক সামনে একটা মাটির ঢেলা পড়িয়া চুর হইয়া গেল এবং তাহার সঙ্গে বাঁধা একটা কাগজের টুকরা ছিটকাইয়া রাস্তার ধারে পড়িল। ঝি 'ও মাগো!' বলিয়া গুটাইয়া-সুটাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

রাধারাণী একবার চারিদিকে দেখিয়া লইল—কেহ কোথাও নাই। একটু আগাইয়া গিয়া কাগজটা তুলিয়া লইল। নিজে পড়িতে জানে না; ঝি পড়িয়া দিল—তাহার পরিবারে সব যাত্রার গান বাঁধে; লেখা আছে—মার মহাপূজায় রক্ত তর্পণ। শনিবার, তিথি শ্রাবণ-অমাবস্যা। ভৈরব।

দুইজনে মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিল। 'সুভদ্রা-হরণ' দেখিয়া যে অনুপ্রেরণা জাগিয়াছিল তাহা আর বেশীক্ষণ রহিল না, বিশেষ করিয়া ঝির; জোরে হাঁটিতে হাঁটিতে সে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিল। বিষ্ণু ভট্টাচার্য্য মন্দিরে ছিলেন, চিঠিটা তাঁহার হাতে পৌঁছিল।

কথাটা রাষ্ট্র হইতে দেরি হইল না। তিন জায়গায় এই রকম চিঠি পড়িয়াছে, পাড়ার ঠিক তিনটি কোণে,—ওদিকে অধব চৌধুরীর বাড়ি, গ্রামের অপর প্রান্তে সনাতন চক্রবর্ত্তীর বাড়ি, আর মাঝখানে এই বিষ্ণু ভট্টাচার্য্যের বাড়ি। ভৈরব-ডাকাতের প্রথাটাই এই; লোকে এই জন্ত বলে—ভৈরব সর্দ্দারের মহাজাল পড়েছে।

কিন্তু এ তো সকলেরই জানা কথা মার আদেশ না পাইলে ভৈরব বাহির হয় না, তবে এ গ্রামে মার পূজায় কি ক্রুট হইয়াছে?

বিষ্ণু ভট্টাচার্য্য সমস্ত রাত মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া ধরনা দিয়া পড়িয়া-

ছিলেন, সকালে রুদ্ধ দ্বারের উপর করাঘাত পড়িল। দ্বার উন্মুক্ত করিয়া তিনি চৌকাঠের উপর দাঁড়াইলেন। সামনে দালান ভরিয়া একদল লোক। মুখপাত্র হিসাবে বৃদ্ধ নিবারণ ঘোষাল আগাইয়া আসিয়া বলিলেন, বিষ্ণু, ধন্না দিয়ে কার কাছে সাড়া পাবে?—মাকে কি রেখেছে? বলি-হীন শক্তি-পূজো—এ অনাচার গ্রামে সইবে না, হয় আজই ন'টি বলিদানের ব্যবস্থা কর, না-হয় মাকে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়ে এস—একের পাপে সারা গ্রাম যে যায়!

বিষ্ণু ভট্টাচার্য্য বলিলেন, আমার কি অসাধ কাকা? তবে···

চারিদিকে রব উঠিল, তবে-টবে নয়, পাঁঠার সব ঠিকঠাক, আমরা নিয়ে আসছি, আজ রক্তের স্রোতে গ্রামের পাপ ভাসিয়ে তবে কথা···

দলটা আস্তে আস্তে কিছুক্ষণের জন্য একটু পাতলা হইল, তাহার পর ক্রমেই আবার জমাট বাঁধিয়া উঠিতে লাগিল,—লোকের হাঁকডাকে, 'মা-মা' শব্দের সঙ্গে একপাল শিশুছাগের ত্রস্ত চীৎকার মিলিয়া জায়গাটাকে সরগরম করিয়া তুলিল।···ক্রমে পূজা শুরু হইল, হাঁড়িকাঠ পোঁতা হইল, একটি ছাগশিশুকে স্নান করাইয়া মন্দিরে উঠানোও হইল। মন্দির হইতে গলা বাড়াইয়া একজন প্রশ্ন করিল, বাজনদারেরা তোয়ের আছে?···নিক, ঢাকে ঘা দিক এবার···

কাঁসর, ঘণ্টা আর ঢাকে ঘা পড়িল।

এমন সময় সিংহাসনসুদ্ধ জগন্নাথকে বুকের কাছে লইয়া, নামাবলী গায়ে একজন গৌরকান্তি বিধবা খুব সহজভাবে ভিড় ঠেলিয়া আসিয়া বারান্দায় উঠিলেন, এবং একটু জলছিটা দিয়া, সিংহাসনটি রাখিয়া গম্ভীরভাবে তাহার সম্মুখে জপে বসিয়া গেলেন।

বাজনার আওয়াজ সঙ্গে সঙ্গেই থামিয়া গেল। তাহার অল্পক্ষণের মধ্যেই মানুষের ভিড়ও গেল, পাঁঠার কাতরানিও গেল; মন্দিরের মধ্যে শুধু বিষ্ণু ভট্টাচার্য্যের পূজার মন্ত্রগুলা শোনা যাইতে লাগিল—খুব সংযত স্বর।

সন্ধ্যার সময় রাধারাণী যখন আরতির যোগাড় করিতে আসিল, দেখিল মন্দির ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ। দরজায় ঘা দিল, ডাকাডাকি করিল;

যখন কিছুতেই দুয়ার খুলিল না, নিতান্ত মনমরা হইয়া চুপিচুপে বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। ঝি, রাঁধুনী আহারের জন্য ডাকিতে আসিয়া ঝাঁঝ দেখিয়া মানে মানে সরিয়া পড়িল। কালীপদ অনেক সাধাসাধি করিল, সে নিজেও খাইবে না বলিয়া ভয় দেখাইল, কোন ফল না হওয়ায় ধীরে ধীরে উঠিয়া আহার করিয়া আসিয়া পাশটিতে শুইয়া পড়িল।

ঘুম আসিতে কালীপদর বোধ হয় রাত হইয়া থাকিবে, সকালবেলা দিব্য ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া নিদ্রা দিতেছে। ওঠ, ওঠ, শীগ্‌গির ওঠ গো—বলিয়া তীব্র ঝাঁকানি দিয়া রাধারাণী তাহাকে ঠেলিয়া তুলিল। চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে কাত হইয়া কালীপদ প্রশ্ন করিল, কেন?

রাধারাণী ভীতকণ্ঠে বলিল, ডাকাত পড়েছে যে! তাহার পর কালীপদ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিতেই খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কালীপদ রাগিয়া বলিল, বাব্বা, কি মেয়ে যে!—এখনও বুকটা ধড়াস ধড়াস করছে।

রাধারাণী হাসিতে দুলিয়া দুলিয়া বলিল, যেমন ভীতু…

কালীপদ রাগতভাবেই বলিল, ভারী বীরপুরুষ আমার! ডাকাতদের ঠেকিও তারা হাজির হ'লে।

রাধারাণী তাচ্ছিল্যের সহিত ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, পারি না নাকি? —আহা, বড্ড শক্ত! ··ওরা মেয়েদের কিছু বলে না মশাই, তাতে কালো মেয়ে, তাতে আবার স্বপ্ন দেখেছি, মা-কালী এসে নিজের গায়ের রঙ আমায় খানিকটা মাখিয়ে দিয়ে গেলেন। ··বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? হাতটা কালীপদর মুখের কাছে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, এই দেখ, যায় নি হয়ে আর এক পোঁছ কালো?

তাহার পর স্বামীর গায়ে একটু ঢলিয়া কৃত্রিম করুণার স্বরে বলিল, আহা-হা-হা, একজনের ক'নে আরও কালো হয়ে গেল গো!…আহা-হা-হা, ম'রে যাই, ম'রে যাই!…

কালীপদ বলিল, হ'ল তো ব'য়েই গেল!…মা-কালী রঙের পোঁছ দিয়ে কি বললেন? বললেন বুঝি—'ডাকিনী-যোগিনী হয়ে আমায় সঙ্গে'…

রাধারাণীর মুখ হঠাৎ কৌতুকচ্ছটায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল; বলিল, ঠিক

কথা গো, স্বপ্নে আর একটা বড় মজা হয়েছে—বড্ড মজা; কিন্তু যা ভীতু তুমি, বলাই বৃথা, শুনলেই ভির্মি যাবে। আমার যেন মনে হ'ল, মা-কালী এসে বাবাকে মেঝে থেকে তুলে বললেন,—'ওঠ, আমি বাড়ি জুড়ে রয়েছি, ভয় কি?' তারপর হাসতে হাসতে আমার কাছে এসে···চল, ফুল তুলতে তুলতে সব বলছি, চল না·· কালীঠাকুর আবার এত নকলও জানেন!—কি, আমি নিজেই ঘুমুতে পারি নি, শুয়ে শুয়ে এই সব তন্দ্রায় দেখেছি, কে জানে?—বাবার জন্যে মনটা যা ছটফট করছিল···চল, ওঠ, সব বলছি···

অনেকক্ষণ ধরিয়া পুকুরধারের ধনুকপানা নারিকেল গাছটার গোড়ায় বসিয়া গল্প চলিল,—শুধু গল্পই নয়, কত সব জল্পনা-কল্পনা, মান-অভিমান, জেদাজেদি, এমন কি ছাড়াছাড়ি পর্য্যন্ত। শেষ নাগাদ কিন্তু আবার সব ঠিক হইয়া খেল; সাজিভরা ফুল-বিল্বপত্র লইয়া গলাগলি হইয়া দুইজনে বাড়িমুখো হইল। মন্দিরের সিঁড়ির কাছে আসিয়া কালীপদ বলিল, আমি তা হ'লে এক্ষুণি আসছি; ভয় করলে··

তাচ্ছিল্যের সহিত 'ইস্!'—করিয়া রাধারাণী মন্দিরে উঠিয়া গেল।

অমাবস্যা তিথি। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বিষ্ণু ভট্টাচার্য্য মন্দির হইতে বাহির হইলেন। কি ভাবিলেন তিনিই জানেন—ধীরে ধীরে বাড়িতে গিয়া সমস্ত ঘর সমস্ত দেরাজ-সিন্দুকের তালাচাবি খুলিয়া আবার শান্তভাবে নামিয়া আসিয়া চাবির তাড়াটা প্রতিমার পদমূলে রাখিয়া দিলেন।

বাবা!—বলিয়া রাধারাণী বিমূঢ়ভাবে প্রশ্ন করিতে যাইতেছিল, হাত তুলিয়া বারণ করিলেন। তাহার পর কি ভাবিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া নিজেই বলিলেন, আজ যে মা আসছেন, মা! আবার পূজায় বসিলেন।

রাত্রি যখন প্রায় দুই প্রহর অতীত হইয়াছে, হঠাৎ চক্রবর্ত্তীদের পাড়ায় প্রচণ্ড এক শব্দ উঠিল—রে-রে-রে-রে-রে···

কালীপদ আর রাধারাণী পূজার কাছে বসিয়া ছিল; কালীপদ একটু কাঁপা গলায় ডাকিল, বাবা!

উত্তর পাওয়া গেল না। বিষ্ণু ভট্টাচার্য্য অনেকক্ষণ হইতেই প্রণাম

করিতেছিলেন, বুঝা গেল সংজ্ঞা নাই। কালীপদ রাধারাণীর মুখের পানে চাহিল।

রাধারাণী বলিল, তোমার ভয় করছে নাকি?—বাবার মুখে শুনলে তো? ভয় করলে আমাদের বাড়িতে মা-কালী আর আসবেন কোথা থেকে?—বলিয়া বেশ সহজভাবেই হাসিয়া উঠিল।

ক্রমে কোলাহল আরও ভীষণ হইয়া উঠিল। ও-পাড়ার গাছপালার মধ্যে পুঞ্জীভূত অন্ধকার মশালের আলোয় খণ্ডিত হইয়া গিয়া বিকশিত-দ্রংষ্ট্রা দৈত্যের মত বিকট হইয়া উঠিল।

প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পরে দলটা এ-মুখো হইল। ভৈরব সর্দ্দার আগে আগে, পিছনে ধ্বংসোন্মত্ত প্রায় শতাবধি লোকের একটা দল, বাগানে প্রবেশ করিয়া সবাই সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। ভৈরব বলিল, আস্তে রে, এটা মায়ের বাড়ি।

একজন রুক্ষস্বরে উত্তর করিল, উপোসী মায়ের পূজো দিতে এসেছি, জানিয়ে আসব না?—এই কথার উপর আর একটা উগ্রতর নিনাদ উঠিল।

দলটা আসিয়া মন্দিরের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইল। মন্দির অভ্যন্তরস্থ দীপের স্তিমিত আলোকে দেখা গেল, রক্তচেলি-পরা একটি গৌরকান্তি পুরুষ প্রতিমার সামনে ভুলুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া আছে, অত শব্দের মধ্যেও নিশ্চল। সবাই ঠেলিয়া মন্দিরে উঠিতেছিল, ভৈরব পিছনের চাপে দুই পা অগ্রসর হইল, তাহার পর জমিতে শক্তভাবে পা পুঁতিয়া, দক্ষিণ হাতটা উঠাইয়া বলিল, না, উঠতে দে; অসাড়ের রক্ত মা খায় না; জাগুক, ততক্ষণ ও-দিকটা সেরে আসবি চল্ সব, কিছুর যেন চিহ্ন না থাকে···

দলের নির্দ্দিষ্ট একটা অংশ বাড়িটা ঘিরিয়া ফেলিল। গগন বিদীর্ণ করিয়া 'রে-রে' শব্দ, গ্রামের চতুঃসীমা হইতে তাহার প্রতিধ্বনি উঠিতেছে। সে যুগে ডাকাতরা প্রথমে সমস্ত গ্রামটা ঘিরিয়া ফেলিত।

মন্দিরের পিছনে, কাঠাকয়েক জমির পরেই বাড়িটা। মশালের ধূমমলিন আলোয় দূর থেকেই দেখা গেল, কোথাও জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্র নাই; পুরীর মুক্তদ্বার গৃহগুলার বাহিরে আলো পড়িয়া ভিতরকার অন্ধকারকে স্পষ্ট আর বীভৎস করিয়া তুলিল।

এ-ধরণের বিরোধহীন অবরোধে ভৈরব সর্দ্দার অভ্যস্ত ছিল না। ডাকাতি করিতে আসিয়া যদি উভয় পক্ষেই দুই-চারটা মাথা না পড়ে তো তরোয়ালে আর সিঁধকাঠিতে ব্যবধান থাকে কোথায়? পা তুলিয়া তাহার পা দুইটা যেন ভারালস বলিয়া বোধ হইল। নিশ্চল হইয়া একটু দাঁড়াইল, তাহার পর হঠাৎ জোর করিয়া আগাইয়া জোর করিয়াই রাগিয়া বলিল, আয় এগিয়ে, তোরা সব থমকে দাঁড়াস যে!

অনায়াস লুণ্ঠন। বাড়িটা যেন মুক্তাঞ্জলিতে সমস্ত ধনসম্ভার লইয়া অপেক্ষাই করিতেছিল, শুধু লওয়ার দেরি। ভৈরব সর্দ্দারের একটা অহেতুক অস্বস্তি বোধ হইতেছিল। সে কি ভাবিল বলা যায় না, শুধু একটিমাত্র মশাল আর মাত্র জন পাঁচেক লোক সঙ্গে রাখিয়া বাকি সমস্তই বাহির করিয়া দিল। বোধ হয় ভাবিল, অন্ধকার বাড়িতে খুঁজিয়া-পাতিয়া আঘাত খাইয়া লুণ্ঠন করিলে তবুও বিরোধের একটু আস্বাদ পাওয়া যাইবে, তবুও ডাকাতির মর্য্যাদাটা কতকটা বজায় থাকিবে। মানুষের নিকট নিরাশ হইয়া সে যেন অন্ধকার বাড়িটাকে সজীব করিয়া তাহাকেই যুদ্ধে আহ্বান করিল।

সবচেয়ে ক্ষীণশিখ মশালটা লইল, নিজের হাতেই লইল। তাহার পর সেই অল্পসংখ্যক সঙ্গী লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। এ-ঘর ও-ঘরের ভিতর দিয়া, ডালাখোলা বাক্স উজাড় করিয়া, বারান্দা দিয়া চলিয়া আসিতে একটা একটু প্রশস্ত জায়গা; তাহার পর সরু এক ফালি গলি, ধূমে আর ছয়টা লোকের বিকট ছায়ায় যেন ভরাট হইয়া গেল। কোনখানে একটু শব্দ নাই, আর্ত্তনাদ নাই; নিস্তব্ধতার মধ্যেও যে স্তম্ভিত প্রাণের একটা পরিচয় সে পাইয়া আসিয়াছে এই প্রাণহীন পুরীতে, সেটার অভাব তাহাকে পীড়িত করিতে লাগিল। এই অস্বাভাবিক অবস্থায় সর্দ্দারের কেবলই মনে হইতে লাগিল, আজ মায়ের শ্মশানকালীর পায়ে জবাফুল দাঁড়ায় নাই, মা পূজা লন নাই।... মনকে শান্ত করিবার জন্য মনে মনে বলিল, মা, তোমার পূজো আজ এইখানেই; তপ্ত রক্তে পূজো চাই, তাই জবায় তুষ্ট হও নি। তুমি আজ শ্মশান ছেড়ে এস, ভক্ত তোমার জন্যে আজ এইখানেই শ্মশান সৃষ্টি ক'রে দেবে।

ভৈরব কোমরে জড়ানো রক্তাম্বরের মধ্য হইতে একটা বোতল বাহির করিয়া তাহার মধ্যের তরল পদার্থ ঢকঢক করিয়া গলায় খানিকটা ঢালিয়া দিল,—কারণ-বারি। পরে চিত্তের দুর্ব্বলতা জয় করিবার জন্যই হোক, বা যে জন্যই হোক, মশাল তুলিয়া একবার 'জয় মা!' করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—পাঁচজনে যোগ দিল, উন্নত মশালের আলোয় ছায়াগুলা যেন হঠাৎ উচ্চকিত হইয়া উঠিল।

প্রশস্ত একটা প্রাঙ্গণে আসিয়া পড়িল। ওদিক দিয়া উপরের সিঁড়ি। সিঁড়ি দেখিয়া তাহার মনটা আবার নাচিয়া উঠিল,—সিঁড়ি বাহিয়া উঠিবে না, লাঠিতে ভর দিয়া একেবারে এক লাফে আলিসার উপর,—মশালের শিখা রক্তমাখা জিভের মত উঠিতেছে লকলকাইয়া—তবুও একটা যা-হোক কিছু হয় তাহাতে।

ভৈরবের কারণ-মথিত রক্ত শিরায় শিরায় চনচন করিয়া উঠিল, 'তুলে ধর্'—বলিয়া মশালটা পিছনে একজন সঙ্গীর হাতে দিয়া, একটা হুঙ্কারের সঙ্গে মাথার উপরে ঘুরাইয়া লাঠিটা পাতিতে যাইবে, হঠাৎ সিঁড়ির অন্ধকারে গলির দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাহিয়া, নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ বিস্ময়ে যেন স্থাণুবৎ হইয়া গেল; তাহার পর লাঠি ফেলিয়া মশাল লইয়া ধীরে ধীরে গলির দিকে অগ্রসর হইল। দুই-একজন সঙ্গে আসিতেছিল, ভৈরব ফিরিয়া দাঁড়াইল। চক্ষু দুইটা আগুনের ভাঁটার মত জ্বলিতেছে, চাপা গলায় প্রশ্ন করিল, দেখেছিস?

দুই-একজন শুধু স্থির দৃষ্টিতে তাহার চোখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহারা দেখিয়াছে; দুই-একজন কিছুই বুঝিতে না পারিয়া মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। ভৈরব তাহাদের সবাইকেই ইঙ্গিতে অপেক্ষা করিতে বলিল; ভয়ে, বিস্ময়ে, আশায় তাহার চক্ষু দুইটা যেন ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। অগ্রসর হইল।

ঠিক যেখান হইতে সিঁড়িটা উঠিয়া গিয়াছে, তাহার পাশে ঈষত্তরলিত অন্ধকারে ছায়াকল্প এক মূর্ত্তির আভাস, মশালের চঞ্চল আলোক পড়িতেই পিছনে যেন একটু সঙ্কুচিত হইয়া গেল। কারণ মাথার শিরা-উপশিরায় আগুন ধরাইতেছিল, ভৈরব তখনই নিজের ভুলটা বুঝিতে পারিল—মা

আসিয়াছে বটে, শ্মশানবাসিনী ভক্তের আহ্বান শুনিয়াছে; কিন্তু সে যে আঁধারময়ী, স্পষ্ট আলোকের বস্তু তো নয়; আলোক-সম্পাতে লুপ্ত অন্ধকারের সঙ্গে এখনই, এই পরমুহূর্ত্তেই এ কোথায় বিলীন হইয়া যাইবে, আর জন্মজন্মান্তরের সাধনায়ও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। এক মুহূর্ত্তেই ভুলটা লইয়া যাইত; কিন্তু ভৈরব সমস্ত চেতনা একত্র করিয়া হাতের মশালটা ক্ষিপ্রগতিতে দূরে ফেলিয়া দিল। বাঁকা গলির ভিতর দিয়া সেই নির্ব্বাণপ্রায় মশালের সামান্য একটু আলো কুণ্ঠিতভাবে প্রবেশ করিল মাত্র। ভৈরব একবার গাঢ় স্বরে ডাকিল, মা! তাহার পর সেই ঘনায়মান অন্ধকার ভেদ করিয়া প্রাণপণ শক্তিতে নিজের উৎসুক দৃষ্টিরেখাকে সম্মুখে চালিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

ক্রমে তাহার মনে হইল—সেই অতি ক্ষীণভাবে প্রদীপ্ত অন্ধকার স্থানে স্থানে জমাট বাঁধিয়া উঠিল—প্রথমে ভূমিতলে এক শয়ান মূর্ত্তি, মাথার দিকটা একটু স্পষ্ট, বাকিটা অল্পে অল্পে গাঢ়তর অন্ধকারে মিশিয়া গিয়াছে। মাথায় জটাজুট—বিসর্পিত, বিক্ষিপ্ত; পাশেই তাহার উপর চরণ তুলিয়া এক দীর্ঘ, অপূর্ব্ব নারীমূর্ত্তি!—সারা দেহ ঘিরিয়া আলুলায়িত চূর্ণ কেশভার; বাম করে খড়্গ, দক্ষিণ কর বরাভয়ে তোলা—ত্রস্ত বিশ্বের উপর মায়ের স্বস্তি যেন ঝরিয়া পড়িতেছে।···ভৈরব চক্ষু মুদিল, আর চাহিয়া থাকিতে সাহস হয় না,—সেই মূর্ত্তি ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে, ভয় হয়, বুভুক্ষু দৃষ্টির সামনে বুঝিবা বিলীন হইয়া যাইবে; অমানিশার অন্ধকার মূর্ত্তিতে জমাট হইয়া উঠিয়া আবার ঐ তমোসমুদ্রে মিশিয়া একাকার হইয়া যাইবে।

তখনও রাত্রি আছে; অতি সামান্য একটু আলোর আভাস পূর্ব্বাকাশে দেখা গিয়াছে। শঙ্কাদুর্ব্বল গ্রামটা নিস্তব্ধ। রাধারাণী উপরে পিস্‌শাশুড়ীর ঘরে গিয়া ডাকিল, পিসীমা, ও পিসীমা, শীগগির ওঠ।

বিগ্রহের বেদীতল হইতে ধীরে ধীরে উঠিয়া পিসীমা বিহ্বলভাবে চাহিলেন। রাধারাণী বলিল, আর দেরি ক'রো না, শীগগির চল, ওর কি হয়েছে, কথা কইছে না।

পিসীমা আচ্ছন্নভাবে প্রশ্ন করিলেন, কার?···কোথায়?

রাধারাণী কোন উত্তর দিলনা এবং আর ক্ষণমাত্রও অপেক্ষা না করিয়া

তাঁহাকে জোর করিয়াই তুলিল এবং বাম হস্তে প্রদীপটা লইয়া তাঁহাকে একরককম টানিয়াই লইয়া চলিল।

সিঁড়ি দিয়া ক্ষিপ্রগতিতে নামিল, তাহার পর সিঁড়ির পাশে মাটির দিকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, ঐ দেখ, কি হয়েছে, নড়েও না, কথাও কইছে না, আমি কিছু বুঝতে পারছি না বাপু!

পিসীমার ঘুমের ঘোর কাটিয়া গেল, একেবারে শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন, এ যে কালীপদ আমাদের। মাথায় যাত্রার শিবের জটা কেন? টিনের সাপ, ছাপা বাঘছাল? কি এসব ব্যাপার বউমা?···জল দাও, জল দাও শীগগির, অজ্ঞান হয়ে গেছে যে গো!···আর এসব গয়না-পত্র, টাকাকড়ির রাশ! ব্যাপারখানা কি?—কালীপদ এখানে এল কি ক'রে?···

জল নিকটেই ছিল, রাধারাণী তাঁহার হাতে ঢালিয়া দিতে দিতে বলিল, শোন কথা পিসীমার! কি ক'রে এল তা কি আমি জানি? দেখলাম গোঁ-গোঁ করছে, কথা কয় না, কিছু না, ভালোমানুষি ক'রে তোমায় ডেকে আনতে গেলাম···ভয়ে কি আমারই জ্ঞানগম্যি আছে?···'কি ক'রে এল!' ···আমি যদি সঙ্গে থাকতাম তবে তো বুঝতাম গা—কি ক'রে এল···

একটু থামিয়া, কি ভাবিয়া গলায় অভিমানের সুর আনিয়া বলিল, তোমার যেমন সন্দেহ দেখছি পিসীমা, জ্ঞান হয়ে ও যদি বলে—আমিও এর মধ্যে ছিলাম, তুমি নিশ্চয় চট ক'রে বিশ্বাস ক'রে নেবে।

মাসী

মস্ত বড় দোতলা বাড়ি। বাইরে মহলটা আলাদা। ভিতরে দুইটি মহল, রান্না-বাড়িটা ধরিলে তিনটা। বাড়ির এক কোণ থেকে ডাক দিলে অন্য কোণে সব সময় আওয়াজ পঁহুছায় না।

এত বড় বাড়িটাকে জিয়াইয়া রাখিয়াছে দুইটি শিশুতে।

কেমন ধারা একটু শোনায় বটে; প্রশ্ন উঠে, তবে আর সবাই গেল কোথায়?

আর সবাই সংসারটাকে বাঁচাইয়া রাখিতে ব্যস্ত—আজকের সংসার আবার ভবিষ্যতের সংসারও। ঠাকুরমা, দিদিমা, মাসী, পিসীতে অনেক-গুলি বৃদ্ধা,—তাঁহারা পুষ্পে নৈবেদ্যে ঠাকুরদের তুষ্ট করেন,—তোমরাও খাও-দাও ঠাকুর, এদেরও খাওয়াদাওয়ার দিকে একটু নজর রেখো।

যাঁরা গিন্নীর দলের তাঁহাদের তো উদয়াস্ত দম লইবার সময় থাকে না; রান্নার দিকে নজর রাখো, বাজারের দিকে নজর রাখো, আপিস-ইস্কুলের ব্যবস্থায় যেন এতটুকু না গাফিলতি হয়, আরও সব নানানখানা; এঁদের পরে যাঁরা, তাঁদেব এতদুভয়ের ফাই-ফরমাশ খাটিতে খাটিতে দম বন্ধ হইয়া আসে—পূজার চন্দন ঘষা থেকে পান সাজা, স্কুলগামী ছোট দলের ধোওয়ানা-মোছানো জামাকাপড়-পরানো পর্য্যন্ত।—অর্থাৎ সংসারের বর্ত্তমান থেকে ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত।

কর্ত্তারা সংসার বাঁচাইয়া রাখার একেবারে গোড়ার ব্যাপার লইয়া ব্যস্ত—অর্থাৎ রোজগারের ব্যাপার। সকাল থেকে মক্কেল, রোগী—একটু ডাইনে-বাঁয়ে চাহিবার ফুরসত থাকে না। বৈকালে হয়তো একটু ক্লাব, সেখানেও উদ্দেশ্য ঐ একই—অর্থাৎ সংসারটিকে জিয়াইয়া রাখা। তাহার জন্য নিজের নিজের প্রাণশক্তিকে অটুট রাখিতে হইবে তো?—তাই ক্লাব, অথবা অন্যভাবে একটু চিত্তবিনোদন।

কিন্তু সংসার বাঁচাইয়া রাখা আর বাড়ি বাঁচাইয়া রাখা এক কথা নয়। বিধাতাপুরুষ যে মন্ত্রে বাড়ি বাঁচাইয়া রাখেন সে মন্ত্রের সঙ্গীত একটু অন্য ধরনের। তাহার জন্য বাছিয়া লন শিশুর কণ্ঠ। এ বাড়িতে আছে মিটু আর তুলতুল, বয়স আড়াই থেকে তিনের মধ্যে ; তুলতুলটি মেয়ে, সেই ছোট।

সত্যই তুলতুল ; এত নরম যে চলা-ফেরার মধ্যে কেন এলাইয়া পড়ে না, সেইটাই আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয়। যেখানেই হাত দাও—কাঁধে, হাতে, পিঠে, গাল দুইটিতে, আঙুলগুলি যেন খানিকটা মাখনের তালে বসিয়া যায়। চোখ দুইটি স্বপ্নালু, মাথায় কোঁকড়া-কোঁকড়া এক-মাথা কালো কুচকুচে চুল—রেশমের মতো হালকা আর মসৃণ। পাতলা ঠোঁট দুইটি যখন নড়ে, মনে হয় ঐটুকুতেই যেন রক্ত ফাটিয়া পড়িবে। স্বভাবটিও বড্ড নরম ; কিন্তু মিটুর সংসর্গে নরম থাকা দিন-দিনই নাকি কঠিন হইয়া উঠিতেছে।

মিটুটি অতিরিক্ত দুষ্ট, চঞ্চল আর ধূর্ত্ত। কথাগুলায় জিবের একটুও জড়তা নাই ; মনে হয় পাঁচ-ছয় বছরের ছেলে কথা কহিতেছে। কথার বাঁধুনির বিষয় যদি ধরা হয় তো যে কোন বয়সের লোকের মুখেই বেশ মানায়। কিছু বলিলে বুড়োদের মতো ভ্রূ দুইটি কুঞ্চিত করিয়া চোখে চোখ রাখিয়া শোনে, একটু ভাবে, তাহার পর উত্তর দেয়।

বারান্দার ও-দিককার ঘরে প্রবল উৎসাহে মাতামাতি করিতেছে ; একটু কড়া গলায়ই ডাকিলাম, মিটু, একবার এদিকে আসতে হবে।

এখানে বলিয়া রাখা ভালো যে, অপরিচিত না হইলেও অনেকটা নূতন আমি মিটুর পক্ষে। উহাদের লইয়া যাইবার জন্য উহাদের মামার বাড়ি আসিয়াছি। মিটু দাপাদাপি স্থগিত রাখিয়া দুই পা অগ্রসর হইয়া আবার থামিয়া গেল। মা আর ভাইদের কাছে শুনিয়াছে আমি নাকি একটু কড়াপ্রকৃতির মানুষ ; ডান হাতের চারিটি আঙুল দাঁতে চাপিয়া আমার পানে চোখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল, কেন মেজকাকা, একটা কথা বলবে ?

অর্থাৎ সামান্য কোন একটা কথাই তো ?—মারধোর করিবার উদ্দেশ্য

নয়? তাহা হইলে সে দূর হইতে আপন পথ দেখে। দাদুরা আছে, দিদিমারা আছে, মামার বাড়িতে নিরাপদ স্থানের অভাব নাই।

ছেলেটি ইংরাজীতে যাহাকে বলে প্রডিজি তাই, অবশ্য দুষ্টামির দিক দিয়া; ওর সাহচর্যে তুলতুল যদি কাঠিন্য লাভ করে তো তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই।

দুইটির সঙ্গে ভালো করিয়া পরিচয় হইল সকালে জল-খাবারের সময়। কুটুমবাড়ির আয়োজন—ডিশে প্লেটে সাজানো ফল, মিষ্টান্ন, টোস্ট, কেক্, ট্রেতে চায়ের সরঞ্জাম। মিটুর দিদিমা সামনে একটি কৌচে বসিয়া গল্প করিতেছেন। একটা উদ্দেশ্য নিশ্চয় এই যে, কিছু ফেলিয়া না রাখিয়া গল্পের ফাঁকে ফাঁকে একটি একটি করিয়া সমস্তগুলির সদ্‌ব্যবহার করি। বেশ একটু অস্বস্তিজনক অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। গল্পের মধ্যেই অনুরোধ-উপরোধও আসিয়া পড়িতে লাগিল; একটি রাখিতে হইল, একটি কাটাইলাম, তৃতীয়টি লইয়া টানাটানি চলিতেছে, এমন সময় ওঁর একটা জরুরী তলব আসিল। সমস্তগুলি শেষ করিবার একটা পাইকারি হুকুম রাখিয়া উনি উঠিয়া গেলেন।

একে লড়াইয়ের বাজার, কিছু পাওয়া যায় না, সামান্য যা পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে ফেলিয়া রাখিলে তিনি শুনিবেন না। বলিয়া গেলেন কাহাকেও পাঠাইয়া দিতেছেন।

বলিলাম, তা হ'লে এমন কাউকে পাঠিয়ে দেবেন মা, যিনি এই এতগুলো জিনিসকে কিছু পাওয়া গেল না ব'লে না ধরেন।

না বাবা, বাজে কথা শোনা হবে না—বলিয়া চলিয়া গেলেন।

উনি যাইবার একটু পরে পিছনে শিশুকণ্ঠে অল্প একটু গলা-খাঁকারি দেওয়ার শব্দ হইল; ফিরিয়া দেখি, পিছনের দোরের চৌকাঠে দাঁড়াইয়া মিটু। একবার দেখাটা হইয়া যাইতে চক্ষুলজ্জাটা ভাঙিয়া গেল বোধ হয়, আসিয়া সোফার পিছনটিতে দাঁড়াইল।

আর এক কাপ চা ঢালিতে ঢালিতে প্রশ্ন করিলাম, কি মনে ক'রে?

খাবারগুলির দিকে চাহিয়া ছিল, একটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল, বলিল, এমনি।

বড়দের মতো এই কথাটি খুব রপ্ত করিয়া রাখিয়াছে মিটু। সর্ব্বদাই কিছু না কিছু উদ্দেশ্য লইয়া থাকে বলিয়া ঐ কথাটি দিয়া অনাসক্তির ভাবটা ফুটাইয়া রাখিবার চেষ্টা করে; ওর-সঙ্গে একটু বেপরোয়া ভাব মিশাইবার অভিপ্রায় হইলে বলে, এমনি—ইচ্ছে।

একটি কেক্ ভাঙিয়া মুখে দিলাম, নিজের মনেই বলিলাম, বাঃ, চমৎকার কেক্‌টি দিয়েছে তো, কী মিষ্টি!

মিটু একবার আড়চোখে কেক্‌টির পানে চাহিল, আর একটি দীর্ঘশ্বাস পড়িল। প্রথম গ্রাসটি শেষ করিয়া আবার তুলিয়াছি কেক্‌টা, মিটু প্রশ্ন করিল—মেজকাকা, বাড়িতে কে কে আছে? আছেন বলতে হয়, না?

বলিলাম, হ্যাঁ। তোমার দাদু আছেন, জেঠামশাইরা আছেন, জেঠাইমারা, কাকারা, খুড়ীমারা, দাদারা, দিদিরা—

মিটু বলিল, জান মেজকাকা? তুলতুল বড্ড হ্যাংলা, আমি তাড়িয়ে দিয়েছি।

বাড়িতে পাঁচ-ছয়টি হ্যাংলা-পরিবৃত হইয়া আহার করা অভ্যাস, মিটুর দিদিমা-বর্ত্তমানে সেই অভাবটাই এতক্ষণ সব চেয়ে বেশী অনুভব করিতেছিলাম। যাই হোক একটিকে পাওয়া গেছে আপাতত; তাহারই লোভটুকু ভালো কবিয়া উপভোগ করিবার ইচ্ছা দমন করিতে পারিলাম না। বলিলাম, আহা, ও ছেলেমানুষ কিনা; ছেলেমানুষ একটু হ্যাংলা হয়। তুমি তো বড় হয়ে গেছ মিটু, না?

কোন উত্তর পাইলাম না, মিটু শুধু চারিটি আঙুল মুখে পুরিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া স্থির দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া রহিল।

একখানি চায়ের রেকাবিতে একটু কেক্, দুইখানা বিস্কুট, কিছু কমলালেবুর কোয়া, একটি সন্দেশ, একটা রসগোল্লা আলাদা করিয়া রাখিলাম। মিটু স্থির লুব্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। বলিলাম, যাও, ডেকে নিয়ে এস তুলতুলকে এবার। আহা, ছেলেমানুষ, একটু হ্যাংলা হবে না? ও তো আর মিটুর মতন হয় বড় নি, হবে না হ্যাংলা একটু? যাও, ডেকে নিয়ে এস।

মিটু ভ্রূ দুইটা চাপিয়াই পরম অভিনিবেশের সহিত আমার কথাগুলো

শুনিতেছিল। বেশ দেখিতেছি, ওর মনের গভীরে একটি আলাদা চিন্তার ধারা বহিয়া চলিয়াছে। যাইবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না,—সোফাটার পিঠ ধরিয়া বার দুয়েক একটু দোল খাইল, বার দুয়েক তুলতুলের রেকাবিটার পানে চাহিল, তাহার পর বলিল, আমিও তো বড় হই নি।

আমি কপালে ভ্রূ তুলিয়া বলিলাম, সে কি কথা—তুমি বড় হও নি! মস্ত বড় হয়েছ যে, তুলতুলের চেয়ে বড়, খোকার দাদা! খোকা যেই ভাত খেতে শিখবে, 'দাদা দাদা' ব'লে কোলে উঠবে তোমার।

বেচারা একটু প্রবঞ্চিত হইল, বড় হওয়ার গুমরে আরও বার দুয়েক দোল খাইয়া বলিল, খোকা ঝিনুকে দুধ খায়, ন্যাংটো; আমি তো প্যাণ্ট পরি, খোকা তো খোকা; আমি তো মিটুবাবু।

বলিলাম, তা বইকি। আর খোকা তো হ্যাংলা, মাটি খায়। যাও, ডেকে আন তুলতুলকে।

মিটু পিছনের দুয়ারের দিকে চাহিল, ঘুরিয়া দেখি তাহার দিদিমার দীর্ঘ অনুপস্থিতির সুযোগে তুলতুল কখন আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ডাকিলাম, এই যে, এস তুলতুল, কখন থেকে তোমার জন্যে খাবার নিয়ে ব'সে আছি।

তুলতুল একবার পিছন দিকে চাহিল, ঘুরিয়া খাবারের পানে চাহিল, তাহার পর ঠোঁট ফুলাইয়া ট, ড, ড—এই রকম গোছের কতকগুলা অক্ষর সংযোগে এক অদ্ভুত উচ্চারণে কি একটা বলিল। মিটুর যেমন পরিষ্কার, এর গুলা তেমনি অস্পষ্ট, একেবারেই জিবের আড় ভাঙে নাই। লোকে যে টপ করিয়া ধরিতে পারে না এটা নিশ্চয় মিটুর জানা, বুঝাইয়া দিল, বলছে, ও হ্যাংলামি করবে না।

তুলতুলের দিকে চাহিয়া বলিলাম, না, তুমি এস, হ্যাংলামি হবে না, তোমার জন্যে তো খাবার রয়েছে; আলাদা থাকলে হ্যাংলামি হয় না; এস তো।

তুলতুল একবার পিছনে দেখিয়া লইয়া প্রবেশ করিল, তবে আমার কাছে না আসিয়া পাশটিতে গিয়া দাঁড়াইল। দুয়ারের দিকে আরও

একবার চাহিয়া লইয়া খাবারের উপর ঢুলঢুলে লুব্ধ চোখ দুইটি রাখিয়া স্বকীয় উচ্চারণে আবার কি বলিল ; এবার একটু বেশী।

মিটু বুঝাইয়া দিল, খাবারের দিকে একবার চাহিয়া লইয়া একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া বলিল, বলছে, শুধু বড় জেটুর কাছে হ্যাংলামি করব। বড় জেটু বকেন না।

হ্যাংলামি কথাটা তাহা হইলে তত আপত্তিজনক নয় তুলতুলের কাছে, যদিও মিটু অর্থটা অনেকখানি বোঝে। জিনিসটা যে দোষের সেদিকে না গিয়া বলিলাম, আমিও বকব না, বড় জেটুর চেয়ে আমি বেশী ভালোবাসি হ্যাংলাদের। বড্ড ভালোবাসি, এই দেখ না আলাদা করে খাবার রেখে দিয়েছি। কেউ যদি বকে তোমায়, তার সঙ্গে খুব 'ঝগড়া করব, মিটু যদি তাড়িয়ে দিতে যায়, ওকে মারব।

তুলতুল একবার আড়চোখে মিটুর পানে চাহিয়া লইয়া পায়রার মতো গলা নাচাইয়া কি বলিল, মিটু একটু টানিয়া উত্তর দিল, হোস নে, আমি তো বলিও না।

জিজ্ঞাসা করিলাম, ব্যাপারটা কি ?

মিটু বলিল, বলচে, মিটুর মাসী হব না। আমি তো ডাকিও না 'মাসী' ব'লে।

বলিলাম, আচ্ছা, মাসী-বোনপোর বোঝাপড়া পরে হবে। তুমি এস তো খেতে।

নিজেই উঠিলাম, সঙ্গে করিয়া আনিয়া রেকাবির সামনে বসাইয়া বলিলাম, খাও। তুলতুল বড্ড লক্ষ্মী। ও তো কারুর কাছে হ্যাংলামি করে না, শুধু বড় জেটুর কাছে আর আমার কাছে করে। ওবেলা আবার খাবার খাব, তুলতুল এসে খাবে। কমলালেবুটা কী চমৎকার মিষ্টি, না তুলতুল ?

তুলতুল মাথাটা দোলাইয়া কি বলিল ; আমি টীকার জন্য মিটুর পানে চাহিতে মিটু ঠোঁট-দুইটা জড়ো করিয়া বলিল, আমি বলব না, যাও।

আহার্য্যের প্রশংসায় আরও একটু রঙ চড়াইলাম, সাক্ষী পাইয়া সুবিধাও হইয়াছে। মিটু পিছন থেকে সামনে আসিয়া সোফাটায় হাতপা

ছড়াইয়া বসিল। একবার শুইয়া পড়িল, একবার সোফার উপর ডিগবাজি খাইবার চেষ্টা করিয়া নির্লিপ্তভাবটা জাগাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিল, তাহার পর হঠাৎ একবার সোজা হইয়া বসিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিল, মেজকাকা, তুমি হ্যাংলা মেয়েদের ভালোবাস ?

বলিলাম, হ্যাঁ, খুব।

ছেলেদের ?—ভ্রূ নামাইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া আছে।

ভাইপোর ওকালতি বুদ্ধিতে পেটে হাসি সুড়সুড় করিয়া উঠিতেছে। গম্ভীরভাবে অল্প একটু মাথা নাড়িয়া বলিলাম, হুঁ, বাসি। তবে বড় ছেলেদের নয়।

মিটু আবার পরাভবের ভাবটা সোফায় মাখাইয়া ফেলিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু বেশ বুঝিতেছি, আর পারিতেছে না বেচারা। নিষ্ঠুর খেলায় আমারও মনটা ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতেছে, ভাবিতেছি, ডাকিয়া লইব ; এমন সময় মিটু ডিগবাজি দেওয়ার জন্য মাথাটা গুঁজিয়া উল্টা চোখে আমার পানে চাহিয়া বলিল, মেজকাকা, কানে কানে একটা কথা শুনবে ?

উল্টা দৃষ্টিতে লজ্জাটা বোধ হয় একটু আড়ালে পড়িয়া যাইতেছে।

বলিলাম, শুনব, কথাটা কি ?

কাউকে বলবে না ?—কারুকে—কারুকে নয়—তুলতুলকেও না ?

তুলতুল বিস্কুট চিবাইতেছিল, বোধ হয় শুনিবার অধিকার সাব্যস্ত করিবার জন্য মুখটা ভার করিয়া বলিল, আমি টো টোর মাটী ওই।

ইস, মাসী !—বলিয়া মিটু সোজা হইয়া বসিল, তাহার পর আমার মতামতের অপেক্ষা না করিয়াই উঠিয়া আসিয়া আমার কানে মুখ দিয়া বলিল, আমি তো কচি ছেলে মেজকাকা, বড় নয় তো !

'হ্যাংলা' কথাটা উহ্য রাখিল। ঐটুকু মেজকাকা কি বুঝিয়া লইতে পারিবে না ? এতটা বড় হইয়াছে কি করিতে ? অর্থাৎ, হার মানিতেছে, তবে যতটা সম্ভব মর্য্যাদা বজায় রাখিয়া।

২

দ্বিতীয় পর্য্যায়ে একটু গোল বাধিল।

মিটুকে একটা রেকাবিতে করিয়া খাবারগুলা সাজাইয়া ডাকিতেই তুলতুল হাত গুটাইয়া মুখটি তোলো-হাঁড়ি করিয়া বসিল।

একটু ব্যস্ত হইয়া প্রশ্ন করিলাম, কি হ'ল?—তোমার আবার কি হ'ল, তুলতুল?

সামান্য একটু মাথা নাড়ার সঙ্গে উত্তর হইল—আমি ঠাবুই না, ডেকো টো!

ওর আবার 'দেখো তো' কথাটা প্রয়োজনের গুরুত্বে ব্যবহার করা অভ্যাস।

প্রশ্ন করিলাম, কেন খাবে না? বেশ তো দুজনে হ'লে···

আবদারের কণ্ঠে উত্তর হইল, আমি টো মাটী ওই।

বলিলাম, তা হও বইকি, তাই তো বলছি—দিব্যি মাসী-বোন:পাতে···

তুলতুল অভিমানের স্বরে গর-গর করিয়া খানিকটা কি বলিয়া গেল, একবর্ণও বুঝিতে পারিলাম না।

অনেক তপস্যায় পাওয়া খাবার, অনেক পিছাইয়াও আছে, আবার বিপদ ঘনাইয়া আসিতেও দেরি না হইতে পারে, মিটু খুব তাড়াতাড়ি হাতমুখ চালাইতে শুরু করিয়া দিয়াছিল, ঘুরিয়া একবার তুলতুলের পানে চাহিয়া নাক সিঁটকাইয়া বলিল, ই—স্! তাহার পর আমার প্লেটের রাজভোগ দুইটার পানে একবার চাহিয়া লইয়া প্রশ্ন করিল, দিদিমণি আবার আসবেন, মেজকাকা?

ভবিষ্যতের দিকেও নজর আছে। বলিলাম, না; তুলতুল কি বললে রে মিটু?

মিটু দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, না, আমি কখনও 'মাসী' বলব না—বলবই না।

তুলতুল মুখটা আরও অন্ধকার করিয়া বলিল, আমি ঠাবুই না, ডেকো টো।

মিটু ঠোঁটটা একটু উলটাইয়া বলিল, ব'য়ে গেল।

একবার তুলতুলের রেকাবির পানে চাহিয়া লইয়া বলিল, আমি খাব 'খন, আঁ্যা মেজকাকা?

বলিলাম, তা খাস, মা-মাসীব পাতেব পেসাদ খেতে হয়।

মিটু ভ্রূ দুইটা খুব চাপিয়া সন্দিগ্ধভাবে আমার মুখের পানে চাহিয়া লইল একটু, তাহার পরে নিঃশব্দে নিজের রেকাবিতে মনঃসংযোগ করিল। কথার মধ্যে কিছু মারপ্যাচের গন্ধ পাইলে ও এইরকম করে, পরে ঐ যে নিঃশব্দে আহার বা দোলা বা ডিগবাজি খাওয়া, ঐ সময়টা ভাবিয়া লয় ও একটা কাটান্ ঠিক করিয়া ফেলে। একবার মুখ তুলিয়া বলিল, মাসীরা তো কাপড় পরে মেজকাকা, তা জান না বুঝি?

আবার ইঙ্গিতে বোকা বানায়। বলিলাম এখন ছোট, তাই ইজের আর পেনি প'রে আছে। বড় হলে পরবে কাপড়।

আবার একটু নিঃশব্দে আহাব; তাহার পর একটা কমলালেবুর কোয়া চিবাইতে চিবাইতে বলিল, বড় হ'লে বলব 'মাসী'।

রাগিয়া বলিলাম, বড় বেয়াড়া তো তুই! আচ্ছা, ও 'মাসী' না বলে, আমি 'গিন্নী' ব'লে ডাকব তোমায় তুলতুল, তুমি খাও।

তুলতুল গলাটা দুলাইয়া বলিল, আমি টো ডিন্নী নয়, আমি টো মাটী ওই।

আচ্ছা এক ফ্যাসাদে পড়া গেল তো! এমনি তো দুটি প্রজাপতির মতো বেশ উড়িয়া ফিরিয়া সমস্ত বাড়িটা এক করিয়া বেড়াইতেছে, দুইজনে একরত্তি আলাদা নয়। আমার এখানে আসিয়াই এ কি এক আদাড়ে জিদ ধরিয়া বসিল! বলিলাম, মাটীরা ডিন্নীও হয়, সে বরং আরও ভালো, খুব আদর করব, ক-ত্তো জিনিস দোব।

নড়চড় নাই, মানময়ী গৃহিণীর মতোই মুখ ভার করিয়া অল্প একটু ঘুরাইয়া বসিয়া আছে। বলিলাম, শুনছ, তুলতুল? খাও। অনেক খাবার দোব—অনেক।

আদায়ের সুরেই ঘাড় বাঁকাইয়া একটু আড়ে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, টাপোড্ডেবে ?

বুঝিতে না পারিয়া মিটুর পানে চাহিতে মিটু প্রশ্নটারই দ্বিরুক্তি করিল, কাপড় দেবে ?

এতক্ষণ কোনরকমে চাপিয়া ছিলাম, একেবারে ডুকরাইয়া হাসিয়া উঠিলাম। এ আবার মিটুর চেয়েও সেয়ানা! এক সঙ্গেই গৃহিণীত্ব আর মাসীত্বের ব্যবস্থা করিয়া লইতে চায় যে! গৃহিণী-রূপে কাপড় আদায়, তাহার পর সেটা পরিয়া মাসী হইয়া বসা।

বলিলাম, যা সম্বন্ধ দাঁড়াল, কাপড় তো দেওয়ারই কথা তুলতুল। কিন্তু বাজারে তো পাওয়া যাবে না, আর একটু বড় হও। নাও, এবার খাও দিকিন।

মুখটা শুধু আর একটু ঘুরিয়া গেল।

বোধ হয়, আমার হঠাৎ হাসিয়া উঠাতেই মিটুর দিদিমা দুয়ারের বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাগের ভান করিয়া বলিলেন, ওমা, একি কাণ্ড! একটু সরেছি আর দুটোতে এসে ভাগ বসাতে আরম্ভ করেছে ? একে কিচ্ছু পাওয়া যায় না!

মিটু হাত গুটাইয়া লইল, হঠাৎ এ রকম হাতে-নাতে ধরা পড়িয়া যাওয়ায় বুদ্ধি খুলিতেছে না। এদিকে একে অভিমান ছিলই, তাহার উপর এই গঞ্জনার সূচনা, তুলতুলের ঠোঁট দুইটি একটু কাঁপিয়া উঠিল। আমি হাসিয়া বলিলাম, আপনাকে একটু স'রে যেতে হবে, মা। যা সমস্যা নিয়ে পড়েছি, তাতে যদি দুটো খাবারের ওপর দিয়েই রেহাই পাই তো বুঝব···

আগাইয়া আসিলেন, একটু হাসিয়াই বলিলেন, ব্যাপারখানা কি ? পাত থেকে খাবার তুলে দিতে হবে, আবার সমস্যাও ? এসে জুটল কোন্ দিক দিয়ে ? নাও, খেয়ে নাও, দখল যখন ক'রেই বসেছ···

বলিলাম, ওকে মিটু 'মাসী' না বললে খাবে না।

সেই মাসী-বোনপোর ব্যাপার ? ও সমস্যা আজ পর্য্যন্ত কেউ মেটাতে পারলে না তো তুমি একদিনের জন্যে এসে কোথা থেকে পারবে, বাপু ?

কম শয়তান তোমাদের ঐ বাঁটকুলটি? এতটুকু দেখতে হ'লে কি হয়? কাপড় না পরলে কোনমতে 'মাসী' বলবে না; সমস্ত বাড়ি এক দিকে, ও এক দিকে। এখন, অতটুকু মেয়ের কাপড় কোথায় পায় বল দিকিন লোকে?

মিটুর পানে চাহিয়া বলিলেন, বল্ না 'মাসী' একবারটি না-হয়— মেজকাকা বলছেন। না বলে, তুমি ওকে নিয়ে যেয়ো না, এইখানে ফেলে রেখে যেয়ো, জব্দ হবে।

বললাম, হ্যাঁ, তাই যাব, ওর বদলে বরং তুলতুলকে নিয়ে যাব। তুমি খাও তুলতুল; লক্ষ্মীটি! সেখানে 'মাসী' বলবার কত লোক আছে— গোপাল, মন্টু, ছবি, গৌরী, মৈয়া, কেঁাদন—আরও কত্তো সব—তুমি উত্তুর দিয়ে উঠতেই পারবে না! নাও, খেয়ে নাও, থাকবে মিটে এখানে একলা প'ড়ে।

রসগোল্লাটি তুলিয়া মুখের কাছে ধরিলাম। তুলতুল মুখটা ঘুরাইয়া বিড়বিড় করিয়া কি একটু বলিল। মিটুর দিদিমা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, শোন!—শুনলে তো?

বলিলাম, ধরতে পারলাম না তো!

বলছে, মিটুও সেখানে যাবে, 'মাসী' বলবে। ওকে যদি একশোটা ছেলেমেয়ে চারদিক থেকে 'মাসী' ব'লে ডাকতে থাকে, তবু মিটু না ডাকলে সে সব কিছু নয় ওর কাছে। কাকে রেখে কাকে দুষব বল— ও-ও কি কম দজ্জাল মেয়ে? মিটুকে ঘাড় ধ'রে 'মাসী' বলাবে, তবে ওর সোয়াস্তি।

আর একটু চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে চলিয়া যাইতে হইল; কন্যার আজই যাত্রার দিন, তাঁহার দম লইবার অবসর নাই। আমার এমন কিছু তাড়া নাই, ওদের সমস্যা লইয়াই আরও কাটাইলাম খানিকটা; এবং অবশেষে আধাআধি একটা সমাধানও হইল; বলিলাম, বেশ, আজ বাজার থেকে তোমায় কাপড় এনে দোব তুলতুল, তুমি খাও। আজই এনে দোব কেমন ঝকমকে শাড়ি। এইবার বল 'মাসী', মিটু।

মিটু সন্দেশে একটা কামড় দিয়া একটু গলা দোলাইয়া ওর বুলুটে ভাষায় বলিল, কাপড় পরুক না, তাড়াতাড়ি কিসের ?

আধাআধি সমাধান এইজন্য বলিতেছি যে, তুলতুল শেষ পর্য্যন্ত খাবারগুলি খাইল। অবশ্য, শুধু ঝক্‌মকে শাড়ির লোভ দেখাইয়া ফল হইল না, তাহার সঙ্গে একটু ঝাল-মসলা মিশাইতে হইল।—মিটু ভয়ঙ্কর বদমাইশ—মিটুকে সেখানে লইয়া গিয়া বেত মারিয়া 'মাসী' বলাইতে হইবে,—সেখানে তো দাদুও নাই, দিদিমাও নাই যে বাঁচাইবে—মিটু সবটা খাইয়া ফেলিল, তুলতুল তাড়াতাড়ি না খাইয়া ফেলিলে ওর ভাগটাও কাঁড়িয়া খাইবে—এখানে কিছু বলা যাইবে না কিনা, দাদু-দিদিমা রহিয়াছেন যে—

৩

আমাদের প্রতিদিনের জীবনে একটি অতি সূক্ষ্ম প্রবঞ্চনা থাকে শিশুদের লইয়া জীবনের যে অংশটি, তাহাতে। এত সূক্ষ্ম যে আমরা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনি না, ওদের ভুলাইয়া-ভালাইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া, ভাঙিয়া, আমাদের যাত্রার পথ মসৃণ করিয়া লই। বোধ হয় ভাবি, এত ছোট সমাচারগুলো ভগবানের কাছে পৌঁছায় না। পৌঁছায়ই, কেননা এক-এক সময় এক-একটি এমন ধাক্কা আসিয়া বুকে লাগে যে, সে আর ভোলা যায় না।

শিশু যে ভগবানের একেবারে বুকের কাছটিতে থাকে—এ কথা আমরা ভুলিয়া বসিয়া থাকি।

তুলতুলের শাড়ির কথা এমন কিছু বড় কথা নয় যে, মনে করিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। আহার শেষ করিয়া দুটিতে মাসী-বোনপোর আড়াআড়ি ভুলিয়া, নাচিয়া-কুঁদিয়া আবার সমস্ত বাড়িটা পূর্ণ করিয়া তুলিল—কোথাও ভাঙা, কোথাও গড়া—ওদের নিজ প্রথায়—কোথাও বকুনি, কোথাও আদর ; যদি একটু নীরবতা তো, কণ্ঠকাকলি পরমুহূর্তে দ্বিগুণ উচ্ছ্বাসে বিরাট দেউড়ির দেয়ালে আঘাত হানিয়া উঠে।

আমি একটু ঘোরাঘুরি করিলাম, খানিকটা গল্পে মাতিলাম, দরকারী আলোচনাও ছিল—আজই বৈকালে যাইতে হইবে, এতগুলি লোককে লইয়া গাড়িতে যাওয়া, যা অবস্থা আজকাল!

ওরই মধ্যেই তুলতুল আসিয়া একবার হাঁটুটা জড়াইয়া গলা তুলিয়া আবদারের সুরে বলিল, আমাট্টাপোর আনটে অবে; আমি মাটী অবো।

বলিলাম, নিশ্চয়, আনব বইকি।

আবার ঠোঁট কুঞ্চিত করিয়া বলিল, আমি ডিন্নী ওই।

আমাদের নূতন-পাতা সম্বন্ধটা লইয়া বোধ হয় বাড়িতে একটা আলোচনা হইয়াছে, মিটুর মারফৎ খবরটা প্রচারিত হইয়াছে; তুলতুল টের পাইয়াছে গিন্নীর দর অনেক—শাড়ি পায়, গয়না পায়, আরও কত কি পায় মনে করাইয়া দিল।

ঠিক করিয়াছিলাম বাজারে গিয়া গজ দুয়েক রঙিন রেশম বা মলমল-জাতীয় কাপড় কিনিয়া জরির পাড় বসাইয়া শাড়ি-সমস্যা মিটাইব। উঠিতেও যাইতেছিলাম—বলিয়াছি ছেলেমানুষকে, ওটুকু সারিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়া বসি। গল্পটা একটু দিক-পরিবর্তন করিয়া নূতনভাবে জমিয়া উঠিল। গল্পের মজলিসে লোক বাড়িল, শাখা-প্রশাখায় গল্প নূতন নূতন পথে ছুটিল, একটি মেয়ের শিশুসুলভ আবদার দুইটি চঞ্চল ঠোঁটের স্মৃতি মাঝে মাঝে জাগাইতে জাগাইতে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হইয়া কখন মিলাইয়া গেল।

মনে পড়িল যখন মধ্যাহ্ন-আহারের ডাক পড়িল। অবশ্য, বড় প্রয়োজনের কাছে ওই সামান্য কথাটা আমলই পাইল না; আগে এটা তো সারিয়া লই, তাহার পর না হয় বাজারে চাকর-বাকর কাহাকেও পাঠাইয়া আনাইয়া লওয়া যাইবে।

ভাত খাওয়ার সময়ে কাছে আসিয়া দাঁড়ানোটা হ্যাংলামির পর্য্যায়ে পড়ে না; তুলতুল বেশ সপ্রতিভ এবং খোলাখুলি ভাবেই সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। আমি একটু পুরাতনও তো হইয়াছি; হ্যাংলামির ধার মরিয়া যায় ওতে। একবার মিটুও আসিল; খানিকক্ষণ থাকিয়া কি যেন একটা খুব জরুরী কাজে বন্ করিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। টকার-

ডকারের বাঁধ খুলিয়া দিয়া অনর্গল গল্প করিয়া চলিয়াছে তুলতুল; মাঝে মাঝে শুনিতেছি, আবার মাঝে মাঝে নিজেদের গল্পে ডুবিয়া যাইতেছি। মিটুর দিদিমা রহিয়াছেন, দাদুরা আহার করিতেছেন। শেষ পাতে দই-মিষ্টির সময় তুলতুলকে পাশে আসিয়া বসিতে বলিলাম। তুলতুল একবার জেঠাইমার পানে চাহিল; তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, ব'স, ঐ উদ্দেশ্যেই তো এসে দাঁড়ানো গুটি-গুটি ক'রে!

তুলতুল দুই পা অগ্রসর হইয়া বসিতে গিয়া আবার দাঁড়াইয়া পড়িল, তাহার পর ঘুরিয়া উপরের সিঁড়ির দিকে ছুটিল। প্রশ্ন করিলাম, কি হ'ল তুলতুল?

সকলেই তাহার এই হঠাৎ ভাবপরিবর্ত্তনে একটু বিস্মিত হইয়া চাহিয়া আছেন। তুলতুল ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া একটু গিন্নীপনার ভাবে তর্কের সুরে বলিল, ডাঁড়াও, মিটু ঠাবে না? ডেকো টৌ!

তাহার বলিবার ধরনে সকলকেই একটু হাসিয়া উঠিতে হইল; মিটুর দিদিমা কতকটা তাহারই ভঙ্গী নকল করিয়া বলিলেন, ডেকো টৌ! বোনপো শুকোচ্ছে, আমার মুখে কখনও অন্ন-জল উঠতে পারে? কি রকম বেয়াক্কেলে কথা আবার!

মিটু আসিয়া অবশ্য 'মাসী' বলিল না, তবে এবার আর উল্লেখযোগ্য কোন হাঙ্গাম হইল না। মিটুর দাদু একবার প্রশ্ন করিলেন, মিটু, তা হ'লে বলছ 'মাসী'?

মিটু উত্তর করিল, কাপড় পরুক না, তাড়াতাড়ি কিসের?

তুলতুল বলিল, টাপোপ্পোব্বো; ডেকো টৌ!

এইতেই আপাতত কাজ চলিয়া গেল।

সমস্ত রাত গাড়িতে অকথ্য কষ্ট গিয়াছে, তাহার উপর মিটু-তুলতুল সত্ত্বেও কুটুমবাড়িরই আহার। একটু শয্যা আশ্রয় করিতে হইল; ওরা দুইজন সঙ্গে রহিল। বলিলাম, একটু গড়িয়ে নিই, মিটু; তারপর আমি উপরে গিয়ে বাক্স খুলে পয়সা দিচ্ছি, তুই পঞ্চুকে ডেকে দিবি, তুলতুলের কাপড় এনে দেবে।

তুলতুল মুখটা ভার করিয়া গড়গড় করিয়া কি খানিকটা বলিয়া গেল;

দুই-চারটা কথা ধরিতে পারিতেছি, অতগুলা আয়ত্ত হয় না। মিটু বলিল, বলছে, পঙ্কু আনলে আমি পরব না,—পঙ্কু কালো, বিচ্ছিরি।

হাসিয়া তুলতুলকে বলিলাম, তা বেশ, আমি হাতে ক'রে আনলেই যদি তোমার কাপড় রাঙা টুকটুকে থাকে, আমিই যাব। সে তো ভাগ্যির কথা। একটু গড়িয়ে নিই, কি বল?

কাপড়ের আলোচনা চলিল: রাঙা টুকটুকে শাড়ি আসবে তুলতুলের —ফিনফিনে জমি, মাঝে মাঝে চুমকি বসানো, এতখানি চওড়া জরির পাড়, এই আঁচলা—এইরকম ক'রে প'রে, পিঠে এইরকম ক'রে আঁচলা দুলিয়ে যেই দাঁড়াবে তুলতুল, অমনি মিটু এসে বলবে—ও তুলতুল মাসী! ও তুলতুল মাসী!

আনন্দে একবার ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিয়াই তুলতুল সঙ্গে সঙ্গে মুখটা ভার করিয়া কি বলিল। মিটু বুঝাইয়া দিল, বলছে, শুধু 'মাসী' বলব।

মর্য্যাদাজ্ঞান দেখিয়া একটু বিস্মিতই হইতে হইল, অর্থাৎ সঙ্গে নাম জুড়িয়া দিলে তো ওরই মধ্যে একটু ছোট করা হইল; তুলতুল ও-খাদটুকু চায় না। বলিলাম, হ্যাঁ, নাম ধ'রে আবার নাকি 'মাসী' বলে? মিটুর যেমন কাণ্ড? তা হ'লে তো নাম ধ'রে দাদু বলবে, নাম ধ'রে দিদিমা বলবে, আমারও নাম ধ'রে মেজকাকা বলবে।—মিটু ছুটে এসে বলবে: ও মাসী! ও মাসী! তুমি যে কাপড় পরেছ গো! ও মাসী! ও মাসী! ও মাসী!

কি সাধ লইয়া যে ওরা জন্মায় কে জানে, কথাগুলা তুলতুলকে যেন সুড়সুড়ি দিয়া উঠিল। হঠাৎ আমার দক্ষিণ হস্তটা টানিয়া লইয়া নিজের বুকে চাপিয়া ধরিল এবং চোখ-মুখ কুঞ্চিত করিয়া একেবারে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসি থামিলে বলিল, আবাল বল না, আবাল বল। টি বোব্বে মিটু?

৪

শাড়ি আনা হয় নাই। খুবই ক্লান্ত ছিলাম, কখন গল্পের মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছি টের পাই নাই। উঠিলাম একেবারে খাওয়ার

আয়োজনের ব্যস্ততার মধ্যে। পাশে তুলতুল শুইয়া আছে একটি পুষ্পস্তবকের মতো। ওর মুখের উপর যখন নজর পড়িল, ঠোঁটের এক কোণে একটি হাসি ধীরে ধীরে মিলাইয়া যাইতেছে; বোধ হয় রঙিন শাড়ি আর 'মাসী' ডাকের স্বপ্ন দেখিতেছিল।

মিটুর দাদু বলিলেন, আমিই তোমাকে উঠোতে বারণ ক'রে দিয়েছিলাম, কাল ঐ অবস্থা গেছে, আজ রাত্তিরেও ঘুম হবে না। নাও, মুখ হাত ধুয়ে একটু চা-টা খেয়ে নাও, স্টীমারের আর মোটে আধ-ঘণ্টাটাক আছে।

নিজেকে প্রস্তুত করিয়া লইবার মিনিট দশেক যা সময় পাওয়া গেল, তাহাতে ডাইনে-বাঁয়ে চাহিবার ফুরসৎ পাওয়া গেল না, শিশু-ভোলানো হাল্কা আলাপের মধ্যে একটি রাঙা শাড়িরও প্রলোভন ছিল—এ কথা আর কি করিয়া মনে থাকিবে? ক্ষতিই বা কি, যদি না রহিল মনে? বড় বাড়িতে কন্যাবিদায়ের ব্যাপার—ওদিকেও বেশ একটা তাড়াহুড়া পড়িয়া গেছে, কে কাহার খোঁজ রাখে? উপর থেকে নামিয়া আসিয়া যখন বিদায় লওয়ার পালা, ছোটদের স্তরে নামিতে তুলতুলের কথা মনে পড়িল। তুলতুল ছিল না।

কেহ সন্ধান দিতে পারিল না। মনে ধক্ করিয়া একটা বড় আঘাত লাগিল; কিন্তু সে ক্ষণিক; তখনই অদূরে স্টীমার-ঘাটে স্টীমারের ভোঁ বাজিয়া উঠিল, ওপার হইতে উপস্থিতির সূচনা। যাত্রার তাড়ায় মোটরে গিয়া উঠিতে হইল।

গেটের দিকে মুখ করিয়া মোটর দাঁড়াইয়া আছে। হাজার ব্যস্ততার মধ্যেও বিদায়ের শেষ লগ্নটুকু মেয়েরা একটু লম্বই টানিয়া বাড়াইয়া; মিটুর মায়ের ওঠা তখনও হয় নাই। হঠাৎ আমার দৃষ্টি সামনে এক জায়গায় নিবদ্ধ হইয়া গেল।

সুমুখেই যে দোতলার ঘরটি, তাহার সামনে রেলিঙে-ঘেরা ছোট্ট একটি বারান্দা বা ব্যাল্‌কনিতে দাঁড়াইয়া একা তুলতুল। একটি বোধ হয় বারো হাতের শাড়ির বেষ্টনীতে ক্ষুদ্র শরীরটির বুক পর্য্যন্ত একেবারে অবলুপ্ত, তাহারই আঁচলের একটা কোণ মাথার উপর তোলা। ছোট্ট

বুকের যত আশা, যত উৎকণ্ঠা তুলতুলের সেই স্বপ্নময় চোখ দুইটিকে যেন অস্বাভাবিক রকম তীক্ষ্ণ করিয়া তুলিয়াছে। মিটু আমার পাশে বসিয়া মুখটা ঘুরাইয়া বিদায়দৃশ্য দেখিতেছে; তুলতুলের দৃষ্টি তাহারই উপর ন্যস্ত, কখন একবার ফিরিবে সেই প্রতীক্ষায়!

বোধ হয় হঠাৎ চোখ পড়ার জন্যই মনটা আমার প্রথমে হাসিতেই উদ্বেল হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি মিটুর মুখটা ঘুরাইয়া লইয়া বলিলাম, ঐ দেখ্, এক-কাপড় মাসী তোর! ডাক একবার 'মাসী' বলে!

সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটুকুর মর্ম্মান্তিকতা আমার বুকে যেন একটা মোচড় দিয়া উঠিল। ততক্ষণে আমার কথার সূত্র ধরিয়া সবার দৃষ্টি ব্যাল্‌কনির উপর গিয়া পড়ায় বিদায়ের অশ্রুর মধ্যেও একটু হাসি ছলছল করিয়া উঠিয়াছে। তুলতুলের মুখটা যেন কি রকম হইয়া গেল, কচি ঠোঁট দুইটি নাড়িয়া কি একটা বলিতে গিয়া জড়াইয়া ফেলিয়াই দুই হাতে মুখটা ঢাকিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

একবার ইচ্ছা হইল, ডাকিয়া লই। তখনই কিন্তু স্টীমারের বাঁশি আর একবার বাজিয়া উঠিল; মিটুর মা তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিলেন; মোটর ছাড়িয়া দিল। ব্যাল্‌কনির নীচে দিয়া যাইবার সময় চোখ তুলিয়া দেখিলাম, অপর্য্যাপ্ত বস্ত্রের নিষ্ঠুর পরিহাসের মধ্যে তুলতুলের শরীরটুকু যেন ভাঙিয়া পড়িতেছে।

সার্টিফিকেট

আজ নিয়োগ-পত্র পাইয়াছি।

এমন কিছু বড় চাকরি নয়, গৃহশিক্ষকতা মাত্র, তবে লোভনীয়। জমিদার-বাড়ির গৃহশিক্ষকতা; জায়গাটি মফস্বল হইলেও খুব স্বাস্থ্যকর; বেতন আশি টাকা; খাওয়া, পরা, থাকার ব্যবস্থা ওঁদেরই; ছেলেটি স্কুলের অষ্টম শ্রেণীতে পড়ে, অর্থাৎ তিন বৎসর পরে ম্যাট্রিক দিবে। ছেলে পাস করিলে তাহার সঙ্গে কলিকাতায় আসিয়া থাকিতে হইবে; কলেজ-জীবন শেষ হইলে জমিদারিতেই চাকরির সম্ভাবনা আছে।

নিয়োগের একটা বড় শর্ত ছিল সার্টিফিকেট। অভিজ্ঞতা, চরিত্র প্রভৃতি সম্বন্ধে খুব উঁচু ধরনের সার্টিফিকেট না থাকিলে দরখাস্ত করিবার ব্যর্থতা সম্বন্ধে স্পষ্ট ভাষায় লেখা ছিল।

কোনই আশা ছিল না। এমন জায়গায় প্রথম শ্রেণীর এম্. এ, পি-এইচ. ডি-দের দরখাস্ত পড়িবে, তাহার উপর মুখ-দেখাদেখি আছে, সুপারিশ আছে; আমার মত নিঃসহায় মামুলী বি. এ. কোথায় ভাসিয়া যাইবে। তবু লোভের বশে দরখাস্তটা করিয়া দিয়াছিলাম। লোভ জিনিসটাকে রিপুর পর্য্যায়ে ফেলা হইয়াছে, এ ক্ষেত্রে কিন্তু আমার বন্ধুরই কাজ করিল।

আবার এও ভাবি, বেশি বন্ধুর কাজ কে করিল,—লোভ, না আমার ছাত্র নিকুঞ্জলালের প্রবন্ধ?

নিকুঞ্জলালকেও আমি অষ্টম শ্রেণী হইতেই পড়াইতে আরম্ভ করি, এইবার ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিল, এই সবে এক সপ্তাহ হইল পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। মন্দ হইল না, সেকেণ্ড ডিভিশন। নিকুঞ্জলালকে সেকেণ্ড ডিভিশনে পাশ করাইয়া আমিও যদি আজ নেপোলিয়নের মত

বলি, 'অসম্ভব' কথাটা মূর্খদের অভিধানেই পাওয়া যায় তো নিতান্ত অশোভন হয় না।

নিকুঞ্জলালের পিতা ব্রজমাধব খুবই প্রীত হইয়াছেন; বলিলেন, আপনি এক অসাধ্যসাধন করলেন মাস্টারমশাই, আমার ছেলে ব'লেই যে আপনার প্রাপ্য যশ থেকে আমি বঞ্চিত করব আপনাকে, তা করব না।

খুব পদস্থ ব্যক্তি একজন,—রায় বাহাদুর, জমিদার, অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট, আরও অনেক কিছু। সবচেয়ে বড় কথা বঙ্গীয় জমিদার-সংঘের এ-জন হোমরা-চোমরা লোক, যেটুকু মুখে বলিলেন শুধু ঐটুকু কথাই যদি কাগজে লিখিয়া দেন তো কাজটার আমার অনেক আশা থাকে। কিন্তু জানি উনি তাহা করিবেন না।

তাহার কারণ এই যে, আমি অসাধ্যসাধন করিতে পারি।

নিকুঞ্জর যেদিন পাসের খবর বাহির হইল, সেই দিন সন্ধ্যার সময়ই আমি ব্রজমাধববাবুর সহিত দেখা করিলাম, বলিলাম, এইবার আপনি আমায় একটি ভাল সার্টিফিকেট দিন, অনেক দিন থেকেই আশা ক'রে আছি, আপনি বলেছিলেনও দেবেন। আপনার একটা সার্টিফিকেটে আমার একটা ভবিষ্যৎ হয়ে যেতে পারে।

ব্রজমাধব স্নেহভরে আমার কাঁধে দুইটি চাপড় দিয়া সস্মিত বদনে কহিলেন, পাবে হে ইয়ংম্যান, ব্রজমাধব সে রকম আন্‌-এপ্রিসিয়েটিভ নয়, কাল সকালে দেখা ক'রো।

দেখা করিতে নিকুঞ্জর কনিষ্ঠকে আমার দিকে একটু আগাইয়া দিলেন, স্মিত বদনেই বলিলেন, এই তোমার সার্টিফিকেট, এটি আবার একটু বেশি ড্যাল (dull), ভূপেশবাবুর কর্ম্ম নয়,—নিজের ছেলে ব'লেই যে অযথা প্রশংসা করতে হবে তার মানে কি?... আর এই ধর, আসছে মাস থেকে আরও পাঁচ টাকা বেশি পাবে।

পুরস্কারস্বরূপ একটি মাসের মাহিনাও হাতে তুলিয়া দিলেন। উপায়ও নাই; তবুও তো কলিকাতা শহরে খাওয়া-পরা ছাড়া পঁচিশটি করিয়া টাকা মাহিনা পাইতেছি; না আছে সুপারিশের

জোর, না আছে কিছু, করিই বা কি? অথচ বিভীষিকা দেখিয়া আতঙ্কে শিহরিয়াও রহিয়াছি—নিকুঞ্জলালের পর কুঞ্জলাল, তারপর রঞ্জনলাল, তার পর মঞ্জুলিকা, সবাই একে একে ঘাড়ে আসিয়া চাপিবে—দুই তিন বৎসর অন্তর এক মাসের বোনাস আর পাঁচটি টাকার বেতন বৃদ্ধি লইয়া? এই আমার জীবনের প্রস্‌পেক্ট? একটু বেশি ড্যল হইতে হইতে সব চেয়ে ছোট রঞ্জনলালটি আবার বোবা হইয়া জন্মাইয়াছেন।

কুঞ্জলাল জলখাবার খাইতে গিয়াছে। পড়িবার ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া এ-বইটা সে-বইটা লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছি, আর নানারকম চিন্তা লইয়া তোলাপাড়া করিতেছি। বিজ্ঞাপনটা দেখা পর্য্যন্ত মনটা বড় চঞ্চল হইয়া আছে, সব জিনিস যেন অত্যন্ত ফিকা বোধ হইতেছে। অবশ্য দুরাশা, তবুও যদি রায় বাহাদুরের একটা সার্টিফিকেট লইয়া দরখাস্তটা পাঠাইয়া দিতে পারিতাম তো ক'টা দিন আশায় আশায় কাটিত একরকম, আর তাহার পর বিফলমনোরথ হইলে ততটা কষ্টও হইত না—চেষ্টা করার একটা সান্ত্বনা থাকিত তো। এখন আফশোষ হইবে, চেষ্টা করিলাম না বলিয়াই হইল না।···একবার ভাবিতেছি, নিজেই গিয়া দেখা করি; কিন্তু দেখা করিবার পাত্রও তো আমি একা নয়। আবার মনে হইতেছে চাই একটা সার্টিফিকেট, যা হইবার হইবে। ভাবিয়া দেখিতেছি—যা হইবার মধ্যে হয়তো নৈরাশ্যজনিত বিরক্তিতে একটু কথা-কাটাকাটি হইয়া হাতের চাকরিটাই যাইতে পারে। নিজেকেই প্রশ্ন করিতেছি, তোয়ের আছ তার জন্যে?—হ'লে দেখ।

এই সময় নিকুঞ্জলালের হাউণ্ড কুকুর টম্ বাড়ির পোষা কাবুলী বেড়ালটাকে দেখিতে পাইল। টম্ তাহার প্রিয় আশ্রয় বইয়ের র‍্যাকের নীচেটিতে বসিয়া গরমে হাঁপাইতেছিল, বেড়ালটাকে নিশ্চিন্তমনে ল্যাজ খাড়া করিয়া চলিয়া যাইতে দেখিয়া সহুঙ্কারে লাফাইয়া উঠিয়াই পাঁচ-থাক র‍্যাকের যত বই খাতা ম্যাপ দোয়াতদানি রুল ইনস্ট্রুমেণ্ট বক্স,—সমস্তর নীচে চাপা পড়িয়া গেল।

যতক্ষণে উঠিল ততক্ষণে বিড়ালটা দোতালায় পৌঁছিয়া গেছে, সেখানে আলিসার একটি নিরাপদ কোণে গুটাইয়া বসিয়া ধীর অভিনিবেশের সহিত ঘরের দৃশ্যটি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে।

যাই হোক, এই বিদ্যাসাগর-মন্থনে আমার ভাগ্যে একটি রত্ন উঠিল। চাকরটা আসিয়া বই-খাতা গুছাইয়া রাখিতেছিল, নিতান্ত অলস কৌতূহলবশেই আমি তাহার নিকট হইতে একখানি খাতা চাহিয়া লইলাম। নিকুঞ্জলালের বাংলা প্রবন্ধের খাতা,—আজকের নয়, নিকুঞ্জ যখন সপ্তম শ্রেণীতে পড়িত সেই সময়ের। নিজের কীর্ত্তির আলোচনায় আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিতেছিলাম, আর যাই হোক না-হোক, হাতের লেখাটা নিকুঞ্জর মানুষের মত হইয়াছে।

...অনেকগুলি প্রবন্ধ—ঘোড়া, গরু, হস্তী, সত্যবাদিতা, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সিংহ, উষ্ট্র—সবগুলার নীচে এক দিকে নিকুঞ্জলালের নাম, লেখার তারিখ, অপর দিকে স্কুলের শিক্ষকের দস্তখৎ, তারিখ সমেত। একটি প্রবন্ধের গায়েও এতটুকু সংশোধনের আঁচড় নাই দেখিয়া কৌতূহল হওয়ায় দুই-একটা পড়িয়া দেখিলাম, সবগুলি কোন প্রবন্ধের পুস্তক থেকে যথাযথভাবে সংগ্রহ করা। পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে হঠাৎ চোখে পড়িয়া গেল—"মনুষ্য"। ঝোঁকের উপর উল্টাইয়াই যাইতেছিলাম, বারো-চৌদ্দখানা পাতা যখন উল্টাইয়া গেছি, হঠাৎ বড় কৌতূহল হইল। "মনুষ্য" সম্বন্ধে প্রবন্ধ ইস্কুল-ছাত্রদের গণ্ডির মধ্যে পড়ে না, ও লইয়া কলম চালাইবার সাহস করিতে পারে কার্লাইল, বেকন, হাক্স্‌লির মত মানুষই। স্কুলের প্রবন্ধ-পুস্তকেও মানুষ লইয়া কোন প্রবন্ধ কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। শিক্ষকের বিষয়-নির্ব্বাচনের তারিফ করিয়া আবার পিছন দিকে পাতা উল্টাইয়া যাইতে লাগিলাম—নিকুঞ্জলালই বা কি লিখিল, শিক্ষকই বা কি পরিবর্ত্তন-পরিবর্দ্ধন করিলেন একবার দেখিতে হইল তো!

প্রবন্ধের শেষ পাতাটিতে আসিলাম—শিক্ষকের দস্তখতে লেখা রহিয়াছে, "তুমি একটি আস্ত গর্দ্দভ"। কোনখানে কাটাকুটি কিছু নাই। বুঝিলাম এই এতগুলি রচনার মধ্যে এইটিতে যখন নিকুঞ্জের স্বকীয় রূপ

ভাবিতে ভাবিতে মনটা সত্যই বড় অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। ঠিক করিলাম, যদি বচসাই হয়, চাকরিই যায় তো যাক, সার্টিফিকেট চাহিবই। স্পষ্টই বলিব, রাজভাষায় যাহাকে সার্টিফিকেট বলে, নিতান্ত তাহাই চাহিতেছি, নিকুঞ্জের কনিষ্ঠ কুঞ্জলালকে নয়। ' না দেয়, এ সার্টিফিকেট ফিরাইয়া দিব, তাহাতে উপবাস করিয়া মরিতে হয় সেও ভাল।

এই সব চিন্তার মধ্যেই মাথায় সম্পূর্ণ একটা অন্য ধরনের মতলব ধীরে ধীরে উদয় হইয়া বেশ জাঁকিয়া বসিল।...ভাবিলাম, দেখাই যাক না একটু চেষ্টা করিয়া, কাজ কি রায় বাহাদুরের খোসামোদে ?

প্রবন্ধের পাতা কয়টি পরিষ্কার করিয়া কাটিয়া পকেটে পুরিলাম। চাকরকে বলিলাম, কুঞ্জ এলে বলিস, মাস্টারমশাইয়ের মাথাটা হঠাৎ ধ'রে উঠল ব'লে চলে গেছেন, পড়াশুনোগুলো নিজেই একটু দেখে শুনে নিতে।

বাসায় আসিয়া একটি দরখাস্ত করিলাম। সার্টিফিকেট হিসাবে নিকুঞ্জলালের প্রবন্ধটি নথি করিয়া দিয়া তাহার গায়ে লিখিয়া দিলাম—সপ্তম শ্রেণীতে যে ছেলেটির প্রতিভার নমুনা এই, তাহাকে তিন বৎসরের অমানুষিক পরিশ্রমে আমি এই বৎসর পাস করাইয়াছি সেকেণ্ড ডিভিশানে। ইহার অতিরিক্ত সার্টিফিকেট চাহিলে সংগ্রহের প্রয়াস করিতে পারি, তবে এত প্রামাণিক হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না।

নিকুঞ্জর বংশপরিচয় একটু একটু দিলাম, যাহাতে মিথ্যা বলিয়া সন্দেহ না করে, আর খবরের কাগজ থেকে তাহার ইস্কুলের ফলাফলের অংশটুকু কাটিয়া তাহার নামের নীচে লাল দাগ টানিয়া সার্টিফিকেটের সঙ্গে জুড়িয়া দিলাম।

আজ সকালে নিয়োগপত্র পাইয়াছি,—টেলিগ্রাম, অর্থাৎ এসব অসাধ্য সাধন যে মাস্টার করিতে পারে সে যেন হাতছাড়া না হইয়া যায়।